মায়ের আত্ম প্রকাশ

(মাতৃলীলা ১৮৯৬-১৯৩২)

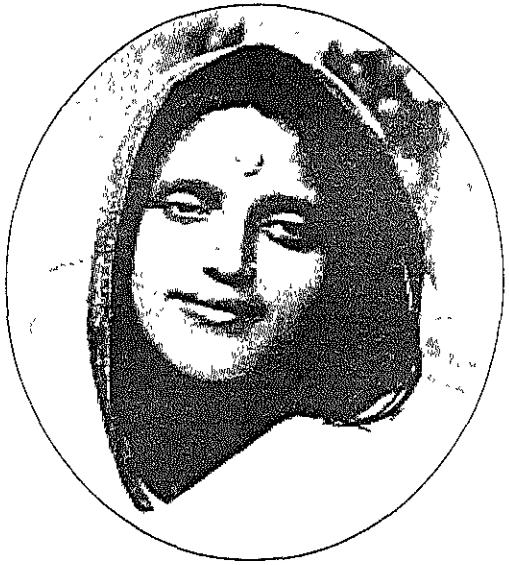

অনুলেখন

ভাইজী (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়)

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী সংরক্ষণশালা (রেজিঃ)
এস-৫৩৯, গ্রেটার কৈলাশ-২, নিউ দিল্লী-১১০০৪৮, ভারত
ই-মেল ঃ matrılila@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রী মা'র তিথি পূজা উপলক্ষ্যে, ২৮শে মে, ২০১৩

© Shree Shree Ma Anandamayee Archive ®

পঞ্জীকৃত কার্যালয়
শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী সংরক্ষণশালা
'দীপশিখা'
এস-৫৩৯, গ্রেটার কৈলাশ-২, নিউ দিল্লী-১১০০৪৮, ভারত
ই-মেল ঃ matrilila@gmail.com
দূরভাষ ঃ ৯১-১১-৪১৬৩৯২৭৫

মাতৃলীলা কেন্দ্র
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সংরক্ষণশালা
'মাতৃ নিলায়ম'
আনন্দ জ্যোতি পীঠম এর বিপরীতে
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী মার্গ,
কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮, ভারত
দূরভাষ ঃ ৯১-৯৪১২১ ৫৮৭৯৯

মুদ্রক
আই এম এইচ
এ-৪৮ কৈলাশ কলোনী, নিউ দিল্লী-৪৮

প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও নক্সা
সমীর চক্রবর্তী

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

ISBN: 978-81-927273-0-1

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোন ধরনেরই প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

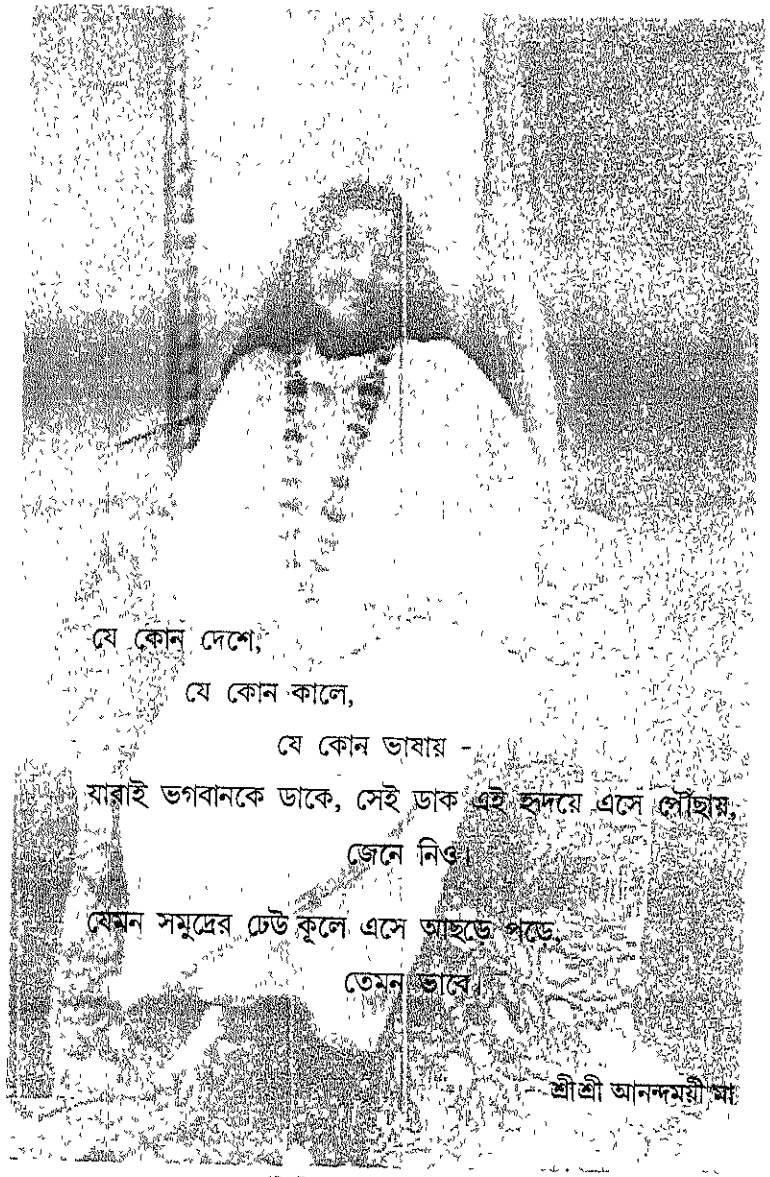

যে কোন দেশে,
যে কোন কালে,
যে কোন ভাষায় -
যারাই ভগবানকে ডাকে, সেই ডাক এই হৃদয়ে এসে পৌঁছায়,
জেনে নিও।
যেমন সমুদ্রের ঢেউ কূলে এসে আছড়ে পড়ে,
তেমন ভাবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা

উপলক্ষ্যে, ২৮শে মে, ২০১৩

Ma Anandamayee Archive ®

আনন্দ জ্যোতি পীঠম

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী মার্গ,

কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮,

দূরভাষ ঃ ৯১-৯৪১২১ ৫৮৭৯৯

অংশের কোন ধরনেরই প্রতিলিপি অথবা

উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রী রাজ রাজেশ্বরী

প্রকাশকের কথা

ভাইজী (ঁজ্যোতিষ চন্দ্র রায়) অজস্র ধারায় মাতৃ কৃপালাভে ধন্য হইযাছিলেন। মা অকুণ্ঠভাবে তাঁহাকে দিযাছিলেন একান্তে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। সেই সুবর্ণসুযোগে ভাইজী মাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং মাযের উত্তব তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়া রাখিতেন। মাতৃবাণী ও মাতৃলীলা কাহিনীর রত্নাকর সেই দিনপঞ্জীর ফসল - সদ্‌বাণী, শ্রীচরণ, দ্বাদশবাণী ও মাতৃদর্শন।

"মাতৃদর্শনের" দ্বিতীয সংস্করণের ভূমিকায় (১/৬/১৯৪৮) মাতৃভক্ত ঁগঙ্গাচবণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছিলেন - "... ভাইজীর স্বহস্ত লিখিত আর একটি বড় বই আছে যাহাতে তিনি শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ হইতে শুনিযা তাঁহার জীবনেব অনেক কাহিনী প্রায় মায়ের কথাতেই লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। অনেকগুলি প্রসঙ্গ ঐ গ্রন্থ হইতে অতি সংক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ কবিযা ভাইজী তাঁহার 'মাতৃদর্শনে' নিবিষ্ট কবিযাছেন।"

শ্রীশ্রীমা ও পিতাজীর সঙ্গে কৈলাস যাত্রার পূর্বে ভাইজী সম্পূর্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের হস্তে দিযা যান এবং অনুবোধ করেন যাহাতে উহার যথাযথ সম্পাদনা করিয়া শীঘ্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৈলাস হইতে ফিবিবাব পথে তিনি ১৯৩৭ অব্দে চবা ভাদ্র ঝুলন দ্বাদশীতে আলমোড়ায় দেহত্যাগ করেন। ভাইজীর তিরোধানের অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাচবণ দাশগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক 'মাতৃদর্শন' প্রকাশিত হয়।

ভাইজীর পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশ অসম্পাদিত অবস্থায় গঙ্গাচবণ দাশগুপ্ত মহাশযের নিকটে ছিল। অল্পকাল পরেই তাহার নিকট হইতে গুরুপ্রিযাদিদি উহা লইয়া যান। যতদূর জানা যায় ঐ পাণ্ডুলিপি দিদির নিকট যত্ন সহকারে গোপনে রক্ষিত ছিল।

বেনাবসে ১৯৫৬ সালে মে মাসে অভূতপূর্ব আডম্বডেব সহিত শ্রীশ্রী মাযেব ষষ্ঠতম জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের সময় ব্যস্ততার মধ্যে গুরুপ্রিয়া দিদি তখন অসুস্থ থাকার দরুন এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণেব জন্যে ইহা অমল সেন মহাশয়ের হাতে দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীর কাছে এটি রক্ষিত ছিল। ১৯৭০ সাল

নাগাদ তিনি নিউ দিল্লীতে এটি জিতেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে দিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে মার উপস্থিতিতে ইনি বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিবার পর এই পাণ্ডুলিপি তাঁহার গৃহে পূজার ঘরে বইয়ের আলমারিতে রক্ষিত ছিল ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। তখন তাহার পুত্র এটি আবিষ্কার করিয়া স্বামী পরমানন্দজীকে (জেনারেল সেক্রেটারী, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ) ইহার বিষয়ে জ্ঞাত করান এবং স্বামীজির পাণ্ডুলিপিটি সাবধানে রাখিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

মায়ের তিরোধানের পর স্বামিজীর কাছে এই কথা পুনর্বার উল্লেখ করাতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাণ্ডুলিপিটির ফটোকপি আনাইলেন। তিনি অসুস্থ থাকায় ব্রহ্মচারীগণ পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ পড়িয়া শুনাইলেন। এটি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও ডঃ গোপাল দাশগুপ্তকে এটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিবার জন্য চিঠিতে নির্দেশ দেন। ১৯৮৫ সালে 'মায়ের কথা' নামে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় - অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, ২৩শে এপ্রিল।

গুরুপ্রিয়াদিদির স্বহস্ত লিখিত নিবেদন হইতে জানা যায় যে ভাইজীর উক্ত পাণ্ডুলিপিটি মাকে পড়িয়া শোনান হইয়াছিল। শুনিতে শুনিতে কোনও কোনও সময় মায়ের তাৎকালিক খেয়ালে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল তাহাও ইহাতে যথাস্থানে সংযোজিত আছে। গুরুপ্রিয়াদিদি নিবেদনে আরো লিখিয়াছেন যে "...পরিষ্কার বুঝিবার জন্য সামান্য কিছু যোগেশ ব্রহ্মচারী বাকি সবটাই আমি ও কমল বিশেষভাবে মার নিকট পড়িয়া বুঝিযা যতটা সম্ভব কাগজ বদল করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। ...এইভাবে যতটা পারিয়াছি সত্য ঘটনা লিখিয়া রাখিলাম। ১৬ বছরের চেষ্টায়।.."

বর্তমান গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধি-সংশোধনের এবং মায়ের দিব্য জীবনের বিষয় ও ঘটনাগুলি কালক্রমানুসারে সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মায়ের কিছু বিশেষ বাণী স্পষ্ট (Bold) অক্ষরে দেওয়া হইল এবং পাঠকদের সুবিধার জন্য কিছু কিছু বিষয়ের উপরে টিকা উপস্থাপন করা হইল। ইহা ছাড়া নক্সা এবং মানচিত্রও দেওয়া হইল।

এই সকল অতিরিক্ত তথ্য শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সংরক্ষণশালা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ভাইজীর (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১৮৮০-১৯৩৭)

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের যে ভক্তগণ প্রথম প্রথম মাকে দেবীরূপে জানিয়া ছিলেন, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচাবী জ্যোতিষ চন্দ্র বায় আই, এস. ও তাঁহাদেব মধ্যে অন্যতম। তিনি মায়ের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহাব নিত্য ধ্যেয়া জগদ্ধাত্রী দেবীকে। তাঁহার পরম সৌভাগ্য এই যে, মা তাঁহাকে ধর্ম পুত্রবপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি সর্বজন মান্য ভাইজী।

ভাইজীর পূর্বাশ্রমের নাম ''জ্যোতিষ চন্দ্র রায়'; পিতার নাম ''গোবিন্দ চন্দ্র রায়'। ইনি ঋষিকল্প লোক ছিলেন। ১৮৮০ অব্দে চরা শ্রাবণ, (১৬ই জুলাই) শুক্রবার শুক্লা দশমীতে ভাইজীর জন্ম। চট্টগ্রামেব বিশেষ সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে ভাইজীর জন্ম ও শিক্ষালাভ। তাঁহার জীবনলীলাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ছিল সহজ, সুন্দব ও পবিত্র।

তাঁহার জীবন সায়াহ্নে মা তাঁহাকে মানস সবোবরের তীরে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন মৌনানন্দ পর্বত। মা প্রকাশ করিযাছিলেন যে ভাইজী, অনেক জন্ম ধবিয়া সাধু ও সত্যান্বেষী ছিলেন। ঢাকার বমনা আশ্রমে মা'র কুঠিয়ার নিচে তাঁহাব একটি সমাধি ছিল।

ভাইজী যখন ঢাকার কৃষি বিভাগে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন, লোকমুখে শ্রীশ্রী মা'র দিব্য গুণ ও শক্তির কথা শুনিয়া মনে তাঁহার দর্শন করিবার তীব্র ইচ্ছা জাগে। ১৯২৪ সালের শেষ দিকে তাঁহার দুই সহকর্মীর সহিত সাহবাগে তাঁহার দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই মা'র মধ্যে তিনি তাঁহার নিত্য ধ্যেয়া দেবীকে দেখিয়াছিলেন - যাঁহাকে এতদিন তিনি বহু তীর্থস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন। মা'র কৃপায় তাঁহার জীবনে বর্ণাশ্রমের চাবটি স্তর - ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কৈলাস মানস সরোবর হইতে ফিরিবার কালে তিনি ২রা ভাদ্র ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে (১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৭) আলমোড়ায় নরলীলা সংববণ করেন।

ভাইজীর তিরোধানের অব্যবহিত পরে বাবা ভোলানাথ ৮/৯/৩৭ তারিখে গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়কে যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"শেষ সময় পর্যন্ত জ্যোতিষের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর একটু পূর্বে আমাকে বলিল, বাবা, দেখলেন তো, এই সংসারে কেহ কারো নয়। একমাত্র শ্রীশ্রীমাই সত্য। তারপর 'মা' 'মা' বলিয়া প্রণব উচ্চারণ করিল। হরিরামকে ডাকিয়া বলিল,- শোন! We are all one. মা আমি এক বাবা আমি এক। তারপর তোমার মার দিকে চাহিয়া 'মা' 'মা' ডাকিতে ডাকিতে ধীরে লীলা সাঙ্গ করিল।"

'আনন্দময়ী মা' নামটি ভাইজীর দেওয়া - যে নামে সারা পৃথিবীতে মা পরিচিত। আদর্শ আশ্রম, প্রার্থনা ও কীর্ত্তন, মার জন্মতিথি উৎসবের উদ্‌যাপন ও সেই উপলক্ষে সাত রং এর পতাকা তৈরী - এ সবই ভাইজীর পরিকল্পনার ফল। তাঁহার নিজের জীবন ছিল একটি আদর্শ জীবন যাপনের উদাহরণ।

বইটি পড়িবার সময় ভাইজীর শেষ কথাগুলির অর্থ, যথার্থ মর্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

সম্পাদক

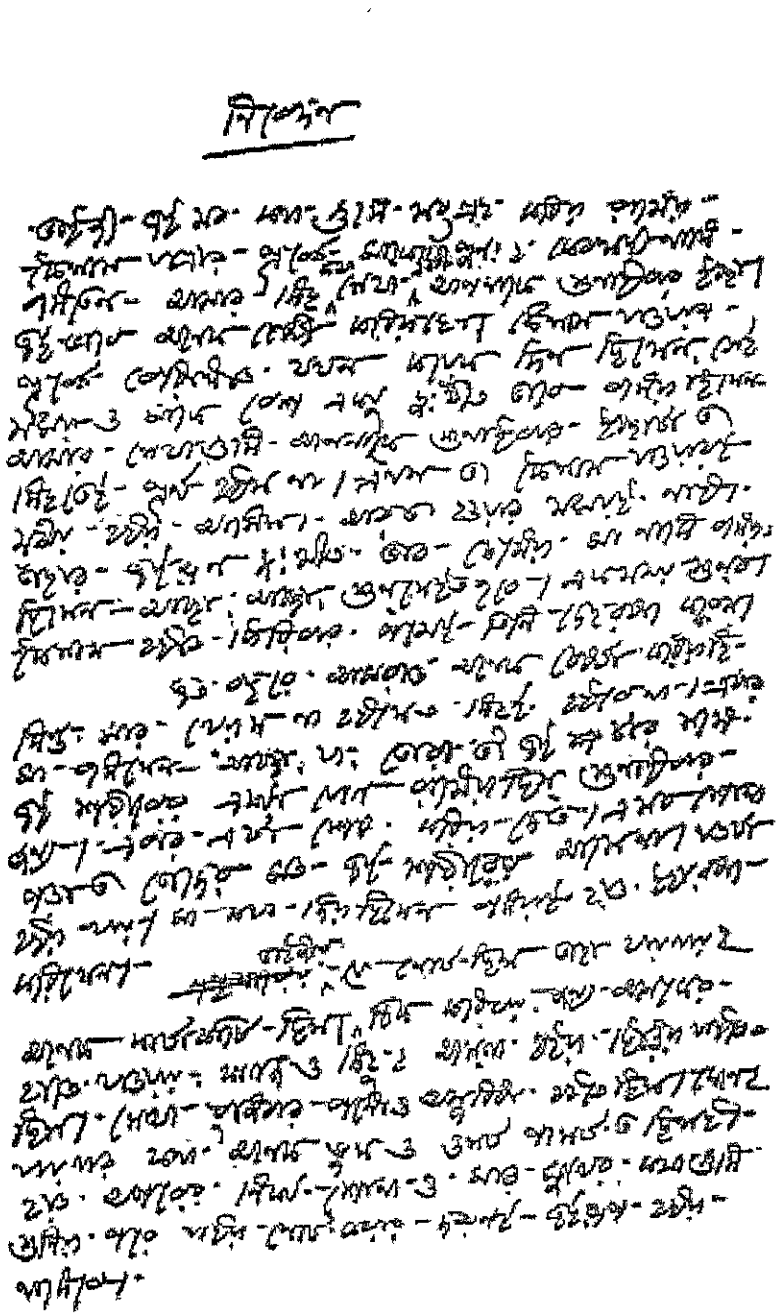

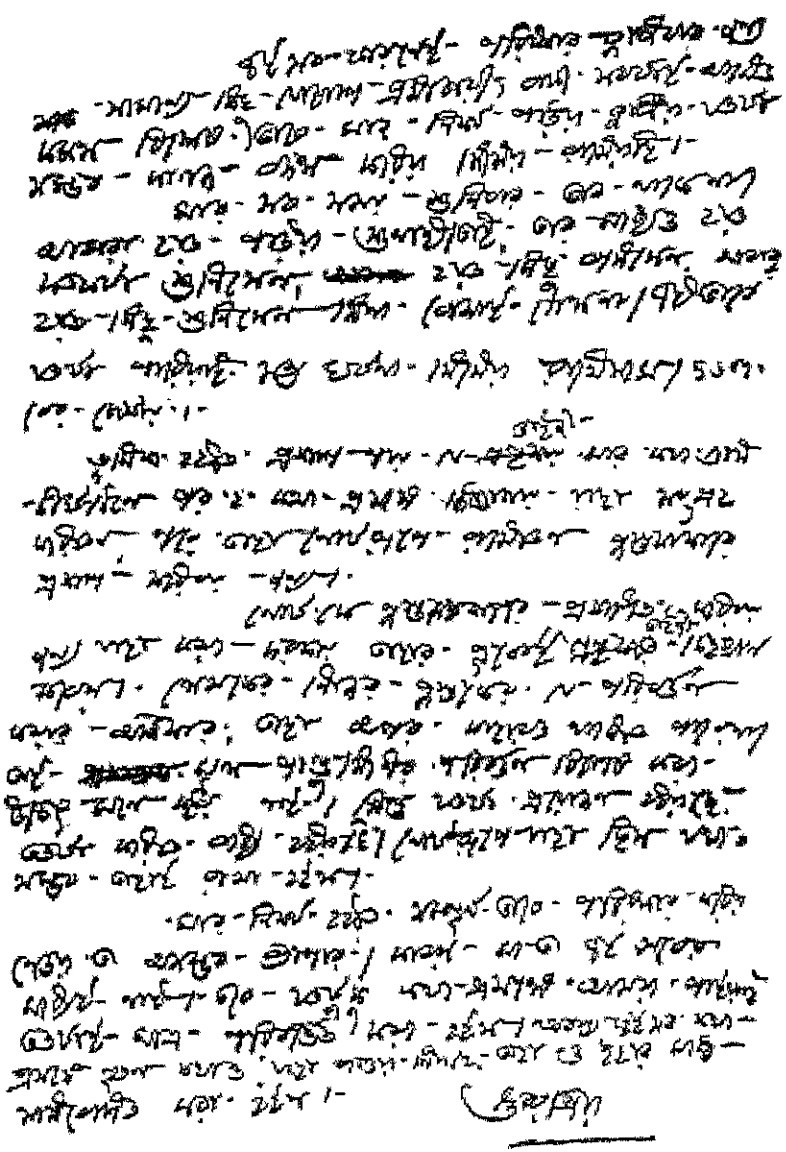

(গুরুপ্রিয়া দেবীর স্বহস্তে লিখিত নিবেদনের ফটো কপি)

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ১-২৩

১। পূর্ব বিবরণ, ২। মা'র প্রকাশ - খেওড়া গ্রামে, ৩। বাল্যলীলা, ৪। তিন ভাইয়ের জন্ম ও মৃত্যু, ৫। পিতামাতার দীক্ষা, ৬। আদেশ পালন, ৭। ভগিনী সুরবালা, ৮। বিদ্যালয়ে মা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৪-৪৩

১। বিবাহ, ২। ভাসুরের সংসারে মা, ৩। বিদ্যাকূটে, ৪। ছোটমামার দেহত্যাগ, ৫। ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে, ৬। হরকুমারের ভবিষ্যৎ বাণী, ৭। দেবালয়ে একাত্মভাব, ৮। ভাবানুযায়ী ক্রিয়াদির পরিবর্তন, ৯। ঘর বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা, ১০। অষ্টগ্রামে থাকা, ১১। দৈব ঔষধ। ১২। তুলসী-তলায় কীর্তনে মা, ১৩। কীর্তনে মার প্রথম ভাবাবস্থা, ১৪। গগন সাধুর কীর্তন, ১৫। কীর্তনে গৌর নিতাই, ১৬। ভাগবত শ্রবণে জ্যোতির প্রকাশ, ১৭। হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত আসনাদি।

তৃতীয় অধ্যায় ৪৪-৬৪

১। অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূটে, ২।সত্য ঘটনার প্রকাশ, ৩। বিবাহ উপলক্ষ্যে, ৪। বিগ্রহ-স্পর্শ লীলা, ৫। রোগ আরোগ্য করা, ৬। ধর্মনিষ্ঠদের সহিত যোগসূত্র, ৭। কসবা-কালী দর্শন, ৮। ডাকপিয়ন হরিশ, ৯। বিদ্যাকূট হইতে আটপাড়ায়, ১০। প্রতিবেশীগণেব সেবা, ১১। বাজিতপুরে মা, ১২। তুলসীমালা পরিবার উপদেশ, ১৩। ভূদেববাবুব বাসায় কীর্তনে মা, ১৪। বাজিতপুবে কালীপূজা, ১৫। কাজেব খেয়াল ও তাহার উপায়, ১৬। অবিদ্যাব মায়ার খেলা, ১৭। মার ভোজ রান্না, ১৮। ঠিকা ঝি, ১৯। ভোলানাথের কুকুর পোষা, ২০। ভোলানাথ, পিতা ও আশুর রোগারোগ্য।

চতুর্থ অধ্যায় ৬৫-১০৪

১। বাজিতপুরে ঊষাদিদি ও জানকীবাবু, ২। ঢাকাতে দুই বোনের বিবাহ, ৩। সাধু শিবানন্দ, ৪। লক্ষীর ঘটে পূজা, ৫। হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, ৬। দীক্ষার খেলায় মা, ৭। পরিচয় দান, ৮। সাধনার খেলায় মা, ৯। ষট চক্রের গ্রন্থি-চক্রাদি, ১০। জীবন্ত দেবদেবীর প্রকাশ, ১১। প্রতিবেশীদের উপদেশ, ১২। সাধনার খেলায় একটি কুকুর, ১৩। বাহ্যিক পূজার খেয়াল নাই, ১৪। সংসার আশ্রমে পতি-সেবা, ১৫। ভয়ের স্বরূপ, ১৬। ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্ময় বাণলিঙ্গ শিব, ১৭। সাধনার খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ও প্রকাশ, ১৮। পূজা পাঠ জপ বিষয়ে মা, ১৯। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, ২০। ভবিষ্যৎ বাণী, ২১। মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, ২২। পূর্ণ প্রকাশ, ২৩। সাধকের একটি অবস্থা, ২৪। আরব দেশীয় মহাপুরুষ, ২৫। প্রণামে প্রতিক্রিয়া, ২৬। ক্ষেত্রপালের ওঝাগিরি, ২৭। চরকায় সুতা কাটা, ২৮। কয়েকটি ঘটনা।

পঞ্চম অধ্যায় ১০৫-১২৫

১। ভোলানাথের বাড়ী, ২। ভোলানাথের দীক্ষা, ৩। সাধনার খেলার বিভিন্ন দিক, ৪। দৃষ্টিতে আরোগ্য, ৫। মায়ের নামে শিব পূজা, ৬। অসীমের আভাসে সীমার বন্ধন ক্ষয়, ৭। কুণ্ডলী দিয়া কথা বলার সূত্রপাত, ৮। ভোলানাথের অসুস্থতা, ৯। ঊষাদির 'মাতৃ' সম্ভাষণ, ১০। বিদ্রুপের পরিণাম, ১১। এক সাধুর পরিবর্তন, ১২। আশুর উপনয়ণ ও ভোলানাথের মানসিক কালী পূজা, ১৩। বিদ্যাকূটে মা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৬-১৫৪

১। ভোলানাথের সাহবাগে বদলী, ২। আহারের পরিবর্তন, ৩। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে সাত দিন, ৪। কুশারী মহাশয়ের সহিত কৌতুক লীলা, ৫। রমনা কালীবাড়ীতে, ৬। অতিথিরূপে, ৭। সমাধিস্থ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে রমনা আশ্রম, ৮। লক্ষ্মীপূজা, ৯। সাধকের কর্তব্য, ১০। উপলব্ধি, ১১। মূর্তিদর্শন ও তত্ত্ব, ১২। সাধকের শ্রেণী বিভাগ, ১৩। হরিনামে মা, ১৪। কীর্তনের সপ্তভূমি, ১৫। সর্বরূপে অরূপে স্বরূপেরই প্রকাশ, ১৬। দীক্ষাদানের যোগ্যতা, ১৭। সাধকের বিভিন্ন দিক, ১৮। মায়া ও জ্ঞান, ১৯। সংসারে আদেশ পালন, ২০। ভোলানাথের আদেশ নির্বিচারে পালন

সপ্তম অধ্যায় ১৫৫-১৭১

১। দর্শনার্থীর আগমন, ২। জ্যোতিষের সহিত ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ, ৩। গৃহকর্মে ভাবাবেশ, ৪। ভোলানাথের উৎকণ্ঠা, ৫। এক সত্ত্বা ভাব, ৬। ফলাহারের খেয়াল, ৭। অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত পালন, ৮। সাহবাগে মা, ৯। দীপান্বিতা পূজা, ১০। প্রমথবাবুর মৌনব্রত, ১১। অতি ভোজন, ১২। পরীক্ষা নেওয়াব বিপদ, ১৩। বিভূতি, ১৪। দিদিমাব সহিত অন্নাহার, ১৫। অমাবস্যার ভোগের সূত্রপাত।

অষ্টম অধ্যায় ১৭২-১৮৯

১। খুকুনীর মাতৃদর্শন, ২। সূর্যগ্রহণে প্রকাশ্য কীর্তন, ৩। দৃষ্টিতে যুবকেব পরিবর্তন, ৪। ভোলানাথের কথায় নানা স্থানে যাওয়া ও রোগারোগ্য করা, ৫। শশাঙ্ক বাবুর মাতৃপূজা, ৬। স্ব-হস্তে অন্নগ্রহণে অক্ষমতা, ৭। একটি বালিকার রোগারোগ্য, ৮। আশ্রমে পূর্ণিমার ভোগ, ৯। কাঙ্গালী ভোজন, ১০। চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম, ১১। বাসন্তী পূজা ও লাবণ্যের ভাবাবেশ, ১২। প্রণামে শরীরে প্রতিক্রিয়া, ১৩। মরণীর ফাঁড়া, ১৪। জ্যোতিষ ও নিরঞ্জনের প্রার্থনা, ১৫। শ্রীশ্রীমায়ের হস্তলিপির জন্য প্রার্থনা।

নবম অধ্যায় ১৯০-২২৩

১। সাধকের পথে বাধাবিঘ্ন, ২। কীর্তনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, ৩। কীর্তনে যোগেশেব সহিত মায়ের লীলা, ৪। অন্নগ্রহণ লীলা, ৫। বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে মা, ৬। প্রমথবাবুর বাড়ীতে মা, ৭। সাহবাগে কালীপূজা, ৮। যজ্ঞাগ্নি রক্ষাব ব্যবস্থা, ৯। বীরেনের কালীপূজা, ১০। যজ্ঞাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন, ১১। নির্মলবাবুর বাসায় মাযের সূক্ষ্মে গমন, ১২। কলমাকান্তের মাতৃদর্শন, ১৩। বিনা জলপানে, ১৪। পাওলদিয়া গ্রামে মা, ১৫। জ্যোতিষের অসুস্থতা, ১৬। যোগেশের ভিক্ষাবৃত্তি, ১৭। রোগমূর্তি, ১৮। পূর্ণকুম্ভে হরিদ্বারে যাইবার আয়োজন, ১৯। কলিকাতায় মা, ২০। হৃষীকেশে জ্যোতিষের অসুস্থতার সংবাদ, ২১। শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে মনসা পূজায, ২২। হীরালালের ফাঁড়া, ২৩। মা'র আদেশ না পালনে বিপত্তি, ২৪। রোগ সারানোর খেয়াল, ২৫। মার জবাব, ২৬। মনুর সর্পাঘাত যোগ, ২৭। শরীরের ঘুরিবার খেয়াল, ২৮। এক বস্ত্রে ভ্রমণ, ২৯। গিরিডিতে মা।

দশম অধ্যায় ২২৪-২২৯

১। মার শরীবে যোগ-বিভূতির প্রকাশ, ২। সাহবাগে স্বতঃস্ফূর্ত নমাজ পাঠ, ৩। যোগ-বিভূতি ও স্বভাব-বিভূতি, ৪। সাধকের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে সতর্কবাণী,

৫। শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে দুর্গা পূজায়, ৬। মায়ের নিকট আসা ও যাওয়া।

একাদশ অধ্যায় ২৩০-২৪৪

১। বিন্ধ্যাচলের সাপের কথা, ২। ভোলানাথের মাতৃপূজা, ৩। ভোলানাথের তারাপীঠ গমন, ৪। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ, ৫। কালীমূর্তির স্থানান্তর, ৬। আগ্রহজনিত কর্মের সুফল, ৭। আশ্রম প্রতিষ্ঠা, ৮। ঢাকা ত্যাগ, ৯। হরিদ্বার, অযোধ্যা, দেরাদুন ও কাশীতে মা, ১০। নবদ্বীপের মৌনীবাবা।

দ্বাদশ অধ্যায় ২৪৫-২৬০

১। ভোলানাথের অসুখ, ২। রোগ সম্বন্ধে মায়ের খেয়াল, ৩। রক্তের উপলক্ষ্যে - ভাবান্বিত মা, ৪। সাধনায় সাধকের শরীর, ৫। প্রতিদিন মাঠে বেড়ানো, ৬। জ্যোতিষকে যজ্ঞোপবীত দান, ৭। ধর্মপুত্ররূপে জ্যোতিষ, ৮। শকুনকে প্রসাদ দান, ৯। দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ, ১০। আশ্রমে পঞ্চবটী, ১১। এক যুবক সন্ন্যাসী, ১২। কালীমূর্তির অঙ্গে আঘাতে মায়ের শরীরে প্রতিক্রিয়া, ১৩। ঢাকা আশ্রমের নীচে সমাধি, ১৪। ঢাকা হইতে যাত্রা।

উপসংহার ২৬১

পরিশিষ্ট ১ ঃ শ্রীশ্রী মা'র প্রকাশ ২৬২

পরিশিষ্ট ২ ঃ মায়ের আত্ম পরিচয় ২৬৪

পরিশিষ্ট ৩ ঃ গ্রন্থি চক্র ২৬৬

পরিশিষ্ট ৪ ঃ মহাবাক্য ২৬৮

পরিশিষ্ট ৫ ঃ ভোলানাথজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৭০

পরিশিষ্ট ৬ ঃ রমনা ময়দান ও সাহবাগের বিবরণ ২৭৪

পরিশিষ্ট ৭ ঃ শ্রীশ্রী মার স্বতঃস্ফূরিত স্তোত্র ও অর্থ ২৭৭

মাতৃলীলার প্রথম ভাগের সহিত সংযুক্ত ব্যাক্তিদের পরিচয় ২৭৯

ভারত ও বাংলাদেশের মানচিত্র

রমনা আশ্রম ও সাহবাগের নক্সা

চিত্রের বিবরণ (ফটো ক্যাপশান)

১। শ্রীশ্রী রাজ-রাজেশ্বরী।

২। শ্রীশ্রী চালনা শিব।

3¼ শ্রীশ্রী রাজ-রাজেশ্বর শালিগ্রাম।

৪। সিদ্ধাসনে শ্রীশ্রী মা।

৫। শ্রীশ্রী কসবা কালী।

৬। প্রাচীন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী - যেখানে শ্রীশ্রী মা'র ভাব হইয়াছিল, সেটি এখন কুমারটুলি, কলকাতায়।

৭। শ্রীশ্রী মায়ের কপালে জ্যোতি (চিত্র - অক্টোবর ১৯২৬)।

৮। সাধন লীলার সময় শ্রীশ্রী মা।

৯। শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী।

১০। সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ণ স্থানে বেদীর দুই পাশে বসা শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী। বেদীর উপর থামটির উচ্চতা শ্রীশ্রী মা'র বসার অবস্থায় উচ্চতার সমান।

১১। রমনা কালীমন্দির ও পিছনে ভগ্ন মন্দিরটির হস্ত-অঙ্কিত চিত্র।

১২-১৭। শ্রীশ্রী মার সমাধির বিভিন্ন স্তরের ছবি।

১৮। শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীর ঃ প্রথম তোলা ছবি - ১৯২৫ সালের জুন মাসে।

প্রথম সারিতে ঃ বাউল চন্দ্র বসাক, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বেদীর উপরে ঃ বাবা ভোলানাথজী ও শ্রীশ্রী মা।

১৯। সাহবাগে শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীর সঙ্গে বালিকা মরণী ঃ ১৯২৬ মার্চ মাস, বাসন্তী পূজার পরে।

২০। শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচাবী ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ।

২১। মা কালীর আবির্ভাবের সময় মা'র বাঁ হাত উঠিয়া যায়, তাঁর পাশে ভোলানাথজী - ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়ের টিকাটুলির বাড়িতে।

২২। দেরাদুনের কল্যাণবন আশ্রমে কমলাকান্তদা যজ্ঞে রত।

২৩। দেরাদুনের কিশনপুর আশ্রম ভোলানাথজীর মন্দিরের সামনে বসা ব্রহ্মচারী যোগেশদা।

২৪। শ্রীশ্রী তারামা, তারাপীঠ, পশ্চিমবঙ্গ।

২৫। ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী প্রথম আশ্রমের ছবি।

২৬। সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী ভাইজীকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

২৭। শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মা, বর্তমানে কাশী আশ্রমে।

২৮। শ্রীশ্রী মা, ভোলানাথজী ও ভাইজী - ১৯৩২ সালে জুন মাসে ঢাকা ছাড়ার পর।

প্রস্তাবনা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ছিলেন সর্বব্যাপী, অখণ্ড, অসীম সত্ত্বাস্বরূপ, তাঁহাকে জানিবার, বুঝিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের কোথায়? ভাইজী ছিলেন এক অসাধারণ সাধক, সেই কারণে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল মায়ের দিব্য লীলা আস্বাদন করা এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তিনি সেই দিব্য লীলা পরম যত্নসহকারে নিজ হস্তে লিখিয়া রাখিয়া দিয়াছেন - ১৮৯৬ হইতে ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত - ৩৬ বছর সময়ের বিবরণ অর্থাৎ মায়ের বাল্যলীলা ও সাধন লীলা তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়।

একশ বছর পূর্বে গ্রামীণ বাংলাদেশ, বাংলার সামাজিক জীবনেব ছবি আমরা পাই মায়ের নিজস্ব সোজা-সরল ভাষাব মাধ্যমে ভাইজীর লেখা হইতে - শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যজীবনের রূপ যাহা একবিংশ শতাব্দীতে অকল্পনীয়।

মায়ের বাল্যলীলা হইতে দিব্য শক্তির আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অসাধারণত্বের প্রকাশ পাইত - তাঁহার প্রতি ব্যবহারে, কোন বস্তুর প্রতি আসক্তির অভাব, শারীরিক কোন ক্লেশের প্রতি অবিচল থাকা এবং তাঁহার সদা প্রফুল্ল ভাব। ১৩ বছরের কোমল বয়সে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব একা বহন করাব মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই এক কর্মযোগিনীর রূপ। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জাতি নির্বিশেষে সকলেই চুম্বকের ন্যায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যায় মায়ের অসাধারণ সাধন লীলার গভীর, নিগূঢ় বিস্তারিত বিবরণ। প্রতিটি সাধনার, ভক্তি, তন্ত্র, যোগ এবং জ্ঞান - স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল মা'র শরীরে। এই বিবরণ হইতে সাধক নিজস্ব আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবার পথনির্দেশ লাভ করিতে পারিবে এবং ইহা হইতে পদস্খলনেব সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারিবে। বিশ্বের আধ্যাত্মিক সাহিত্য জগতে এটি এক অনুপম পুস্তক।

- সম্পাদক

ভূমিকা

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে বিভিন্ন সময়ে পর পর প্রশ্নের উত্তরাদি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত মাত্র।

মায়ের কোন প্রকার খেলায় বা বাক্যে এ পর্যন্ত তাঁহার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত কেহ কখনও শোনে নাই। তিনি তদ্বিষয়ে একেবারে নীরব। অনুলেখকের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় প্রারব্ধ ভোগের জন্য এই শরীর আসে নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। তবে মায়ের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে যদি কাহারও কোনরূপ ধারণা বই পড়িয়া হয়, তবে তাহা লেখকের ভাষার ত্রূটীর দরুন। যে সকল যোগজ, মন্ত্রজ, সাধনজ পূর্ণতা ঐ শরীর আশ্রয় করিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবে খেলিয়াছে তাহা মনে হয় শুধু আমাদের জন্যই। যদি কেহ এক লক্ষ্যে কাজ করিয়া যায় তবে হয়ত স্বাভাবিক ভাবে ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে ঐ সকল ফুটিয়া উঠিবার আশা এবং বাস্তবিকই মানুষেই তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে। মায়ের ঐ সকল ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা আমরা ধরিয়া নিতে পাবি কি?

- অনুলেখক

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব বিবরণ

একদিন কথায় কথায় মার পূর্ব বিবরণের কথা উঠিলে আমাব বিশেষ আগ্রহ সহকারে বার বার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন।

ঐসময়ে এই শরীরের মাতুলালয়ে প্রতি বৎসর দোল ও দুর্গোৎসবাদি হইত। শরীরের মার নাকি সর্বদা ভগবানের নিকট এবং পূজার সময় শ্রীদুর্গার নিকট স্বভাবতঃ সন্তান প্রার্থনা জাগিত। তাহার পরই একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েক মাস[১] পরেই সেই সন্তানটি গত হইলে মার সুসন্তান কামনার প্রার্থনা আরও গভীরের দিকে।

এই শরীরের পিতা অতিশয় কীর্তনপ্রিয় ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরিয়া কীর্তনে দিন কাটাইতেন। কেহ কেহ বলিত, না জানি কাহাব ঘবের এমন সোনার চাঁদ ছেলে মা বাপ পরিজনদের কাঁদাইয়া বাহির হইযা আসিয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে তাঁহার মাতুলালয খেওড়া গ্রামেই[২] অতিবাহিত করেন। তাঁহাব মা তাঁহাকে বহুদিন যাবৎ খুঁজিয়া পান নাই। একমাত্র পুত্র সন্তান বলিযা সর্বদাই কান্নাকাটি করিতেন - ছেলেটি উদাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এমন কি শুনিয়াছি কিছু সময়ের জন্য গেরুয়া বস্ত্রও নাকি ব্যবহাব করিয়াছিলেন। একদিন খবব আসিল যে তিনি কোন গ্রামে কীর্তনাদিতে দিনাতিপাত করিতেছেন। তখন অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে সেখান হইতে বাড়ি ফিরাইয়া আনা হয। তাঁহার ভগবৎ প্রীতি এবং নাম-গানে অনুবাগ স্বভাবতঃই ছিল, কণ্ঠও ছিল মধুর।

এই শরীরের ঠাকুরমা অতিশয় ধর্মশীলা এবং সবল প্রকৃতির ছিলেন। এই শরীরের তোমাদের দৃষ্টিতে বিবাহ দিবার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহাবও

[১] ৯ মাস বাঁচিয়াছিলেন।

[২] "ব্রাহ্মণবাড়ীয়া" জেলায় বাংলাদেশের সীমার নিকট স্থিত।

মন্দিরাদিতে গেলে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট পুত্রের সুসন্তান কামনা থাকিত। ইহার ভিতর তিনি একদিন প্রসিদ্ধ কসবা কালীবাড়ি যান।[৩] সেখানে মনে পৌত্র মুখদর্শন প্রার্থনা করিতে বসিয়া নাকি হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইযা গেল - পৌত্রী হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার বিবাহে মা কালীকে ভালভাবে পূজা দিব। নমস্কার করিয়া উঠিতেই তাঁহার খেয়াল হইল যে তিনি পুত্র প্রার্থনা করিতে আসিয়া কন্যা চাহিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হইল এত আকাঙ্খা করিয়া এতদূর হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসিলাম[৪] নাতির কথা বলিব বলিয়া, মা আমাকে ভুলাইয়া দিলেন। আচ্ছা! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শরীরের মায়েরও ত যেন কোন দেবদেবীর মন্দিরাদিতে গেলেই স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রার্থনা জাগিত। কিছু সময়ের মধ্যেই এই শরীরটা।

আবার একদিন মার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে কথায় কথায় মাকে প্রশ্ন করিলাম - আমাদের দেখা সদ্যোজাত শিশু অবস্থার বিবরণ কি করিয়া বলা সম্ভব? উত্তরে মা বলিলেন - সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল ত হয় না। যতটুকু আসে...

এই শরীরের বালিকা বয়স হইতে বড় প্রভৃতি সাজিয়া যাহা যাহা দেখার দিক, তাহা যেরূপ তোমাদের বলিযা থাকে, তোমাদের এই শরীরটা দেখার অব্যবহিত পরে অবস্থাদি এই শরীরের বেলাও প্রায় তদ্রুপই মনে কর না। এই শরীরের সবই ত তোমাদের প্রয়োজনানুযায়ী আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। এই সব বলাবলিও তোমাদের আগ্রহে সেইরূপ আসিতেছে।

কিন্তু মনে রাখিস্ ছেলেদের যজ্ঞোপবীতের সময় জীবের যে পুনর্জন্ম সংস্কার, দ্বিজ বলে না? ধর না যেমন মন্ত্র, সূত্র ও নূতন বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদের বহিরাবরণ পরিবর্তিত করা হয়। আর এইখানে এক নব কলেবর সংঘটিত দেখিতেছ ত। ইহা যে তোমাদের দৃষ্টিতে। জীবের পক্ষে গুরুকৃপা বা বিনা সাধনায় এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। শক্তি কোথায়? উপমা কিন্তু সর্বাঙ্গীন হয় না, যেটুকু ধরিবার ধরিয়া নেওয়া। মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম - আমরা কি ভাবে ধরিব? উত্তরে মা হাসিয়া বলিলেন - আরে! ধরা না দিলে ধরে কে?

[৩] ত্রিপুরা প্রদেশের আগরতলা জেলায় ভারতের সীমার নিকট স্থিত।

[৪] ছয় মাইল।

কনখলে গঙ্গার তটে বাঁধান গাছতলায়[৫] বসিয়া জন্মকথা ইত্যাদি আলোচনায় ও বার বার প্রশ্নে ও বিশেষভাবে জিজ্ঞাসায়, মা কেমন একভাবে বলিতে লাগিলেন - কথা ত কতই। এলোমেলো কথা কিছু শুনবি তো শোন্।

মার প্রকাশ - খেওড়া গ্রামে

বৈশাখ মাস বৃহস্পতিবার রাত্রি অবসানের দিক দিয়া এই শরীর খেওড়ায় এক খড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে ত।[৬] প্রায় পূর্ব ও উত্তর কোনের দিকে মাথা। শরীর কিন্তু তোদের দেখায় মাটি স্পর্শ মাত্রই চিৎভাবে একটু বামে হেলিয়া যায়। তখনই এই শরীরের ঠাকুরমার আপন খুড়িমা ধরিয়া তোলেন। কেবল তিনিই একমাত্র ঐ সময়েতে এ ঘরে ছিলেন। আর ত কেউ ছিল না। তার প্রকাশ তিনিই জানেন।[৭] খড়ের চালের ফাঁক দিয়া নিমগাছ ও আমগাছের ডাল পাতা দেখিতেছিলাম। ঠাকুরমার এই খুড়িমার বয়স তখন ৬০ বছরের কাছাকাছি। তিনি বড় নিষ্ঠাবতী ও শুদ্ধাভাবাপন্না স্ত্রীলোক ছিলেন। এই শরীরের বিবাহের পর তিনি মারা যান।

পরদিন প্রাতে ঐ গ্রামেরই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে আসেন। ঠাকুরমা ঘরের দরজায় যাইয়া হাঁটু গুঁজিয়া বসিয়া এই শবীরকে কোলে করিযা তাঁহাকে দেখান। সেই সময় ঐ ব্রাহ্মণ নাম রাখিলেন 'দাক্ষাযনী'। তখন এই শরীরের মাথা ঠাকুরমার হাঁটুর উপর পূর্ব দিকে ছিল।[৮] উর্দ্ধ দিকে চাহিতে চোখে পড়িতেছিল কয়েকটি গাছের ডালপাতা ও আকাশ।

[৫] হরিদ্বারেব কনখল ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের সন্নিকটে দক্ষযজ্ঞ মন্দিবেব ঘাটে।

[৬] ১৯শে বৈশাখ, কৃষ্ণ চতুর্থী (শুক্রবার, ১লা মে, ১৮৯৬) - সময়ঃ ৩ ১৫ মিঃ হইতে ৩.৪৫ মিনিটের ভিতরে।

[৭] অপাঞ্চভৌতিক প্রকাশের বিবরণ - দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট-১।

[৮] পূর্ব্ব দিকের বিশেষত্ব ঃ অন্ধকাব দূর কবিয়া সূর্য্য পূর্ব্বদিশায় আবির্ভাব হয। আলোক হইতে জ্ঞানেব উৎপত্তি - সেই জ্যোতি সূর্য্যের প্রতীক, এই কারণে হিন্দু আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পূর্ব্বমুখ হইযা বসিয়া করার নিযম। মাতৃলীলায বলা হইযাছে যে মা'ব নাম যখন দাক্ষাযণী দেওযা হইয়াছিল সে সময তাঁহার মাথা পূর্ব্বদিক ছিল। আবাব যে সময়ে তিনি 'পূর্ণ ব্রহ্ম নাবাযণ' রূপ নিজের পবিচয দান করিলেন, তখনও তাই ছিল, এই ধরণেব উদাহরণ বইয়েব অন্য জাযগাযও পাওয়া যাইবে।

বাল্যলীলা

এই শরীরটা সেই সময়েতে যে ঘরে ছিল সেইখানে একদিন দেখা যায় যে ঘরের বাতিটি নিভিবার মত হইল। ঠাকুরমা 'হরিবোল, হরিবোল' করিতে লাগিলেন। মা তাড়াতাড়ি এই শরীরকে বিছানা হইতে বুকের ভিতর লইয়া বাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন। পূর্বে এক মেয়ে মারা যাওয়াতে গ্রাম্যভাবে ভূতপ্রেতের ভয় উপলক্ষ্য করিয়া সব সময় এই শরীরের নিকট কেহ না কেহ থাকিত। সর্বদা ভগবানের নাম করিত ও প্রথম দিবস হইতেই এই শরীরকে তুলসীতলায় নিয়া দুই বেলা গড়াগড়ি দেওয়াইত। শরীর একটু বড় হইলে নিজেই যাইয়া গড়াগড়ি দিয়া আসিত।

মা ঘরের বাহিরে যাইবার সময় বাম পায়ে এই শরীরের চারিদিক ঘুরাইয়া ঠাকুরের নাম করিয়া রাখিয়া যাইতেন। রংটা নাকি ধব্‌ধবে ছিল, তাই মা নাম দিয়াছিলেন 'নির্মলা'। আনন্দে ঠাকুরমা নাম দিযাছিলেন 'তীর্থবাসিনী'। এইরূপে আরও কয়েকটি নাম হইয়াছিল।

এই শরীরের তিন মাস বয়েসে মা তাঁহার পিত্রালয় সুলতানপুর যান। কয়েকদিন পর সেইখান হইতে তাঁহার মামার বাড়ি যান। ভাবিলেন অল্প কয়েকদিন তথায় থাকিবেন, নিজের বাড়িতে খবর না দিলেও চলিবে। সেই বাড়ি যাইতে যখন নৌকায় উঠা হয় তখন হইতেই এই শরীরের জ্বর ও সর্দি দেখা দিল, চোখও মেলে না, খাওয়াও নাই। না বলিয়া মা মামাবাড়ি গিয়াছেন কি জানি যদি কিছু খারাপ হয় এই কারণে সকলে বিশেষ চিন্তিত হইল। ঔষধ পত্র ত যাহা করিবার করে আর দুই বেলা এই শরীরকে তুলসীতলায় নিয়া গড়াইয়া আনে। তাড়াতাড়ি যেইদিন মা সেইখান হইতে সুলতানপুর রওয়ানা হইলেন সেইদিনই নৌকায় আসিয়া এই শরীরের চোখ খুলিয়া গেল। জ্বর ও সর্দির বেগও কমিয়া গেল। সকলে এই পরিবর্তন দেখিয়া অবাক এবং বলাবলি করিতে লাগিল যে চুপি চুপি বেড়াইতে আসার দরুণ ভগবান এই শিক্ষা দিলেন। গ্রামের নিযম এই যে স্ত্রীলোকেরা কোথাও যাওযা আসা করিতে পুরুষের অনুমতি লইতে হইত।

দশমাসের বয়সের পূর্ব পর্যন্ত যখন এই শরীর বসে ও হামাগুড়ি দেয় তখন নিকটস্থ মুসলমান মেয়েরা বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে এ শরীরকে কোলে নিয়া আনন্দ করিত। দেশের প্রথায় মুখে ভাত না দেওয়া পর্যন্ত অপর জাতিতে কোন বাধা নাই। গ্রামে স্পর্শজনিত ছুঁইবার শুদ্ধি অশুদ্ধিভাব সেই সময় খুব প্রবল

ছিল। তাই এই শরীরকে মাটিতে ছাড়িয়া দিয়া দেওয়া নেওযা করিত।

একবার এই শরীরকে নিয়া ঠাকুরমা পাড়ায় এক মুসলমান বাড়িতে বেড়াইতে যান। সেখানে একাব্বর নামে একটি মেয়ে ছিল। সে শরীরকে কোলে নিতে চাহিলে ঠাকুরমা মাটিতে ছাড়িয়া দেন। একাব্বর এক বার হাত বাড়ায়, এ শরীরটা তাহার কাছে হামাগুড়ি দিয়া যায় আর সে পিছনে পিছনে সরিয়া যায়। এইরূপে সে অনেকক্ষণ খেলিতেছে ও হাসিতেছে পরে এ শরীরের এমন কান্না আসিল যে, সে কোলে নিয়া এবং কত আহ্লাদ কবিযাও আর শান্ত করিতে পারে না। অবশেষে সে হযরাণ হইয়া ভয় পাইয়া ঠাকুরমার নিকট নিয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিল। তিনি এই শরীবকে কোলে নিযা অনেক চেষ্টায় আদবে কান্না থামাইলেন। সে মেয়েটি তাহার পর হইতে আর ঐরূপ তামাসা করিত না। এ শরীরের মাব নিকট গিয়া সে বলিয়াছিল কান্না দেখিয়া তাহাব খুব ভয় হইযাছিল। সেই কথা মনে করিতেও তাহার শরীরে কাঁটা দেয়। সে মেয়েটি এই শবীবকে বড ভালবাসিত। তাহার বিবাহের পরও পিত্রালয়ে আসিলে সে এই শরীরকে দেখিতে আসিত এবং উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিত - আমি তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

ঠাকুরমার খুড়িমাকে (যিনি এ শরীর তোদের দৃষ্টিতে দেখার সময়ে ঘরে ছিলেন), এ শরীর 'বড়মা' বলিয়া ডাকিত। তাহার কয়েকটি গরু ছিল, অনেক দুধ দিত। রোজ মাঠা (ঘোল) করা হইত। যখন ছোট, ন্যাংটা অবস্থায় এ শরীর একটি বাসন পেটের উপর চাপিয়া ধরিয়া খুব ভোরে তাহাদের বাড়ি যাইত। মাঠা হইলে তিনি প্রথম এ শরীরকে একটু মাঠা ও মাখন দিতেন। সে সময় এ শরীর খুব সুস্থ ও সবল ছিল ত। কেহ কেহ তামাসা করিয়া বলিত 'চালকুমডা'।

একদিন বাসনটি পেটের উপর রাখিয়া এ শরীব মাঠার জন্য যায়। বড়মা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন - এই মাত্র মাঠা করিতে আরম্ভ করিলাম আর তিনি নিবার জন্য পূর্ব হইতেই হাজির। নিত্যই মাঠা খায়, মাঠা পাবি না, যা। বিরক্তির ভঙ্গীতে এই কথা বলিলেন। তিনি তখন দেখেন কি তাহাব মাঠা মন্থনের পাত্রটি ছ্যাঁদা হইয়া সব দই পডিয়া যাইতেছে। তখন তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন - এ কি হইল আবার। সেদিন আর মাঠা হইল না। পাত্রে যাহা ছিল তাহা হইতে তাড়াতাড়ি এ শরীরকে ডাকিয়া কিছু দিলেন। তাহার পর হইতেই এ শরীরের যাইতে দেরী হইলেও বড়মা ডাকিয়া নিয়া মাঠা দিতেন।

প্রায় আড়াই বছর বয়সে এই শরীর একবার মামাবাডি যায। পাশের বাড়িতে

রাত্রিতে কীর্তন হয়। এ শরীরকে কোলে করিয়া মা সেখানে যান এবং এক জায়গায় বসাইয়া বলেন - ঐ কীর্তন দ্যাখ, শোন্। মা বাবা যখন যে কথাটি বলিতেন ঠিক তাহাই করিতাম। সেদিন মার কথামত কীর্তনের দিকে চাহিয়া আছি, শুনিতেছি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে শরীর ঢলিয়া পড়িতেছে। মা কীর্তন শুনিতে বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক শুনিলে যেমন ভাব হয় তেমনই হইয়া যাইতেছিল। মা ভাবিলেন বুঝি ঝিমাইতেছে। তাই বার বার ধাক্কাইযা বসাইয়া দেন। আর বলেন - সকল ছেলে মেয়েবা বসিয়া আছে আর ওর কেবল ঘুম। এত চীৎকার, এত খোল করতালের আওয়াজ, এটার ঘুমই ভাঙ্গে না দেখি। এদিকে এ শরীর ত অবশ। কীর্তনের সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। কীর্তন শেষ হইয়া গেল, ঘরে আনিয়া মা শোয়াইয়া রাখিলেন। পরদিন সকালে যখন ডাকিয়া উঠাইলেন তখন এই শরীরের ঢুলু ঢুলু ভাব। মা ভাবিলেন রাত্রি জাগরণে বা কিসে এইরূপ হইয়াছে।

এ শরীরের তিন চার বছর বয়সে মামাবাড়িতে মার খুব অসুখ হয়। এ শরীর খায় দায় ঘোরে ফিরে কিন্তু মার ত্রিসীমানায় যায় না। সকলে বলে এ কেমন ধারা মেয়ে, মাকে একবার উঁকি দিয়াও দেখে না। ইহার মায়া মমতা কি একেবারেই নাই।

এই শরীরের বাবা প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে হরিনাম করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে একদিন রাত্রিতে এই শরীর বাবার নিকট শুইয়া আছে। গান শুনিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল - আচ্ছা বাবা, হরি কি? তিনি বলিলেন - হরি ভগবানের নাম। এ শরীর বলিল - আচ্ছা! তাঁহার নাম করিলে কি হয়? বাবা বলিলেন, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। এ শরীর বলিল - তিনি আসিয়া কি করেন? বাবা বলিলেন - তোমাকে যদি আমার কোন দরকার হয় তখন তোমাকে ডাকিলে তুমি যেইরূপ আস সেইরূপ তিনিও আসেন। যাহার ইচ্ছা যাহা তাঁহাকে সরল প্রাণে বলিলে তিনি তাহা পূরণ করেন। আমরা যেমন তোমাকে ডাকিযা বলি যে আমার জন্য এইটি নিয়া আস, তুমি তাহা আনিয়া দাও ত, ঠিক তেমনি ভাবে যে যাহা তাঁহার নিকট চায তিনি তাহা দেন। এই রকম আরও কত কি করেন কি বলিব। এ শরীর বলিল - তাঁহাকে হরি বলিয়া ডাকিলেই তিনি আসিবেন? বাবা বলিলেন - হ্যাঁ। এ শরীর বলিল - তিনি কত বড়? বাবা বলিলেন - অনেক বড়। এ শরীর

বলিল - ঐ যে মাঠটি আছে তাহাতে ধরিবে না? বাবা বলিলেন - না। তাঁহাকে হবি হরি করিয়া ডাকিলে তিনি আসেন, তখন দেখিবে তিনি কত বড।

এ শরীরের ছোট বয়সে ঘরের ছাউনি এক রাত্রিতে তুফানে উড়িয়া যায, সকলে ভয় পায়। আর এ শরীর 'ঘর পড়িয়া গেল, ঘর পড়িয়া গেল' বলিয়া উল্লাসে হাত তালি দিতে থাকে। তাহার পরদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার হইলে চালের সেই ফাঁক দেখাইয়া এ শরীর মাকে বলে - মা দেখ! দেখ! ঘরের ভিতর বসিয়া কি সুন্দর তারাগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে যাওয়ার আর দরকার হয় না। মা বলেন - হ্যাঁ, তুই যেমন তোর কথাও তেমনি। পাগলেব গোবধে আনন্দ। এ শরীর শীত বা গ্রীষ্মে বড কাহিল হইত না। বৃষ্টির জলেও ছুটাছুটি কবিযা মহা আনন্দে খেলিত। মা বলিতেন এটাকে দেখি কিছুতেই কাবু করিতে পারে না। পিতামাতা উভয়েই এ শরীরের বিচিত্র ভাবভঙ্গী দেখিয়া নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও আনন্দে হাসিতেন।

শারদীয়া পূজার সময় এই শরীরের ছোটমামা (স্বর্গীয সারদা চবণ বিদ্যাসাগর) আসিয়া সকলকে মামার বাড়ি লইযা যাইতেন। তাহার অন্যান্য বোনেরাও সেই সময় সেখানে আসিত। এই উপলক্ষে অনেক ছোট ছোট মেয়ে তথায় একত্র হইত। কিন্তু দেখা যাইত যে এই শরীরকে বুকে পিঠে করিয়া সকলেরই বেশি আনন্দ হইত। ছোট মামা এ শরীরের কথাবার্তা, হাবভাব, চলাফেরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতেন।

এ শরীর ছয় বছর বয়সে পূজায় মামাবাড়ি যায়। একদিন পূজা দেখিতে দেখিতে এ শরীরের ঝিম্‌ঝিম্ ভাব হইল ও মুখ দিয়া অস্পষ্টভাবে কি কি বাহির হইতে লাগিল। ছোটমামা অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরে বলিয়া উঠিলেন - কি বলিতেছিলি, আমাকে বল ত? এ শবীর চুপ হইয়া গেল। তিনি এ শরীরকে এক অসাধারণভাবে দেখিতেন। পূজার সময় কুমারীজ্ঞানে সর্বাগ্রে ইহাকেই কুমারী করিতেন ও খাওয়াইতেন। এইরূপে আরও কেহ কেহ এ শরীর কাছে থাকিলে ইহাকে কুমারী ভোজন কবাইয়া বড় তৃপ্তিলাভ কবিতেন।

এ শরীর সাত বছর বয়সে বড়মার সঙ্গে চালনার শিববাড়ি যায়। বড়মা কিছু সময় এ শরীরকে একটা বটগাছের তলায় বসাইয়া রাখিয়া ছিলেন। তখন এ শরীরের দৃষ্টিতে পড়িল একখানি ঠাকুরঘর। কিন্তু তাহাতে কোন মূর্তি নাই। নিকটবর্তী একটি পুকুর। পুকুরের দিকে চোখ ফিবাইতেই এই শরীর দেখিতে

পাইল যে পাথরের একটি শিব একবার পুকুরের জলে ডুবিতেছে ও একবার ভাসিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িতেছে। এই প্রসঙ্গে আরও কত কথা আছে, যখন যতটুকু কথা আসে। ইহার কতক্ষণ পর ঠাকুব ঘরে আসিয়া এ শরীর ঐ শিবমূর্তিটিকে সেখানে দেখিতে পাইল। বাড়ি ফিরিযা কথা প্রসঙ্গে যাহা যাহা এ শরীর দেখিয়াছে জানাইলে, অন্যান্য সকলে বলিল যে তাহারা ত মন্দিরেই শিব দেখিয়াছে। পরে শোনা গেল, এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে ঐ শিব সকল সময় মন্দিরে থাকেন না। পুকুরে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া গড়াইযা বেড়ান।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী চালনা শিব

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - বৈশাখ মাসে গ্রামে সকলে পাকা আম দিয়া বৈশাখী পূজা করে। এ শরীর মাকে একদিন বলিল - মা আমাদের পাকা আম কই? মা বলিলেন - আমাদের কি বাগান আছে? আমাদের আম লাগিবে না। বাহিরে অন্যদের বাগানে কতকগুলি আম গাছ ছিল। কিন্তু মায়ের আদেশ ছিল যে সেইসব গাছ হইতে কখনও কোন ফল পাড়িয়া আনিও না। তলায় পড়িয়া থাকিলে আনিতে পার। এ শরীর আগের দিন ঘাটে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে একটি গাছের অনেক উপরে একটি আম লাল হইয়া আছে। সেদিন খেয়াল হইল ঐ আমটি যদি ঝরিয়া পড়িত তবে পূজায় দেওয়া যাইত। ইহা খেয়াল করিতে করিতে এ শরীর সে যায়গায় যাইয়া দেখে আমটি পড়িয়া রহিয়াছে। আনিয়া মাকে দিলে মা বলিলেন - পাড়িয়া আনিস নাই ত? এ শরীর কি করিয়া উহা পাইয়াছে বলাতে মা পূজায় দিলেন। এ শরীর সত্য কথাই বলে মার জানা ছিল। ব্রতে, পূজায়, কীর্তনে, ব্রতকথায় বা পুঁথিপাঠ হইলে এ শরীরের খুব আনন্দের প্রকাশ দেখা যাইত।

আর একদিন মা বলিলেন - তোদের যেমন ভাগ্য, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস, বাড়িতে একটি আমও নাই যে খাইবি। কিছুক্ষণ পরে এ শরীর ঠাকুরমার সঙ্গে জঙ্গলে শাক খুঁজিতে গিয়াছে, একটি বেশ বড় আম সেখানে পাওয়া গেল। ঐ জায়গায় কোন আম গাছও ছিল না। কেহ আনিয়া যেন আমটি রাখিয়া গিয়াছে। এত ভাল আম সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। আম দেখিয়া মা অবাক। এইরকম সুন্দর সুমিষ্টগন্ধ, দেখিতে সুন্দর, যেন আমটিই দিব্য। এই রকম আম যেন আর কখনও কেহ দেখে নাই গড়নও যেন আলাদা। আমটি হাতে নিয়া মার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

এ শরীর একদিন মার কাছে শুইয়া আছে, হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করিল - স্বর্গ স্বর্গ যে বলে, মানুষ ইচ্ছা করিলেই কি স্বর্গে যাইতে পাবে? মা বলিলেন - হ্যাঁ, যাওয়ার একান্ত আগ্রহ হইলে মানুষ সেখানে যায। এ শরীব বলিল - কোন দিক দিয়া তাহার রাস্তাটা, বল না মা? মা বলিলেন - মানুষেব যখন খুব ইচ্ছা জাগে তখনই সে রাস্তা দেখিতে পায। এ শবীব বলিল - তবে এ শরীর ইচ্ছা কবিলে যাইতে পারিবে? মা বলিলেন - হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই সব ধর্ম কথা, নানা আলোচনা মার সঙ্গে।

একদিন বহুদূরে এক বাড়িতে কীর্তন ও খোলেব ধ্বনি শুনিয়া মাকে এই শরীর জিজ্ঞাসা করিল - এই সব করিলে কি হয? মা বলিলেন - ভগবান সন্তুষ্ট হন। মনে মনে নাম করিলেও তিনি শুনিতে পান। যাহা কেহ দেখিতে পায না, তিনি তাহাও দেখেন। এইরূপ অনেক ভালভাল কথা বলিলেন।

পূজা পার্বণ বা বিবাহ ইত্যাদির বাজনা কিংবা কোন বৃহৎ ধ্বনি শুনিলে - এ শরীর নিজেই ত সেই ধ্বনি, আবার শোনাও - ঐ ভাবে শরীর স্থির হইয়া স্বাভাবিক চলাটা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকিত। কোন সময় কাহারও কান্না বা হাসি দেখিলে এ শরীর তাহাদের সাথে সমভাবে যোগদান কবিত। আবাব ইহাও হইত যে হাসি কান্না বা অন্য কোনরূপ কোলাহলের আতিশয্যেব ভিতবও এ শরীর একেবারে উদাসীন নির্লিপ্ত।

এ শরীর একবার শারদীয়া পূজাব সময় অধিবাসের দিন দুপুর বেলা মার সঙ্গে ঘরে খাইতে বসিয়া দেখিতে পাইল যে মানুষেব মত চলা অবস্থায শ্রীদুর্গা ও সঙ্গীয় দেব দেবীগণ বাহনাদি সহ সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অবতারদেরও দুর্গাপূজার সময় পূজা হয়, তাঁহাদের একেক করিযা চলিয়া যাইতে দেখা গেল। আর এ শরীরের দিকে চাহিয়া বলিতেছে - অমুক বাঁড়িতে জাতশৌচ জনিত সংস্পর্শ-দোষ পূজার আয়োজনাদিতে ঘটিয়াছে বলিযা আমরা সেখান হইতে বাহির হইযা আসিযাছি। এ শরীর এক দৃষ্টিতে এই সব দেখিতেছে। মা গালে এক টোকা মারিয়া বলেন - একি লো! খাইতে বসিযা তোব মন কোথায় যায়? এ শরীর তখন কোন জবাব দিল না। এ শরীরের শিশু বয়সেও যে এইরূপই। কখনও কখনও যে দিকে তাকাইত দৃষ্টি স্থির দেখাইত।

এ শরীরের কখনও কখনও সরল ও উন্মনা ভাব দেখিযা সকলেই বোকা

ও টেলা বলিয়া ধারণা করিত। কেহ কেহ বে-দিশা বলিত। আরও বলিত এইটি তাহার ঠাকুরমার স্বভাবও একটু পাইয়াছে। যদি এইসব সারিয়া না যায়, তবে বিবাহ দিলে যে কি উপায় হইবে ভগবান জানেন।

ঠাকুরমার এক সই ছিলেন। এই শরীর তাঁহাকে 'চিক্কন দিদি' বলিয়া ডাকিত। তিনি নিঃসন্তান ও বাল বিধবা। এই শরীরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাড়ি প্রায়ই নিয়া যাইতেন। এই শরীরকে দিয়া রান্না কবাইতেন আব বলিতেন যে - তুই যা রাঁধিস্ যেন অমৃত। রান্নার হাতেখড়ি জগৎ দৃষ্টিতে তাঁহার কাছে হইয়াছিল বলিলেই চলে।

ইহাদের নিকটবর্তী এক বাড়িতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা হইত। সে বাড়ির কর্তার মেয়ের নামও ছিল 'নির্মলা'। তাহাদের বাড়িতে দুর্গাপূজার তিনদিন অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পূজার সময় থাকা খাওয়া এ শরীরের এক রকম বাঁধা ছিল। তখন দেখা যাইত একটা সুন্দর খেলা - নিজেকে নিয়াই নিজে। যে কোন দেবতার পূজাদি দেখিতে দেখিতে এই শরীরটার কেমন পরিবর্তন হইয়া যাইত - এই শরীরই দেবতা, ফুল, ভোগ, উপচারাদি ও পূজক। আবার মন্ত্রাদিও। চন্ডীপাঠেও এইরূপ বোধ হইত যে এই শরীরই সে সমুদায়। ইহাও খেয়ালে আসিত যে এ শরীর ঐ মন্ত্রাদিও অনর্গল শুনাইতে পারে। কখনো কখনো ঐ সময়ে হঠাৎ সকলের অজ্ঞাতভাবে বসা হইতে এই শরীর উঠিয়া পড়িত। কেহ লক্ষ্য করিলে আপনা আপনিই আবাব সকল ভাব সঙ্কুচিত হইয়া যাইত ও শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। এটা কিন্তু শুধু এ দেবতা পূজাই না - লক্ষী-নারায়ণই বল, শিব-পার্বতীই বল, সীতা-রামই বল, রাধা-কৃষ্ণই বল, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠী ইত্যাদি রকম রকম যত তোমাদের আছে - মুসলমানের ধাবায়, খ্রীষ্টানের ধারায়, যে কোনও ধারায়ই হোক - ঐরূপ ভাবেরই প্রকাশ, নানা রকমারিতে, যেখানে যেরূপ তোমাদের আছে, ঐ আর কি।

এই শরীরের অনেক কাজ বয়সের হিসাবে অস্বাভাবিকও দেখাইত। একবার এ শরীরের জ্যাঠাইমা বলিলেন ঐ উনুন ও ঘরটা লেপিয়া দে তো। তখন খুব অল্প বয়স। ন্যাংটা হইয়া লেপিয়া দিলাম। পরে তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন - দেখ এত বড় বড় দাগ পড়িয়াছে, যেন কোন বয়স্ক লোক লেপিয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া এত ছোট হাতে এইরূপ হইল।

একবার এক দিদি দীক্ষা নিল। সে লেখা পড়া জানে না, তাহার কিছু মনেও থাকে না। মার নিকট হইতে ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি শিখিতে লাগিল। একদিন এ শরীরকে বলে, দেখ হাতের ক্রিয়াদি (অঙ্গন্যাস ও করন্যাস ইত্যাদি) ভুলিযা গিয়াছি। বারে বারে তোর মাকে বিরক্ত করিতে ভাল লাগেনা। তুই বলত কি করি? এ শরীর হাসিতে হাসিতে খেলায খেলায় কি কি দেখাইল এবং বলিল - এভাবে করিয়া ফেলেন।

তোরা বলতে পারিস এই ছোট মেয়েটার কাছে (মার তখন ৯/১০ বৎসর বয়স) বয়স্কা দিদি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? কথাটা কি জানিস্ এই শরীরটার সঙ্গে ব্যবহার করিতে বয়সের পার্থক্যটা অনেক সময় সকলে ধবিয়া রাখিতে পারিত না, ভুলিয়া যাইত। তাহারা কিন্তু ঐ সময় ইহা বুঝিত না। এই শরীরটার সহিত সব রকম বয়সের লোকই বন্ধুর মত ব্যবহার করিত।

পরে মাকে সে একথা জানাইল। মা বলিলেন - এ সব কোথায় শিখিল? ঠিকই ত বলিয়াছে। এ শরীরকে মা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল - দিদির কথা শুনিয়া আপনা হইতেই এ শরীরে এ সব প্রকাশ পাইয়াছিল। মা এ শবীরের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া ধমক দিয়া বলিলেন - তোর আপনা আপনি কেমন করিয়া আসিল? মন্ত্রাদি নিয়া তামাসা করে না, তাহা হইলে পাগল হয়। একি ছেলে খেলা? এইসব ভাল না।

ঠাকুরমা খুব ভাল মানুষ ছিলেন, বযসও ঢের হইয়াছিল। তাঁহার সহিত এ শরীর হাসি খেলা করিত ত। একদিন তিনি সন্ধ্যা করিয়া ছোট আওয়াজে মুখে কি আওড়াইতে আওড়াইতে খাওয়ার ঘরে যাইতেছেন। এ শবীর তাঁহাকে বলিল - আপনি দেখি এতক্ষণ ধরিয়া কেবল এই কথাই বলিতেছেন। তিনি অবাক হইয়া বলিলেন - তুই কিরূপে জানিলি আমি কি বলিতেছি? ছেলে মানুষের মুখে এইসব বাহির হওয়া ঠিক নয়। আর একদিন তাহাকে এ শরীর কি বলিয়াছিল, তাহার যেন সর্বাঙ্গীন ভাবের পরিবর্তন হইয়া গেল। এ শরীর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। খানিক পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন - তোর কথা শুনিবামাত্র আমি হুঁস হারাইয়াছিলাম।

একদিন এক দিদি শাঁখা আনিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার হাতে উহা পরাইয়া দিতে পারে না। শাঁখা জোড়া তাহার বড় পছন্দ হইয়াছিল তাই হাতে দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছে। এ শরীর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল - আস দেখি দিদি, পরাইয়া দিই। সে বলিল - কেহ ত পারিল না বাকি আছিস তুই। আচ্ছা দেখ্। এ শরীর শাঁখা হাতে নিয়া অতি সহজে পবাইয়া দিল। সে বলিল - আমি ত টেরও পাইলাম না তোব ছোট ছোট হাত, আমার এত বড় হাতে কি করিয়া পরাইলি? সকলে এ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশু বয়স হইতেই এ শরীরকে সকলে ভালবাসিত। মামাবাড়ি গেলে নিকটস্থ সমবয়সী মেয়েরা খেলিতে আসিত। তাহাদের জানা ছিল যে এ শরীরকে কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে খোলাখুলি সব বলিযা দিবে, এ কারণে খেলার ভিতর যদি নিজেদের কিছু গোপন থাকিত তবে এ শরীরকে শুনাইত না এবং কোন কথা বলিতেও সাবধান হইত। অনেক সময় খেলায় এ শরীরকে রাজা বানাইয়া একধারে বসাইয়া রাখিত। কখনো কখনো সকলে এক জোট হইয়া এ শরীরকে হারাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু ঘটনা চক্রে তাহারা নিজেরাই হারিয়া বোকা বনিত। অথচ এ শরীর সর্বদা তাহাদের বিবেচনার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে থাকিত, হার জিতের কোনও ধারও ধারিত না।[৯]

সঙ্গিনীদের সহিত একত্র হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সময় মানুষের সঙ্গে কথা বলার মত বৃক্ষাদির সহিত এ শরীর কথা বলিত। এ অস্বাভাবিক কান্ড দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইত। কখনো ভয় পাইত। ভয়ের কারণ ছিল এই - এ শরীর যখন গাছের সঙ্গে কথা বলিত, তখন উহারা দেখিত গাছটিও একটু নড়িতেছে, আর কিছু বুঝিতে পারিত না। শুনা গিয়াছে মহাত্মারা নাকি বৃক্ষরূপেও থাকেন। সময় সময় বিদ্রূপ করিয়া বলিত - তোর অদ্ভুত রকমের চালচলন গুলি একবার দেখা ত? তাহারা এ শরীরকে যেমন শঙ্কা করিত তেমন আবার পছন্দও করিত। কোন কাজে এ শরীরকে না পাইলে তাহাদের আনন্দ হইত না, চলিতও না।

একদিন 'সুশীলা দিদি' (মামাতো বোন) এ শরীরের হাতে একটি তামার আংটি পরাইয়া দেয়। মা দেখিয়া বলেন - এ আংটি হাতে দিয়া মিথ্যা কথা

[৯] দ্রষ্টব্য ঃ চতুর্থ অধ্যায - 'মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি'।

বলিলে পাপেব ক্ষয় নাই। এ শরীর বলিল - ইহাব ত আর মিথ্যা কথা নাই। মা বলিলেন - ভুলেও যদি মিথ্যা বাহির হয় তবেও দোষ। এ শবীব বলিল - আচ্ছা ভুল হইবে না। তখন শরীরের মা বলিলেন - আংটি বাখিয়া দবকার নাই। এ শরীর আংটি খুলিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিল। সকলেই জানিত যে এ শরীর মিথ্যা কথা বলে না, তাই কোন কথা কাহাবো যাচাই কবিতে হইলে এ শরীর সে ঘটনায় উপস্থিত থাকিলে, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত এবং ইহার জবাব প্রকৃত বলিয়া ধরিত।

বাবা একবার এ শরীরকে নিয়া তাঁহার বোনের বাড়িতে শারদীয়া পূজার সময় রওনা হইলেন। স্টেশনে গিয়া স্টীমার আসার দেবী থাকাতে এ শরীরকে কিছু খাওয়াইবার জন্য বাবা চেষ্টা করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া আপনার মেয়ের মত এ শরীরকে খুব যত্ন করিতে লাগিল। স্টীমারে উঠিবার সময় সে যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ শরীরকে ছাড়িয়া দিল।

ষ্টীমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল। সেখান হইতে পিসীব বাড়িতে কতদূব হাঁটিযা যাইতে হয়। অন্ধকার হইয়াছে, তাই নিকটস্থ এক বাড়িতে বাত্রি কাটাইবার মনস্থ করিয়া বাবা সেখানে গেলেন। সে বাড়িতে পূজা। মেয়েরা এ শরীরকে পাইযা - আমাদের বাড়িতে সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা আসিয়াছে বলিতে বলিতে আনন্দ সহকারে সকলে মিলিয়া লোফালুফির মত আরম্ভ কবিল। পাড়ার লোকেদের ডাকিয়া দেখাইতে লাগিল। কিভাবে যে আদর জানাইবে যেন খুঁজিযা পায় না। এ শরীরও তাহাদের ভাবে তাহাদেরই একজন হইযা গেল। সে রাত্রে বাবার কাছে এ শরীর রহিল না। তাহার পরদিন সকালে নূতন বস্ত্রাদিতে ভূষিত কবিয়া এ শবীরকে অতিকষ্টে বিদায় দিল।

খাওয়া পরা বা অন্যান্য বিষয়ে যখন যে রকম হইত তাহাতে এ শবীরের কোন ওজর আপত্তি ছিল না। বাবা ও মা শবীরকে খুব স্নেহ কবিতেন। বাবা কোথাও যাইতে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন - তোব জন্য কি আনিব? অনেক সময় এ জন্য পীড়াপীড়িও করিতেন। কখনো এ শরীব কিছু বলিত। কোনদিন একেবাবে চুপ করিয়া থাকিত। পাড়াতে পরিবাব জিনিষ, মল, চূড়ি ইত্যাদি ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিতে আসিলে ছেলে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি কবিয়া মা বাবার কাছে কত আব্দার করিত। এ শরীরের সে দিকে খেয়ালও যাইত না।

ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াও কোন দিন মুখ হইতে বাহির হয় নাই। খাওয়ার সময় এ শরীরকে ডাকিয়া খাওয়াইতে হইত। সকলে নিজের মায়ের নিকট কত কিছু চাহিয়া খায়, এ শরীরের সে রকম প্রকাশ ছিল না। সকলের দেখাদেখি এ শরীর একদিন মাকে বলে যে - খেতে দাও মা। মা বলেন - ঐখানে আছে, নিয়ে খা। এ শরীরের নিজের হাতে কিছু খাইবার স্বভাব নাই, তবুও মার আদেশমত একবার সেদিকে যায়, আবার ফিরিয়া আসে। দুই তিন বার এইরূপ করিতে দেখিয়া মা নিজে আসিয়া খাইতে দিলেন। অপবিত্র খাওয়া কিম্বা অনাচার এ শরীরের সহ্য হইত না। এ সব ঘটিলে কোন না কোন অসুখ বিসুখ হইয়া পড়িত। তাই মা খুব সাবধানে রাখিতেন।

তিন ভাইয়ের জন্ম ও মৃত্যু

আবার একদিন জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - তোদের দৃষ্টিতে এ শরীরের পরে ক্রমে ক্রমে তিনটি ভাই জন্মিয়াছিল।[১০]

প্রথম ভাইটির সর্বদা অসুখ। চিকিৎসায় কোন ফল দেখা যায় না। ইহার ভিতর ছোট মামা মাকে তাহাদের বাড়িতে লইয়া যাইতে আসিলেন। ভাইটির অসুখ দেখিয়া ছোট মামা মাকে বলিলেন - তুমি ত যাইতে পারিবে না নির্মলাকে সঙ্গে দাও। ইহা শুনিয়া ভাইটি বলে - বোন্‌দি! তুই এখন যাইস্ না। আমি মরিলে যাইবি। মা বলিলেন - তোর বোন্‌দি কোথাও যাইবে না। তাহার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। এক রাত্রিতে অবস্থা খুব খারাপ হইল। সকাল বেলার দিকে মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া ঘরের বাহিরে করিয়া তাহাকে উঠানে রাখিয়া দিল।

এ শরীরের তখন ৭/৮ বৎসর বয়স। নিকটে দাঁড়াইযা আছে। এইসব দেখিয়া হঠাৎ খেয়াল[১১] হইল - এখনি তো আবার ঘরেও যাইতে পারে, খাইতেও পাবে, কথাও বলিতে পারে, এও তো হইতে পাবে। আশ্চর্যের বিষয়, তৎমহূর্তে আবার পরিবর্তন দেখা গেল। লক্ষণ একটু ভাল বুঝিয়া আবার ঘরে লইয়া গেল। সকলে মনে করিল পুনর্জন্ম হইল। বাঁচিয়াও উঠিতে পারে। তাহাকে ঘরে নিয়া শোয়াইয়া মা একটু বার্লির জল খাওয়াইলেন। সেও বেশ একটু খাইল। একটু সময় পরে

[১০] মাযের ৮ ভাই বোন ঃ ১ম - কন্যা, ২য় - মা, ৩য় - পুত্র, ৪র্থ - পুত্র, ৫ম - পুত্র, ৬ষ্ঠ - সুরবালা, ৭ম - হেমি, ৮ম - মাখন।

[১১] খেয়াল ঃ মা'র ক্ষেত্রে অহং সম্পূর্ণ না থাকার কারণে এর অর্থ দাঁড়ায় মা'র মধ্যে কোনো দৈব ইচ্ছাব স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

অবস্থা আবার বদলাইয়া গেল। আবার কান্নাকাটি পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্তন দেখা গেল। এই সময় যখন তাহার শরীরটি হাতে করিয়া বাহিরে নেওয়া হইতেছিল ভাইটি এ শরীরের দিকে তাকাইয়া পরিষ্কার বলিয়া উঠিল, 'মা, মাগো মা, আমি কিন্তু মরি গো মরি মরি।' এইরূপ বলিতে বলিতে সে দেহত্যাগ করিল। ইহা দেখিযা সকলেই অবাক। তাহাব বয়স প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর হইয়াছিল। আরে! কেমন খেয়ালটা হইয়া গিয়াছিল কিনা, তৎক্ষণাৎ ইহাও হইয়া গেল, ঘরেও গেল, খাইলও, কথাও বলিল।

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মা বলিয়াছিলেন - এই ভাইয়ের অসুখের বাড়াবাড়ির মধ্যে একদিন একজন আসিয়া এ শরীরের হাতে একটি খাওয়ার জিনিস দিয়া বলিল - ওকে দাও। এ শরীর তাহাকে বলিযা দিল - 'না, ওর মুক্তির দিক্'। যে আসিয়াছিল সে অশরীরী।

এই ঘটনার পর মা সর্বদাই কাঁদিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরও কাঁদিত। এমন কান্না জুড়িয়া দিত যে অবশেষে মা বাধ্য হইয়া চুপ করিতেন। মা বলিতেন - ইহার জন্য কাঁদিয়াও একটু হাল্কা হইবার সাধ্য নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় ভাইটির অসুখ করিল, সে পাঁচ মাস ভুগিযা প্রায ৩ বৎসর বয়সে মারা গেল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বহুদিন ভুগিবার দরুণ ভাইটির মুখে অরুচি ধরিয়াছিল বলিয়া কিছু খাইতে চাহিত না। বাবা রাগ করিয়া একদিন তাহাকে টানিয়া একটু ছুঁড়িয়া ফেলেন। তাহাতে তাহাব এক হাতে চোট লাগিয়াছিল।

বহুদিন পর একবার কলিকাতা যাইলে বৈদ্যবংশজাত একজন প্রফেসর তাহার একটি ৭/৮ বৎসরের ছেলে নিয়া এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। সেই ছেলেটির একখানি হাত জন্ম হইতে বাঁকান ছিল। তাহাকে দেখিবা মাত্রই - দ্বিতীয় ভাইটি আবার আসিয়াছে - এই শরীর সকলকে বলিয়াছিল। পরে একদিন শরীরের বাবা ও মা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি কেহই বিশেষ করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না।

তৃতীয় ভাইটিও দেড়মাস বয়সে মারা গেল।

প্রথম দুইটি ভাইয়ের কোষ্ঠী দেখিযা জ্যোতিষীরা বলিয়াছিল যে তাহাদের বহুবিধ সুলক্ষণ রহিয়াছে তবে জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। দ্বিতীযটির নাক বরাবর রাজ দন্ডের মত একটি উচ্চস্থান কপাল হইতে মাথা পর্যন্ত ছিল। তৃতীয়টির মহাপুরুষের চিহ্নাদি ছিল।

এই শরীর পিত্রালয়ে থাকা পর্যন্ত তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরের পূর্বে ও পরে ভাইবোন যাহারা হইয়াছিল কেহই বাঁচিয়া নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল জন্ম পূরণ ও দেখা করিতেই আসিয়াছিল।

এই শরীরের বিবাহের পর একটি বোন ও একটি ভাই জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মধ্যে কাশীতে বোনটি মারা যায়।[১২]

এই সব দুর্ঘটনায় সংসারে ভীষণ শোকের ছায়া পড়িল। শোকের জ্বালায় মা কোন কোন সময় স্নান করিবার উপলক্ষ্যে শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। মা নীরবে সংসারের কাজ কর্ম করিতেন বটে কিন্তু কেমন একটা উন্মনা ভাব দেখা যাইত। অভাব অনটনও যথেষ্ট ছিল। মা এত শোক ও দৈন্যের মধ্যেও অতিথি অভ্যাগতের সেবায় ত্রুটি কবিতেন না। খাইতে বসিলে যদি ভিক্ষুক উপস্থিত হইত তবে তাহাকে খাওয়াইযা নিজে উপবাসী থাকিতেন। সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে তাকাইয়া সকল দুঃখ তাপ অম্লান বদনে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেন। কাহাকেও কিছু জানাইতেন না।

পিতামাতার দীক্ষা

উপর্যুপুরি এইরূপ বিপৎপাৎ দেখিয়া প্রতিবেশীরা মা ও বাবাকে বলে যে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া অষ্টমীস্নান করিয়া আস এবং দীক্ষা গ্রহণ কর। এ শরীরকে ঠাকুরমার নিকট রাখিয়া মা আগে স্নানে চলিয়া গেলেন। বাবা পরে যাইবার সময় তাঁহার কি খেয়াল হইল, এ শরীরকে সঙ্গে নিলেন। কথা হইল যে সেখান হইতে ফিরিবার সময় এ শরীরকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মা ও বাবা গুরুবাড়ি যাইবেন। কিন্তু সেবারও এ শরীর তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়া গেল। তাঁহারা যখন যাহা বলিতেন এ শরীর চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। পরে আপনা আপনিই তাঁহাদের মত পরিবর্তন হইয়া যাহা এ শরীরের খেয়ালে আসিত তাহাই ঘটিয়া যাইত।

গুরুবাড়ি যাইতে আসিতে অনেক রাস্তা হাঁটিতে হইয়াছিল বলিয়া মা বাড়িতে আসিয়া পায়ের যন্ত্রণায় কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এ শবীরের কোনরূপ

[১২] বোনটির নাম 'হেমাঙ্গিনী', অনেকে 'হেমি' নামেও ডাকিত। ১৯৪৫ সালে ৩৭ বছর বয়সে কাশীতে মৃত্যু।

উপদ্রব নাই দেখিয়া সকলে বলিল ইহার দেখি শরীবেব কষ্ট বোধও নাই।

যদিও এ শরীরের পিতা ও মাতার লৌকিক হিসাবে সন্ধ্যা পূজা পাঠ ইত্যাদিতে বিশেষ কোন ঘটা ছিল না কিন্তু উভয়ের ভিতর ভগবান অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সর্বদা দেখিতাম। পূজা সন্ধ্যা যখন যা করিতেন, মনপ্রাণ দিযাই করিতেন। বিশেষতঃ মা'র ভগবানের উপব এত অটল বিশ্বাস ছিল যে অজস্র দুঃখ দৈন্য, শোক তাপের ভিতরও, সর্বদা তাঁহার দান, যখন যাহা আসিত, সকলই আনন্দে গ্রহণ করিতেন।

মা ধৈর্য্য, সহ্য, পরোপকারিতা, সর্বদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি, পরনিন্দায যোগদান না করা, সাধু দেবদ্বিজে ভক্তি, নির্লোভতা, সত্যবাদিতা, শান্তভাব ইত্যাদি গুণে অতুলনীযা। রাগ তো নাই বলিলেই চলে। এত দারিদ্রের মধ্যেও আনন্দের ভাবটুকু যেন লাগিয়া থাকিত।

আদেশ পালন

ভাই কয়টি মারা যাওয়াতে পিতামাতার সকল মাযা মমতা এ শরীরের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। সংসারেব কোন কাজ কর্ম করিবাব জন্য তাহাবা বলিতেন না, বরং পাশের বাড়িতে কেহ কখনো এ শরীরকে দিয়া তাহাদের অনেক কাজ করাইয়া নিত। বাবা মা যখন যাহা বলিতেন এ শরীর তাহা পালন করিত। কখনো তাঁহাদের আদেশের উপর নিজেব বিচারবুদ্ধি আসিত না।

ছেলে বয়সে একদিন সকালে বাসনাদি ধুইবার জন্য এ শরীর পুকুরে যাইতেছে, মা বলিলেন - পাথরের বাটিটা নিয়া যাস্ পারিস্ ত ভাঙ্গিয়া আনিস্! এ শরীর যাইতে যাইতে বৃক্ষাদির সহিত কথাবার্তা বলিতেছে এমন সময় হঠাৎ হাত হইতে পাথরের বাটিটি মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন এ শরীর মনোযোগের সহিত পাথরের ভাঙ্গা টুকরাগুলি কুড়াইয়া ধুইয়া অন্যান্য বাসনাদি সহ বাড়িতে আনিয়া ঠিক জায়গায রাখিয়া দিল। মা দেখিযা বাগের সহিত বলিযা উঠিলেন - যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই করিলি। এ শরীর বলিল - টুকড়াগুলি ত সব আনিযাছি। মা তখন মুখে কাপড় আড়াল দিয়া হাসেন। আবার এ শরীরেব দিকে চাহিযা রাগ দেখান। মা শেষে বলিলেন - ওলো বলদি। পাথরেব টুকড়া দিয়া কি করিব? বাটিটা কি আর জোড়া লাগিবে? মেযেটার যে কি গতি হইবে পরমেশ্বর জানেন।

এ শরীরের কাজ-কর্মে এইরূপ প্রায়ই প্রকাশ পাইত। শেষে দেখা যাইত মা এ শরীরকে কোন কথা বলিতে হইলে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, কেননা ঠিক যাহা বলিবেন তাহাই করিবে। এ শরীর সর্বদা কেমন একটা ভাবে রহিয়াছে এমন দেখাইত কিনা, কাজেই ব্যবহারিক কাজকর্মাদিতে কেবল হুকুম তামিল করিত।

আবার দেখা যাইত যদি কখনো কোন কাজে খেয়াল আসিত তাহাতে সম্পূর্ণ লক্ষ্য যাইয়া পড়িত। এমনকি শরীরের প্রতি দৃষ্টি থাকিত না। কাহাকেও সেলাই, বাঁশের বা বেতের কাজ প্রভৃতি করিতে দেখিলে ঐ কাজের নমুনায় এ শরীর কখনো অনেক জিনিষ বানাইত। অনেক সময় নূতন ও রকমারিও করিত। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিত বোকা মেয়েটার সবই অদ্ভুত।

দশ এগার বৎসর বয়সে মা কোন দিন বলিতেন - কাজ কর্ম ত কিছুই শিখিল না, কি করিয়া যে তোর দিন চলিবে ঈশ্বর জানেন। আবার যখন দেখিতেন সেলাই বা সেইরূপ অন্য কোন কাজ কিম্বা রান্নাবান্না যখন যাহা কবিতে দিতেন তাহা সুন্দর হইত, তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিতেন - বেশ ভালই ত হইয়াছে। আমিও এইরূপ পারি না। কোন চিন্তা নাই। দবকার মত ভগবানের কৃপায় সব করিতে পারিবি।

ভগিনী সুরবালা

ভাই কয়টির মৃত্যুতে মাকে শোকার্ত দেখিয়া এ শরীরের একটা খেয়াল হয় যে এখন যদি একটা বোনও হইত তাহা হইলে মা অনেকটা সান্ত্বনা পাইতেন। ইহার পরই বোন সুরবালার জন্ম।

জন্মের পর তাহার শরীর খুব হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। রং উজ্জ্বল ফর্সা। চোখ মুখ ও শরীরের যেন দিব্য গড়ন। যে দেখিত তাহার সৌন্দর্য্য ও স্বভাবে আকৃষ্ট হইত। তাহার মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত। সুরবালা বয়সে এ শরীরের প্রায় ১০ বছরের ছোট ছিল।

কাঁদিবার উপক্রম হইলে তাহার মুখ কাল ও শরীর স্থির হইয়া যাইত। সকলের ভয় হইত পাছে দমবন্ধ হইয়া মারা পড়ে। এই কারণে সকলেই তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিত। সামান্য কারণে হয়ত কোথাও গেল, আসিতে দেরী

হইল, শীঘ্র আসিতে হইবে উহার জানা ছিল না, ছেলেমানুষ বলিয়া হযত একটু বেশি ধমক দিল, ব্যস! নিঃশব্দে একটু দূরে সরিয়া গেল, হয়ত তাহার কোন আওয়াজ না পাইয়া খোঁজ করিয়া দেখা গেল এক জায়গায দাঁড়াইযা কান্নার হাঁ করিযা চক্ষু শরীর সর্বাঙ্গ স্থির। শ্বাস নাই। অতি কষ্টে দীর্ঘ সময়ে আদরে সান্ত্বনায় মা আসিযা স্থির করিতেন। বলিতেন - এ আবার কোথা হইতে আসিল, কোন ঢংএর মেয়ে বাবা! যখন সে কোলের ছোট্ট শিশু, তখন তাহার এই কান্না দেখিবার জন্য অনেকে জোর করিয়া কাঁদাইত, মা আসিয়া শান্ত করিতেন। হাসিকান্না দুইটাই তাহার অদ্ভুত ছিল।

অশৌচ ঘর হইতেই তাহার উপর এ শরীরের বিশেষ নজর ছিল। তাহারও একটা বিশেষ আকর্ষণ সর্বদা এ শরীরের প্রতি ছিল। সে এ শরীরকে ছাড়া যেন থাকিতে পারিত না।

সুরবালা কিছুদিনের জন্য এ শরীরের শৈশবের খেলার সাথী ছিল। তাহার চলা ফেরায়, ডাকা খোঁজায় এমন একটি ভাব ছিল যাহা কেবল বিশেষ করিয়া এ শরীরেব কাছেই প্রকাশ পাইত। তাহার প্রাণের সকল কথা সে সরল মনে এ শরীরের নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইত। যদিও বয়সেব তফাৎ অনেক ছিল তথাপি সে এ শরীরের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহাব কবিত। শুনা যায়, বিবাহের পর পিত্রালয় হইতে এ শরীর চলিয়া গেলে সে নাকি অনেক দিন পর্যন্ত রাস্তায় একা বসিয়া 'বোনদি' 'বোনদি' বলিয়া ডাকিত ও কাঁদিত।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাইবার সময় সুরবালা নমস্কার করিতে আসিলে এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল - তুমি আর বেশিদিন সংসারে থাকিও না।

এ শরীর বাজিতপুরে মৌন থাকাকালীন ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সুরবালার শরীরে ব্যারাম দেখা গিয়াছিল। তখন সুরবালা জয়দেবপুরে থাকিত ও অসুস্থ ছিল। মাথার ভিতর কি এক অসুখ হইয়া চোখ খাবাপ হইযা গিয়াছিল, চোখে দেখিতে পাইত না এবং কানে শুনিতে পারিত না। একদিন হঠাৎ দেখিতেছি সে ১৮ বছরের বেশি বাঁচিবে না। তাহার তখন বয়স কত বৎসর জানিবাব জন্য মায়ের নিকট ভোলানাথ[১৩] পত্র দিলেন। জানা গেল সে বৎসরের অগ্রহায়ণ মাস

[১৩] মায়ের স্বামী, নাম ঃ রমণী মোহন চক্রবর্ত্তী।

শেষ হইলে তাহার ১৮ বৎসর পূর্ণ হইবে, তখন সে সময়ের মাত্র অল্প দিন বাকি।

ইতিমধ্যেই একজন লোক তাহার অন্ধ স্ত্রীকে নিয়া এখানে ভিক্ষা করিতে আসে। হঠাৎ এক খেয়াল হইল যে যদি এ অন্ধটিকে ৭/৮ মাসের খোরাকি ভিক্ষা দেওয়া যায়, তবে সুরবালা অন্ততঃ সে কয়দিন বাঁচিবে। তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি গিয়া তাহাকে দেখিতে পারিব। ঐ লোকটি প্রায় আসিত এবং চাউল ও পয়সা মিলাইয়া তাহাকে ঐ কয় মাসের খোরাকি দেওয়া হইয়াছিল। সেই ভিক্ষাই সুরবালার মৃত্যুর নিযন্ত্রিত দিনের অতিরিক্ত প্রায় ৮ মাস বাঁচিয়া থাকার কারণ হইল। এই বাঁচিয়া থাকাও পরে এ শরীরের সঙ্গে দেখা হইবার কারণ হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে এ শরীরের ঢাকা যাওয়া হয়।

এ শরীর যখন তাহার কাছে গেল, সে সময়, পূর্বে যেমন মুদ্রাদি স্ফুরিত হইত তেমন আপনা আপনি তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার কানের কাছে শব্দ উচ্চারিত হইল।[১৪] তাহার দীক্ষাও হয় নাই। কিন্তু ঐ শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসে। পরে এ শরীর চলিয়া আসিলে কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার দেহান্ত হয়।[১৫]

সুরবালার যখন বিশেষ অসুখ এ শরীর ঢাকায় একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে সারারাত্রি ছিল। শেষ রাত্রিতে কেবল সুরবালার কথা খেযালে আসিতেছিল। হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইল - তুমি এখন মুক্ত হও। তাহার পর দিন আমরা সাহবাগে ফিরিলাম। সন্ধ্যার সময় মা ও বাবা জয়দেবপুর হইতে আসিয়া বলিলেন - শেষ রাত্রে সুরবালা দেহত্যাগ করিয়াছে। মা খুব কান্নাকটি করিতেছেন কিন্তু এ শরীরের একই ভাব। পরে কেহ মিলাইয়া দেখিলে দেখা গেল যে, যে সময় এই শরীরের ঐরূপ খেয়াল হইয়াছিল সেই সময়ই তাহার দেহান্ত হয়।

বিবাহের তিন বৎসর পর সুরবালা মারা যায়। যদিও সে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র সংসারে ছিল, এই অল্প সময়ে তাহার মধুর ব্যবহারে তাহার রূপ ও গুণে সে সকলকে বশীভূত করে। শিশুকাল হইতেই তাহার অসাধাবণ বুদ্ধি ও প্রীতিমধুর ব্যবহার এবং পিতা-মাতার দারিদ্রের মধ্যে দুঃখ কষ্টে অপবিসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

[১৪] স্বাভাবিক ভাবে দীক্ষা দানের দ্বিতীয় ঘটনা।

[১৫] আগস্ট ১৯২৪, ১৮ বছর ৮ মাস বযসে মৃত্যু হয।

ছেলেবেলা হইতে তাহার খেলাধুলায়, মেলামেশায় সমস্ত ব্যবহারে এবং বড় হইয়া বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে সাময়িক মাথার ভিতর কি এক অসুখ হইয়া - কিছু সময়ের জন্য যখন দেহ শুষ্ক, চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির - সে অবস্থায়ও সে এ শরীরের চিন্তায় দিনাতিপাত করিত এবং তাহার মৃত্যুও ঠিক সেইভাবে হইয়াছিল।

বাজিতপুরে থাকাকালীন এ শরীরের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শরীরের ব্যারাম দেখা গিয়াছিল। এ শবীরের এই কতদিন খেলার সাথীব জন্য তাই দেখা যায, সে জগতে আসিযাছিল এবং উপস্থিত তাহাব সঙ্গে ঐ পর্যন্ত খেলা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতর তাহার মুক্তিব ভাব জাগিয়াছিল। তাহাব মৃত্যুর প্রায় ৬-৭ বছর পর যখন একবাব চুনার গিয়াছিলাম তখন ঠিক সুরবালার মত রূপ ও গঠন একটি মেয়ে জ্যোতিষের বাসায় অল্প সময়েব জন্য হঠাৎ দেখিয়াছিলাম।[১৬]

বিদ্যালয়ে মা

খেওড়া ও মামাবাড়ি সুলতানপুর এই দুই জায়গায মিলাইয়া মাত্র দুই চার মাস এই শরীর স্কুলে যাওয়া আসা করিয়া ছিল কিনা খুঁজিয়া বাহির কবিতে হয়। খেওড়া স্কুল দূরে ছিল। বাড়িতে ভাইদের অসুস্থতার দরুণ একা যাওয়া-আসা এই সব নানা কারণে সবদিন স্কুলে যাওযা ঘটিয়া উঠিত না। একবার এই শরীর মামাবাড়ি যাইয়া তিন মাস ছিল। তখন একখানি বর্ণবোধ কিনিয়া দেয় এবং সুশীলাদিদির সহিত এ শবীব স্কুলে যাইতে আবম্ভ কবে। প্রথমদিন স্কুলে যাইলে পন্ডিত মহাশয় দুইজনকেই একবার এক পাঠ ভাল কবিযা পড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন এখন তোমরা পড় দেখি। সুশীলাদিদি ততটা পারিল না। এই শরীরের পাঠ দেখিয়া পন্ডিত মহাশয় বলিলেন - বেশ মেযে। তিনি ভাবিয়াছিলেন আগে বোধহয় ভাল পডা ছিল। স্কুলে বড় বড় মেযেদের ছড়া শিখাইত। এ শরীরকেও তাহাদের সঙ্গে বসাইয়া দিত।

ইহার পর খেওড়া আসা হইল। সেখানে একটি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল ছিল। সর্ব সমেত তাহাতে ১০/১২টি মেযে পড়িত। স্কুলেব মাষ্টার মহাশয এই শবীরেব সম্পর্কে দাদামহাশয হইতেন। সেই স্কুলেই বর্ণবোধ শেষ হইল। শিশুশিক্ষাও সম্পূর্ণ পডা হয় নাই। প্রথম শ্রেণীতে ৪টি মেয়ে ছিল। এই শবীব বয়সে সকলের

[১৬] জন্ম-মৃত্যুব পব পাবে সংস্কারেব সম্পূর্ণ ভাবে লেশ কাটাইযা চবম মুক্তি লাভ কবিতে কিছু সময লাগে।

ছোট হইলেও তাহাদের সঙ্গে পড়িতেছিল। ৪টি মেয়ের নূতন পুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি, আর এ শরীরের ছেঁড়া একখানি পুস্তক, তাহাও কাহারো নিকট হইতে সংগৃহীত ও ছোট ভাঙ্গা এক টুকরো শ্লেট। তাহাতে ছোট ছোট করিযা লিখিলেও মাত্র ৩/৪ লাইন ধরিত।

এ শরীরের লেখাপড়ায় বড় খেয়াল যাইত না। পড়িতে বলে, তাই কখনও একটু পড়ে। এ শরীর নিয়মিত রূপে নিত্য পড়িত না। অথবা একেবারে পড়াই হইত না। মা বাপের খেয়ালে আসিলে শ্লেটের টুকরা খুঁজিয়া আনিয়া পড়িতে বসা হইত। অথচ স্কুলে দেখা যাইত যাহা জিজ্ঞাসা করিত তাহার উত্তর চোখের সামনেই আসিয়া যাইত ও ঠিক ঠিক হইত। তোমাদের যেমন এক জায়গায় একখানি ছবি দেখিলে ঐ ছবিটি চোখের উপর থাকিয়া যায়, ঐ ছবির স্মরণ হইলে বা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতে পারা যায়, এ শবীরের কিন্তু দেখা না দেখার কোন প্রশ্নই নাই। পাঠাদির বেলায়ও ঐ রকমই। আবার ইহাও হইত যে পুস্তকের যে স্থানটির উপর এ শরীরের লক্ষ্য পড়িত সেটাই প্রশ্ন আসিত।

একদিন স্কুলে ইনস্পেক্টর আসিয়াছেন। সকলে ভাল ভাল কাপড় পরিয়া গিয়াছে আর এই শরীর ছেঁড়া বইখানি, ভাঙ্গা শ্লেটের টুকরো, নিত্য যেমন ময়লা, ছেঁড়া কাপড়াদি পরিয়া, সেই সব নিয়া স্কুলে উপস্থিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর আসিয়া সুন্দর পোষাক পরা মেয়েদের দিকে চাহিয়া পুস্তকের এক জায়গায় দেখাইয়া একে একে বলিলেন - এইটি পড়, তাহারা থামিয়া থামিয়া পড়িল। সকলের পরে এই শরীরের পালা আসিল। বলা মাত্রই এই শরীর তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। ৬/৭ লাইন পড়িতেই ইনস্পেক্টর বলিলেন, বেশ! আর দরকার নাই। পরে তিনি লিখিতে বলিলেন। মাস্টার মহাশয় উপস্থিত লিখিবার জন্য এই শরীরকে একটি ভাল শ্লেট আনিয়া দিলেন। ইনস্পেক্টর যে পাঠটি বলিলেন তা এই শরীরের খুব জানা। তিনি এই শরীরের নির্ভুল লেখা দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই শরীরের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

খেওড়া স্কুলের মাষ্টারমশায় মারা গেলে তাহার স্থানে এক শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে আসিলেন। তিনিও সম্পর্কে এই শরীরের দিদিমা ছিলেন। একদিন সেখানে ইন্সপেক্টর আসিবে। ছাত্রী সংখ্যা বেশি দেখাইবার জন্য তিনি এই শরীরকে স্কুলে ডাকিয়া নিলেন। সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। এই শরীর তখন লেখা পড়ার কোন ধারই ধারে না। ইন্সপেক্টর কি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দিদিমা বাহির

হইতে আড়ালে থাকিয়া তাহার জবাব লিখিযা দেখান। এই শরীর উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল - হ্যাঁ? কি দেখাচ্ছেন? তখন তিনি জিভ কাটিযা সবিয়া গেলেন। যাহা হউক ইন্সপেক্টর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার জবাব এই শরীরের কিরকম করিয়া ঠিক মতই হইয়া গিযাছিল।

পরে ঐ দিদিমা এই শরীরকে গাযে হাত দিয়া বলেন যে ১১ বৎসর বয়স হইতে চলিল এখনও তোর বুদ্ধি হইল না? ওইরকম করিয়া কি বলিতে আছে? এই শরীর বলিল - আপনারাই না মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করেন - এটা মিথ্যা হয় না?

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহ

এই শরীর যখন বড় হইতে লাগিল তখনও কাহারও সহিত আপন পর ভাব ছিল না। সকলের সঙ্গেই সরলভাবে হাসিয়া খেলিযা চলিত। খেওড়ার সম্পর্কে অনেকে দাদামহাশয় ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে শিশুর মত আদর আবদারে এই শরীরের দিন কাটিত। একদিন এই শরীরের মা বলিলেন - বড় হইয়াছিস, এইরকম ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে না। বয়স বেশি হইলে মেয়েদের পুরুষকে ছুঁইতে নাই, হাসি তামাসা করিতে নাই। কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে নাই। সেদিন হইতে এই শরীরের চলাফেরা আপনা আপনিই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আবার একদিন বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - ১২ বৎসর হইলে এ শরীরের বিবাহের জন্য বাবা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এ শরীরের ছোট মামা কোষ্ঠী দেখিতে জানিতেন। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে নিয়া বারবার চাওয়া সত্ত্বেও ফেরৎ দেন না। এই কারণে পিতামাতা ভাবিতেন কি জানি কোষ্ঠীতে বোধ হয় বিরুদ্ধ কিছু আছে। বিদ্যাকূটের কাশ্যপ গোত্র, ভট্টাচার্য বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্মানীয়। তাহারা বিক্রমপুর[১] ভিন্ন অন্যত্র কন্যাদান সহজে করিতেন না। অন্য দেশ হইতে ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু সে সব ফিরাইয়া দিলেন। অবশেষে বাবা পাত্রের সন্ধানে নিজেই ঢাকার নিকট বিক্রমপুর গেলেন।

একদিন হঠাৎ দৌগাছির শ্রীযুক্ত সীতানাথ কুশারী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বাবা বাড়িতে আসিলেন। তিনি ভোলানাথের বড় ভগ্নীপতি। সম্বন্ধাদি একরকম

[১] সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

পাকাপাকি করিযাই কুশারী মহাশয় এই শরীরকে ডাকিয়া কথাবার্তা বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে একটি শুভদিন দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে ঠাকুরমার খুব অসুখ হইল। ইহার পব ঠাকুবমা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলে মাঘ মাসে বিবাহেব দিন ধার্য হইল। বিবাহের প্রস্তাবে গ্রামের সম্পর্কীয় বুড়াবুড়ি ও সমবয়সীরা কত কি ঠাট্টা তামাসা কবিতেছে কিন্তু এই শবীরের একই ভাব। কেবল কানে শুনিযা যায়। ১২ বৎসব ১০ মাস বয়সে বিবাহ হইয়া গেল।[২] বিবাহের সময় যেইরূপ বলিল সেইভাবে উঠিয়া বসিয়া এই শরীর সকলকে আনন্দ দিল।

বিবাহের পরদিনই ভোলানাথের দাদা যেখানে কাজ কবিতেন সেইখানে নিয়া গেলেন। তিনি শ্রীপুরের স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। খেওড়া হইতে বিদায হইবার সময় সকলে কান্নাকাটি করিতেছে। এ শরীরও তাহাদেব সঙ্গে যোগ দিয়া অস্বাভাবিক কান্না কাঁদিল। কেহ কেহ বলিল যে এমন করিতে ত কাহাকেও দেখি নাই। এ শরীর ত, ব্যস! যখন যেখানে যাহা হইয়া যায।

ভাসুরের সংসারে মা

খেওড়া হইতে আসিবার সময় শরীরের মা বলিযাছিলেন - সতীধর্ম সর্বদা রক্ষা করিবে। তাহা হইলে দেবতারাও ভয কবে। নিজেব জীবন উৎসর্গ কবিবে তবু সতীধর্ম ছাড়িবে না। স্বামী বা অভিভাবকেরা যখন যাহা বলেন নির্বাক হইয়া পালন করিবে। বিবাহের পর ভোলানাথ চাকুবীস্থলে চলিযা গেলেন। তিনি এ শবীরকে বলিয়াছিলেন - আমার ভাই ও ভাই-এর স্ত্রীব কথা মানিয়া চলিবে।

শ্রীপুর আসিযা এই শরীর দিবারাত্রি সংসারের কাজকর্ম নিয়া থাকিত। রান্নাবান্না, ভাসুরের[৩] ছেলেপিলের যত্ন, গৃহাদি পরিষ্কার, বাসন-মাজা, কাপড় কাচা, সব রকম গৃহস্থালী এই শরীর কলের মত একা করিয়া যাইত।[৪] কাজের ভীড়ে এই শরীরের খাওয়া দাওয়া, মাথা আচঁড়ান, গা পরিষ্কার করা কিছুই খেয়াল হইত না। সর্বদা জল ঘাঁটিয়া কাজ করিতে করিতে এই শবীবেব হাতে ও পাযের আঙ্গুলে ঘা হইয়া গেল।

[২] ২৫শে মাঘ, ১৩১৫, ববিবার (ইং ৭ই ফেব্রুযারী, ১৯০৯)।

[৩] রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী।

[৪] মাত্র ১৩ বছর বয়সে সম্পূর্ণ সংসাবের দাযিত্ব একা বহন কবা - কর্ম যোগিনীর লক্ষণ।

আশুর[৫] বাবার খুব অসুখ হইল। চিকিৎসা করাইবার জন্য সকলে ঢাকা গেলেন। ঢাকা হইতে সকলে আটপাড়া গ্রামে তাহাদের ঝাড়িতে গেলেন। এই শরীরের হাতে পায়ের ঘা দেখিয়া পাড়ার অনেকে বলিত - তুমি কেমন? তোমার কি ব্যথা বেদনাও লাগে না? তুমি কি মানুষ নও? এই সব বলিয়া তাহারা দুঃখ করিত। তাহারা জানিত না এই শরীরের উপস্থিত কর্তব্য - আদেশ পালনের দ্বারা সেবা।

আশুর বাবার অসুখ কমিলে সকলে শ্রীপুর আসিলেন। তিনি এই শরীরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তখনকার দিনে ভাসুর ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধের ভিতর দুরত্বের বিধান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি এই শরীরের সেবার ত্রুটি ছিল না। শ্রীপুরে অসুখ বাড়িয়া যাওয়াতে তিনি আবার আটপাড়া গেলেন। সে সময়ে বাবা আসিয়া এই শরীরকে খেওড়া নিয়া গেলেন। বাবা মার সঙ্গে কয়েকমাস থাকিয়া নরুন্দি স্টেশনে আশুর বাবা পুনরায় কাজে হাজির হইলে আশুর মায়ের সহিত এ শরীর আবার সেখানে গেল।

নরুন্দির এ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী তথায় প্রথম আসিলে তাহার বাসা হইতে এই শরীরকে রান্নাঘরে দেখিতে পাইল। পরে যখন আশুর মার সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিল তখন বলিল - আপনাদের রান্না ঘরে সেই দিন একটি বউ দেখিয়াছিলাম সেইটি কোথায়? আশুর মা বলিল - এই ত। সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। সে বলে - সেই দিন দিব্য রূপবতী দেবী প্রতিমার মত একজনকে দেখিয়াছিলাম। ইহার সঙ্গে তো মিলে না।

তাহারা নরুন্দি হইতে চলিয়া গেলে সে জায়গায় একজন মুসলমান কর্মচারী আসিল। তাহার বোন এ শরীরের সঙ্গে তাহাদের ধর্মের অনেক ভাল ভাল কথা আলোচনা করিত। তাহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ পাইত। যেন কোনও ভিন্ন ধর্মের প্রশ্নই ছিল না, কথার ভাব ইত্যাদি এমনই ছিল।

শিশুকাল হইতে কোন কোন সময় কিছুক্ষণেব জন্য এই শরীরের এমন একটি প্রকাশ হইত যে ইহা আছে কি নাই এবং কোথায়ই বা নাই। সাময়িক শরীরও গায়েব। কাহারো মুখের কথা - তাহাদের দৃষ্টিপথেও নাকি ঐরূপ চমক লাগিত এই ভাব। এইরূপ সময়ে কর্মাদিতে থাকিলে সবই যেন কেমন হইয়া যাইত। এইরূপ ভাবের কথা কাহাকেও জানাইতে মুখে বাহির হইত না।

অনেকদিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এইজন্য অর্থাৎ তাহাদের না বোঝার

[৫] রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র।

দরুণ এ শরীরকে কটুকথা শুনিতে হইত। কারণ কোনও কোনও গৃহস্থাশ্রমে যেমন কেহ অন্যায় করিল, তাহাদের দৃষ্টিতে, অন্যের দোষ আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল, অর্থাৎ দোষ চাপাইয়া দিল। অপরের দোষ আসিল বলিয়া এ শরীর তো আর কিছু বলিত না, চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত, পরে তাহারা বুঝিত, কিন্তু এ শরীরের তো একই ভাব থাকিত। যে যাহাই বলুক চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। নিজের যাহা কর্তব্য কর্ম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আনন্দে করিয়া যাইত। এ শরীর জানিত সংসারের এই রূপ।

জগতের সকলে 'সংকে সার' করিয়া যার জন্য যথানির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা করিয়া কর্মক্ষয় করিয়া যাইতেছে। দেখ, সংসার ত 'সংই-সার'। সং সাজা বই ত নয়। সংটাকে সার বলিয়া বসিয়া থাকা হয বলিযাই যত দুঃখ কষ্ট।

বিদ্যাকূটে

তখন এ শরীরের বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। এই সময়ে বিদ্যাকূটে এ শরীর যখন ঘোরাফিরা করিত তখন দেখি বাঁদিকে চোখের কাছে একটি নক্ষত্রেব মতো আলো প্রায়ই ফুটিয়া উঠিত। হবিনাম করিবার ভাব ইত্যাদি সেই সময়কালীন। এক সময় ইহাও হইয়াছিল বিদ্যাকূটে ঠাকুর ঘরে, যেখানে শালগ্রামশিলা সেখানে সকালবেলার দিকে কোন কোন দিন এ শরীর ঢুকিয়া চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িত। একদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিত, কেমন একভাবে। তখন দেখিত সিংহাসনের ভিতরের ঠাকুর সিংহাসনের উপরেই বসা - যেমন পূজার সময় আসনে বসা থাকেন। কখনও সবুজ, ক্রমশ নীল - বেশ জ্যোতিঃপূর্ণ চারিদিকে কিরণ ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। তখন খেয়ালই থাকিত না, ঠাকুরকে ত পূজা করিয়া গতরাত্রে শয়ন দেওয়া হইয়াছে। এখনও ঠাকুরকে জাগানো হয় নাই। এ জায়গায় উপস্থিত কি করিয়া? পরে দরজা খুলিয়া সকলেব সঙ্গে দেখিলে দেখা যাইত, ঠাকুর এ জায়গায় নাই। সেই সিংহাসনেই নিদ্রিত। ইহা অবশ্য এ শরীরের সাধনার খেলার খেযালটা যখন আসিয়াছিল, সেই সময়কালীন।

সেই ঠাকুর দাদামহাশয় ও অন্যান্য শরিকেরা পালা করিয়া পূজা কবিতেন। পবে এইসব শবিকেরা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায এবং দাদামহাশয়ও বাড়িতে না থাকায় ঐ ঠাকুরকে অন্য কোন জায়গায় রাখিয়া আসা হয় - বহু বিগ্রহের সঙ্গে। ঠাকুরের নাম রাজরাজেশ্বর। রমনা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে পবে দাদামহাশয এই

বিগ্রহ অন্যান্য বিগ্রহের মধ্যে হইতে খুঁজিয়া আনেন। বর্তমানে কাশীতে অন্নপূর্ণার সহিত এই বিগ্রহের পূজা হইতেছে।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী রাজ-রাজেশ্বর শালিগ্রাম

বিদ্যাকূটেই যে সময় এ শরীর ছিল, তখন অন্যান্যরা লক্ষীপূজা করিত। মায়ের আগ্রহে একবার লক্ষীপূজার ব্যবস্থা হয়।

একদিন বারান্দায় বসিয়া বেতের দ্বারা অক্ষর বুনটে তুলিয়া পাখা বানাইতেছি। তখন দেখি এ শরীরের ছোটমামা (সারদা চরণ বিদ্যাসাগর) আসিয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর পাখা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন - এ কঠিন কাজ। সময় লাগে ও বুদ্ধি খাটাইতে হয়।

এ শরীর অনেকদিন যাবৎ বিদ্যাকূটে আছে। কিন্তু তাঁহার শরীর বড় ভাল নয়। এ জন্য এ শরীরকে এতদিন দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ছোট সময়ে এ শরীব তাঁহাদের বাড়ি গেলে একটি গাছের কাঁঠাল নাকি আনন্দ করিয়া খাইত। তাহার ছায়ায় হাঁটিত ও পাতা নিয়া খেলা করিত। সে গাছটি বহু পুরানো। কোন বৎসর এত ফল দিত যে গোড়া হইতে মাটি ফুড়িয়া ফল বাহির হইত। ফলও বেশ বড় হইত। মামা আসিতে এ শরীরের জন্য সেই গাছের একটি কাঁঠাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়া আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ বসিয়া 'আমি এখন পূর্বপাড়া যাই' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার মামাতো বোনের মেয়ের বিবাহ।

পরের দিন এ শরীরও সেই বাড়ি গেল। নিমন্ত্রণের খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে বেলা পড়িয়া গেল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসে। এই শরীরের সঙ্গে ছোট এক ভাই ও দুই বোন ছিল। এই শরীর মামাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখা করিয়া জানাইল যে এ শরীরকে একা একা বাড়ি যাইতে হইবে। শুনিয়া বলিলেন - আমি কি তোমাদের সঙ্গে যাইব? এ শরীব চুপ করিযা রহিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় নিয়া বাহির হইলেন। তাহাব অম্বলের ব্যথা ছিল। শেষ বেলায় খাওয়ার পর আবাম করিয়া একটু শুইয়া ছিলেন। বিযে বাড়িতে তখনও মেয়ে জামাই-এর নমস্কাবী লৌকিকতা ইত্যাদি শেষ হয় নাই। সঙ্গে যাইবার তেমন কেহ নাই দেখিয়া বোধহয় মামা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। এ শরীরের খেয়াল হইতেছিল যে মামাকে নিয়াই বাড়ি যাইবে। পরে রাস্তায় চলিতে চলিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল।

ছোটমামার দেহত্যাগ

বাড়িতে মা মামার জন্য অন্য একটি ঘরে শোবাব বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। আমরা সকলে শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পব তিনি মার নাম ধবিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মা এবং অন্যান্য সকলে উঠিলেন। দেখিলাম মামা কাতব স্বরে বলিতেছেন - আমাকে বারান্দায় একটি বিছানা করিয়া দে। মা তাহাই করিলেন। বেদনা ও শরীরের অত্যন্ত গ্লানি ও ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখিয়া মা কবিবাজ ও পাড়ার বিশেষ বিশেষ কয়েক জনকে ডাকাইয়া আনিলেন। কবিরাজের ঔষধে কোন ফল দেখা যাইতেছে না। অবস্থাও মন্দেব দিকে চলিয়াছে। মা ইহা দেখিয়া ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন - না, আমি তোদের এইখানেই মরিব। এখনই মরিব। অথচ তিনি সকলের সঙ্গে বেশ কথা কহিতেছেন এবং দেব দেবীর নাম, তাঁহার পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদের নাম, এই শরীরের বাবার পিতৃপুরুষগণের নাম নিতে নিতে প্রণাম করিতেছেন। পরে বলিলেন - আমার নাভি পর্যন্ত ঠান্ডা হইযা আসিতেছে। সময় নিকট। ইহা শুনিয়া এই শরীরের এক দাদা যাইয়া দেখিলেন সেই অবস্থা। তিনি তাঁহার পা ঘসিয়া দিতে লাগিলেন। মামা বলিয়া উঠিলেন - আপনি বৃদ্ধ পন্ডিত, উচ্চবংশেব সন্তান, আমার পা আপনি ধরিলেন! এই বলিতে বলিতে সকলের দিকে মুখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, আর অমনি তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তিন চার ঘন্টার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। মা কাঁদিতে লাগিলেন। এই শরীরের কিন্তু কান্না আসিল না। এ বাড়িতে যে একটা বিপদ হইযা গেল তাহাব কোন প্রকাশ পাইল না। পরদিন পাড়ার কেউ কেউ যখন মামাব মৃত্যু বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল, এ শরীর সব বলিল। তখনও দুঃখের কোন প্রকাশ হইল না। এ শরীর দেখিতেছিল, অনেকে চুপি চুপি বলাবলি করিল যে, ইহার যেন মায়া মমতা কিছুই নাই।

ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে

পরের দিন প্রাতে ভোলানাথের চিঠি আসিল যে কাল তিনি বিদ্যাকূটে পৌঁছিবেন। বিবাহ হইয়াছে অবধি ভোলানাথ আর বিদ্যাকূটে আসেন নাই। কারণ অভাব অনটনের দরুণ তাঁহাকে আনিতে পারেন নাই। ভোলানাথ আসিলেন। কয়েকদিন যাবৎ পিতা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি আসিলে ভোলানাথ সহ অন্যান্য সকলে মিলিয়া নৌকায় সুলতানপুরে মামাবাড়ি গেলেন। শুনিয়াছি সুলতানপুরে

এ শরীরের মাতুল বংশ খুব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারে অনেক পন্ডিত, ক্রিয়াবিদ ব্যক্তি ও সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

ভোলানাথের ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। মামাবাড়ি হইতে বিদ্যাকূট আসিয়া কয়েকদিন পর এ শরীর ভোলানাথের সহিত তাঁহাব কর্মস্থল অষ্টগ্রামে আসিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ মাসে তখন এ শরীরের বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। সেখানে জয়শঙ্কর সেন নামক এক ভদ্রলোক ছিল। তাহার পরিবারে সারদা নামে একটি ছেলে ও তাহার শালা হরকুমার। সে বাড়িতে কয়েকখানি ঘর ছিল। আমরা তাহার একটিতে উঠিলাম। ভোলানাথের সঙ্গে মধুবাবু নামক এক কর্মচারী পরিবারসহ কয়েকদিন ছিলেন।

এই শরীর যেই দিন অষ্টগ্রামে গেল সেইদিন ভোলানাথ একটি নাকের ফুল বাক্স হইতে খুলিয়া পরিতে দিলেন। এ শরীর পরিল, ও বিদ্যাকূট হইতে তৈয়াবী একটা নাকের ফুল যাহা নাকে ছিল, সেটি খুলিয়া রাখিল। একদিন মধুবাবুর স্ত্রী ঐটি দেখিয়া পছন্দ করাতে এ শরীর তাহার নাকে পরাইয়া দিল। পরে ভোলানাথ যখন ইহা শুনিলেন, এ শরীর গায়ের সোনা অপরকে দিয়াছে তখন রাগ করিলেন। তখন খেয়াল হয় নাই যে কাহাকে কোন জিনিষ দিলে ভোলানাথ বিবক্ত হইবেন। এ শরীর বলিল - আচ্ছা, অন্যায় হইয়াছে। জিজ্ঞাসা না করিযা গায়েব সোনা আর কাহাকেও দিব না।

জয়শঙ্কর সেনের স্ত্রী আমাকে একদিন বলে সকলের সন্তান আছে, তাহাদিগকে অমুকের মা বলিয়া ডাকি। তোমার হাসিটাকে খুশী নাম দিলাম। ঐ তোমার সন্তান, কেন না তোমাকে কোন সময়ই আমি এ পর্যন্ত বেজার হইতে দেখিলাম না। সর্বদা যেন হাসিখুশী লাগাই আছে। তোমাকে 'খুশীর মা' বলিয়া ডাকিব। তখন হইতে সেখানে সকলে এ শরীরকে খুশীর মা বলিত ও খুব ভালবাসিত।

ক্ষেত্রবাবু নামক এক কর্মচারীও জয়শঙ্কর সেনের বাড়িতে ছিল। শুনিলাম মধুবাবুর স্ত্রী ও ক্ষেত্র বাবুর স্ত্রী জয়শঙ্কর সেনের স্ত্রীকে মা ডাকে। উহাদের মেয়ে নাই বলিয়া তাহার সহিত ধর্ম-মেয়ের মত তাহারা ব্যবহার করে। এ শরীর তাহাকে মাসীমা ও অপর সকলে দিদি বলিত। হরকুমাবকে সকলে মামা ডাকে। এ শরীরও তাই সময়ে সময়ে কথা প্রসঙ্গে মামা বলিত, তবে তাহার সঙ্গে কথা বলিত না। ঘোমটা দিয়ে থাকিত।

হরকুমারের ভবিষ্যৎ বাণী

হরকুমার একদিন এ শরীরের ঘরে আসিয়া বলে আমার মা অল্পদিন হয় মারা গিয়াছে। এইঘরে এখানেই থাকিত। তুমিই আমার মা - এই আবার আমার মা ঘরে আসিয়াছে। এবার কিন্তু আমাকে ষষ্ঠীর কাপড দিতে হইবে। সে অবধি হরকুমার আমাকে মা বলিয়া ডাকিত। ষষ্ঠীতে ভোলানাথ তাহাকে কাপড় দিয়াছিলেন।

তিনি তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার হিসাবপত্র সে রাখিত। আমাদের অসুখ অসুবিধা সর্বদা লক্ষ্য রাখিত। ইহা দেখিয়া কাহারো কাহারো ভাল লাগিত না। পূর্বে তাহার চাকুরি ছিল, এখন নাই চেষ্টা করিতেছে। তাহার স্ত্রী মেয়েরাসহ বাপের বাড়ি আছে।

জয়শঙ্কর সেন, তাহার স্ত্রী ও হবকুমার এ শরীরের রান্না ও কাজকর্ম খুব পছন্দ করিত। তাহারা পেঁয়াজ খাইত, বলিত তাহা না হইলে খাওযা যায় না। কিন্তু এখানে পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। কোন কোন দিন এ শরীরের রান্না ডাল তরকারী তাহাদের দেওয়া হইত। তাহাবা বেশ তৃপ্তির সহিত খাইত। ক্রমে ক্রমে তাহাবা পেঁযাজ ইত্যাদি ছাড়িযা দিল।

একদিন কি কি রান্না করিয়াছে, ভোলানাথ খাইতে বসিযা এ শরীবকে বলে জয়শঙ্কর সেন খাইতে বসিযাছে। তাহাকে এই ডাল একটু দিয়া আস ত। এ শরীর তাহাই করিল। পরে ভোলানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন - আজ দেখিব, রোজই বাবাজী বলেন খুশীর মার মত কেহ রান্না করিতে পারে না। দেখি ডাল খাইয়া আজ কি বলে। পরে জয়শঙ্কর সেনকে ডাকিয়া বলেন - কি! আজ ডাল কেমন হইয়াছে? খুশীর মার মত ডাল রান্না কেউ নাকি আর করিতে পারে না। জয়শঙ্কর সেন তাহা শুনিয়া বলিল কেন কি হইয়াছে? বেশ ত ভালই হইয়াছে। ভোলানাথ বলিল - আপনি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। ডালে ত লবণ একেবারেই দেয় নাই। সে তবুও বলে আপনি ঠিক বলিতেছেন না। আমাদের খুশীর মাকে মিছামিছি জব্দ করিতেছেন। পরে জানা গেল তাহার মুখে সত্য সত্যই আলুনি লাগে নাই, অথচ ডালে বাস্তবিকই লবণ ছিল না।

হরকুমার একদিন কি জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি হাতে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতে গেলে সে বোঝে না ও বলে - মা, তোমাকে এক বছর যাবত মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছি। আব কত অনুনয বিনয় কবিতেছি, কিন্তু তুমি

আমার সঙ্গে কথা বল না। এইভাবে যদি পাথরের চিন্তা করিতাম, এই রকম করিয়া মা ডাকিতাম, তাহা হইলে পাথরেরও চৈতন্য হইত এবং কথা বলিত। এই বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ভোলানাথ পূর্বে একদিন উহার সহিত কথা বলিতে বলিয়াছিলেন। আমি ততটা খেয়াল করি নাই। সেইদিন আবার বলিলেন। তখন হইতে তাহার সহিত কথা বলিতাম।

ইহার পূর্বেও প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে প্রণাম করিযা যাইত। আমি খাইতে বসিলে 'প্রসাদ দাও, প্রসাদ দাও' বলিয়া শিশুর মতো পাতের কাছে বসিয়া থাকিত। না পাইলে উঠিত না। প্রায় রোজই আমার রান্না তরকারী নেওযা তাহার এক নিত্য কর্ম ছিল। কোন কোন সময় আমাকে বলিত - আমি মা ডাকি। **দেখবি মা, একদিন জগতের লোক তোকে মা ডাকিবে। তোকে ত কেহই চিনিতেছে না।**

একদিন আব্দার করিয়া বলিয়াছিল - মা! আমার একটা নাম রাখ। আমি বলিয়াছিলাম তোমার নাম 'হরিবোলা'। শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইয়াছিল। সে বেশ নাম-কীর্তন করিত। পরে অন্য কোথায় চাকুরী করিতে সে চলিয়া গেল। মাঝে মাঝে পত্র দিত। তাহাতে প্রথম পাঠ ছিল 'মা দেবী'। হরকুমারের সত্য কথা বলার দিকটাই প্রবল ছিল। পরে যখন বাজিতপুরে যাই, তখন তথায় দেখিলাম হরকুমার পাগল হইয়া গিয়াছে। পাগলও সে হরিনামের পাগল। ভগবৎ কথা ছাড়া আর কোন কথা থাকিত না। সে অবস্থায়ও তাহার ভাবগুলি বড় শান্ত ও সুন্দর দেখা গিয়াছিল।

দেবালয়ে একাত্মভাব

সন্নিকট গ্রামে ব্রহ্মাণী দেবীর এক মন্দির ছিল। একদিন এ শরীরকেও সেখানে নিয়া যাইবে। কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইতেছি এমন সময় ক্ষেত্রবাবু নামে ভোলানাথের বন্ধুস্থানীয় এক ভদ্রলোক এ শরীরকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল - আমার দেব দর্শন হইয়াছে। প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমরা ব্রহ্মাণী মন্দিরে গেলে হঠাৎ এ শরীরের একটা অস্বাভাবিক ভাব হইল। উহা অনেকে লক্ষ্য করিল। **এ শরীর সর্বরূপে, মূর্তি ইত্যাদির সহিত একই আছে ত - বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবেতে ও দেবীতে একই।** এই ভাবের বাহ্যিক প্রকাশটাও কেমন যে হইয়া পড়িত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অপরের ন্যায় মূর্তির সম্মুখেই প্রণামের ক্রিয়াদি হইল না। শরীরটা অসাড় ভাবে রহিল। বাহিরে টর্চ লাইটের মত প্রকাশ অপ্রকাশ উভয় অবস্থাদি ক্ষণিকের জন্য বহির্জগতের কোন কোন সময় হইয়া পড়িত। কোন কোন সময় অন্যান্য যে কোন দেবালয়ে লোক ও কোন মূর্তি বিশেষ বলিয়া কথা না, হঠাৎ এ জাতীয় অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ হইত এবং সঙ্গীদের দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়িত।

ভাবানুযায়ী ক্রিয়াদির পরিবর্তন

অষ্টগ্রামে বড় হাওর (জলাশয়) আছে। বর্ষাকালে জলে ডোবা থাকে, এপার ওপার দেখা যায় না। ইতি পূর্বে জাগতিক ভাবে সমুদ্র দেখা হয় নাই। পারশূন্য জলময় জায়গা এই প্রথম এইরূপে দেখা। একদিন নৌকায় বিলে বেড়াইতে গিয়াছি দেখি কি আমি ত জল হইয়াও আছি। অনেক সময় মুহূর্ত মধ্যেই এ শরীরের ভাবের ত এইরূপ হইয়া যাইত। শরীরের ভাব জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মাঝে মাঝে বাহিরে জনতার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিছুক্ষণ সেই সময় শরীরটা আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া নৌকায় শুইয়া রহিল। নৌকায় মধুবাবু নামে একজন হাসি তামাসার ছলে বলিয়াছিলেন - ঠাকুরাণীব বুঝি ঘুম পাইয়াছে।

এই সব শুনিয়া প্রশ্ন করা হইল - এই সব অস্বাভাবিক ভাব মাঝে মাঝে কেন প্রকাশ হইত? মা হাসিয়া বলিলেন - এ শরীরের যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক একই বাবা!

কয়েক বৎসর পরে এ শরীরের ননদ মটরী, একদিন হাসিতে হাসিতে তাহার নিজের বিষয়ে গল্প বলিতেছিল তাহার নাকি একটা কি রকম অস্বাভাবিক খেলা হইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিলে একদিন বসিয়া আছি, মটরীর কথা খেয়ালে আসিতেই তাহার ঐ গল্পের কথাটিও খেয়ালে আসিল। খেয়াল হইল - বেশ ত, সেই খেলাটা একটু দেখিলে মন্দ কি? সাথে সাথেই তামাসার মত সেই খেলাটা বেশ দেখা গেল। কোন সময় দেখা যায় - যে ভাব সম্মুখে আসে ও যদি খেয়াল হয়, তদ্রূপ খেলা দেখা হইয়া যায়। যেমন কোন কোন সময় সাধকের অবস্থায় দেখিল কীর্তন খুব জমিতেছে, কীর্তনের ভাবে শরীরটা বেশ ভাবিত হইয়া গেল। কিংবা মুসলমান ধর্মভাব নিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে - কবরে গিয়া শবীরটা নমাজ পড়িয়া আসিল। আবার কোন সময়ে দেবপূজাদি যখন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, দেখা গিয়াছে যে সে জাতীয় ভাব ক্রিয়াদি নিযা সেই ভাবেই শরীরটা ভাবিত হইয়াছে।

একদিন এ শরীরকে যে মাসীমা বলিত, তাহার একটি চার-সাড়ে চার বৎসরের ছেলে আমাদের ঘরে আসিল, তাহারা তুলসীতলায় সামান্য নাম করিয়া লুট দিত। পূর্ব দিন তাহাদের ঐ রূপ লুট হইয়াছে। পরদিন সকালে ছেলেটি আমাদের ঘরে আসিয়া মাসীমা বলিয়া ডাকাতে আমি বলিলাম - 'বল হরিবোল'।[৬] ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল 'বল হরিবোল'। পর পর এক একবার দুইজনের বলাবলিতে ছেলেটার কেমন একটা ভাব হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাহাদের বাড়ির একজন বলিয়াছিল - এইরূপ বলা বোধ হয় ঠিক না। শিশুটি নাম বন্ধ করায় কেমন একটু হইয়া গেল। পরে কিন্তু শরীরটাকে দেখিলেই শিশুটি 'বল হরিবোল' বলিত।

ঘড় বাড়ির পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা

আবার একদিন মা বলিতে লাগিলেন ঘরের ভিতর বাহির এত পরিষ্কার রাখিতাম যে কোন একটি কুটাও দেখা যাইত না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধূপবাতি নিয়া গৃহটি প্রদক্ষিণ করিতাম। চাকর থাকা সত্বেও সকাল বেলা উঠিয়া নিজের হাতে গৃহস্থের সকল নিত্যকর্মাদি নিয়মিত পালন করিতাম। এখানে ও অন্যান্য ঘরেও মেয়েদের প্রত্যহ তুলসী প্রণাম করা, তুলসী তলায় ধূপ বাতি দেওযা, হরির লুট দেওয়া প্রভৃতি নিয়মাদি ছিল। মাসীমার ঘরে শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও কালীর বাঁধান ছবি ছিল। তিনি ঐ ছবিগুলি পূজা করিতেন।

অষ্টগ্রামে থাকা

১৩২০ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদ্যাকূট হইতে অষ্টগ্রাম যাই, সেখানে এক বৎসর ৪ মাস থাকি। প্রথম ২/৩ মাস সকলের সহিত নূতন আলাপ পরিচয়ে কাটিয়া গেল। প্রায় ৭/৮ মাস শারীরিক অসুস্থতা ও ক্রিয়াদির ভাবে কাটে। বাকি কয়েক মাস কীর্তন ও নামের ভাবে অতিবাহিত হয়।

দৈব ঔষধ

অষ্টগ্রামে মিলিয়া মিশিয়া বেশ কয়েকদিন চলিতেছে। এমন সময় একবার খুব অসুখ হইল। চলাফেরা অপরের সাহায্য ব্যতীত কঠিন হইল। ভোলানাথ

[৬] দীক্ষারই এক রূপ।

নিজে পাক করিয়া খান ও খাওয়ান। কিছুদিন পর্যন্ত এই অসুখ ভাবটা ছিল। সেই সময় একদিন বৈকালে বসিয়া খেয়াল হইল দৈব ঔষধ কেমন করিয়া পায় সেই খেলাটা দেখা যাক না। তখনই দেখি একটা বড় ফড়িং মুখে করিয়া একটা কাঁচা পাতা আনিয়া আমার বিছানার কোনায় রাখিয়া দিল। আমি পাতাটি হাতে করিয়া দেখিলাম স্থানীয় কোন পাতার সহিত মিলান গেল না এবং কোন চেষ্টাও আসিল না। পরে হিমালয় পাহাড়ে ঘুরিবার সময় কোন কোন জাযগায় ঐ পাতা দেখিয়াছি। এ কথা এ পর্যন্ত কাহাকেও বলা হয় নাই। এ শরীরের এইরূপ হয়। সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল হয় না। ভিতরে থাকিলেও মুখে বাহির হয় না।

তুলসী-তলায় কীর্তনে মা

মা আরও বলিলেন - ঘরের নিকট একটি তুলসী গাছ লাগাইয়া ছিলাম। প্রত্যহ ঐটি স্নান করাই, ফুল দিয়া সাজাই, চারিদিকে লেপি ও ধূপবাতি দিই। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিল তুলসী সেবা ত যতির আচার। সধবায় তুলসী সেবা করিতে পারে না। তাহাদের বলিলাম - ঠাকুর সেবায় কি কাহারো বাধা থাকিতে পারে? তাঁহার কাছে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সবই এক। মধুবাবুর স্ত্রী একদিন বলিল - আপনার হাতের শাঁখা ধোওয়া জল যেন তুলসী স্থানে না পড়ে, নিয়ম শঙ্খ ধোয়া জল নাকি তুলসীকে দেয না। প্রথমে আপনাব হাতের শাঁখাকে প্রণাম করিয়া তাহার পর তুলসী প্রণাম করিবার নিযম। উত্তবে বলিলাম - বেশ তাহাই হইবে। সে অবধি তাহাই করিতাম।

রান্নার সময় চাল নেওয়া হইত তাহা হইতে প্রতিবারে একমুঠা চাল তুলিযা রাখিতাম। ১০/১২ সের জমিলে ভোলানাথ চালেব বদলে পযসা দিতেন। ঐ পয়সা দেবকর্মে, গরীব দুঃখীকে দানে বা হবির লুটে ব্যয় হইত।

কীর্তনে মার প্রথম ভাবাবস্থা

একদিন ভোলানাথকে বলিলাম আমাদের তুলসী তলায় আজ হরির লুট দাও। ভোলানাথ স্বীকার করিলেন এবং হরকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন। সে এবাড়ি ওবাড়ি সকলকে জানাইল। সন্ধ্যা হইযা আসিতেছে। অল্প দূরে এক শিবালয় ছিল। তথায় রোজই একটু কীর্তন হইত। সেদিন ঐ কীর্তন শুনিয়া হরকুমার তাহাদিগকে ডাকিতে গেল। তাহারা বলিল এখানকার কীর্তন শেষ করিয়া আমরা আসিতেছি, আপনি যান। হরকুমার ফিরিয়া আসিযা, যাহারা উপস্থিত ছিল,

তাহাদিগকে নিয়া কীর্তন আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে শিববাড়ির দলও আসিয়া মহানন্দে কীর্তনে যোগ দিল। তখন মধুবাবুর স্ত্রী অসুস্থ ছিল। আমি তাহার বিছানায় বসিয়া ও বেড়ার ফাঁক দিয়া সব দেখিতেছি এমন সময় দেখিতে পাই সমস্ত বাড়িটা অত্যুজ্জ্বল আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর এ শরীর আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ আলোর সঙ্গে মিশিয়া কীর্তনের স্থানে। এদিকে ঠিক ঐ সময় এ শরীরটা মধুবাবুর স্ত্রীর খাটিয়া হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া যায় এবং একটু গড়াগড়ির মতনও হয়। পরে সমস্ত শরীর এলাইয়া অবশ হইয়া পড়ে। এ শরীরের বাহিরে হুঁশের প্রকাশ নাই কিন্তু অজ্ঞান নয়।

এ শরীরকে পড়িতে দেখিয়া ঐ রোগিণী কাহাকে ডাকিয়া বলিল। ভোলানাথ ও তাহারা আসিয়া ঐ রূপ অবস্থা দেখিতে পাইলেন। সকলে বলিতে লাগিল খুশীর মার ফিট্ হইয়াছে। চোখে মাথায় জল দিল, উঠাইয়া বসাইল, তখনও শরীর কাঁপিতেছে। সর্বাঙ্গে যেন আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। ঐ অবস্থা নিয়া তথায় কোনমতে বসিয়া রহিলাম। কীর্তন শেষ হইলে ঘরে গেলাম। ভোলানাথ এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রসঙ্গ তাহাকে বলিতেও শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। কথা বলিবার ভাব নাই, ধীরে ধীরে কিছু জানাইলাম। কীর্তন শুনিয়া এইরূপে পড়িয়া যাওয়া এই প্রথম দেখিলাম। এর পূর্বে কীর্তনে কাহাকেও পড়িয়া যাইতে দেখাও হয় নাই।

আর একদিন তুলসী তলায় কীর্তন হইলে সে সময় এ শরীর নিজের ঘরে ছিল। ভোলানাথ মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। ঐ দিনও পূর্বের মত অবস্থা হইয়া পড়িয়া যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠিয়া উন্মাদের মত বাহিরে ছুটিয়া কীর্তনে যাইবার ভাব হয়। ভোলানাথ ধরিয়া রাখেন। ঘরে থাকিয়াই এ শরীরের কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম চলিতে থাকে। সর্বাঙ্গ লুটাইয়া মাটিতে গড়াইতেছিল। ভোলানাথের শক্তিতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কীর্তনের পর শরীরের আগেকার মত সর্বাঙ্গ অবশ। আমাকে ভোলানাথ বিরক্তি সহকারে বলিলেন - আবার এইসব কি হইতেছে, লজ্জার কথা। আমি কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। এ কারণে কিছুদিন কীর্তনাদি বন্ধ রাখা হয়।

গগন সাধুর কীর্তন

পরে আরেকদিনের ঘটনা এই, নিকটবর্তী গ্রামে গগন নামে সাধু প্রকৃতির লোক আসে। ভোলানাথ কাছারি হইতে আসিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যায় আমাদের

এখানে গগন সাধুর কীর্তন হইবে। কীর্তনের পর সে এখানে খাইবে। রান্নার ব্যবস্থা কর। পাক তাড়াতাড়ী সারিয়া যে ঘরে কীর্তন হইতেছিল তাহাব পিছনের আঙ্গিনায় খোলা স্থানে এক চৌকির উপর আরও ৪/৫ জন সহ আমিও বসিলাম। সেখান হইতে কীর্তন বেশ শুনা যায় লোকজন দেখা যায় না। ঘরে বাঁশের দুয়ার, এ কারণে খাবার জিনিষগুলি ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য বাহিরে ভিতরে মাঝে মাঝে কেমন একটা ভাব নিয়া ছেলেমানুষের মত ছুটাছুটি করিয়া যাওয়া আসা করিতেছিলাম। ইহার ভিতর কোন্ সময় যে চৌকির উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছি কেহ বলিতে পারে না। উপরে খোলা আকাশ, গ্রাম দেশ। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল এক বৃদ্ধা তাহার নাতি ঘুমাইয়াছিল বলিয়া আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কীর্তন শেষ হইতে হইতে অনেক রাত্রি হইল, সকলেই যার যার ঘরে চলিয়া গেল।

ভোলানাথ ঘরে আসিয়া দেখেন এ শরীর ঘরে নাই বাতি জ্বলিতেছে। এ শরীরের নিজের ভাবের এত গভীরতা ছিল যে হয়ত তখন দরজাটিও ভাল করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। কুকুর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া নাকি সব খাবার নষ্ট করিয়াছে। ভোলানাথ রাগ করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। এদিকে সে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ হইতে এ শরীরকে ডাকাডাকি করিয়া হয়রান হইযা টানাটানি করিতেছিল। এ শরীর ধরিয়া তাহার অন্য রকম বোধ হইতেছিল। যেন স্বাভাবিক নয়। মৃতের মত। সে তখন ডাকিয়া বলিল - দেখুন আপনাদের খুশীর মা'র কিরূপ অসাড় অবস্থা, সমস্ত শরীর ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ ও আরও দুই তিন জন আসিয়া উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল। না পারিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে আনিয়া বিছানায় রাখিয়া দিল। ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া কীর্তনীয়াদের খাওয়ান হইল ও তাহাদের বিদায় করিয়া দিতে রাত্রি ভোর হইল।

এ শরীর আর নড়ে না। পাথরের মত একই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভাবিত ও ভীত হইলেন। যাহাকে সামনে পান তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন - কি করিব? কোনদিন ত এইরূপটা হয় নাই। আবার কীর্তন করিবার জন্য কেহ পরামর্শ দিল। সকলে একমত হইয়া গগন সাধুকে ডাকিয়া আনিল। সে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল - কাল রাত্রে কেন বলেন নাই? আমার খুব সৌভাগ্য যে আমার কীর্তনে এইরূপ ভাবাবস্থা হইয়াছে। সে আনন্দের সহিত রাত্রে যে পালা গাহিয়াছিল, তাহাই তখন আরম্ভ করিল। এ শরীরকে নিয়া কীর্তন ঘরের এক পাশে রাখিয়া দিল। কীর্তন শেষ হইতে

হইতে প্রায় বেলা ৪টা।

শুনিয়াছি ভাবদশা হইতে অভ্যুত্থানের সময় শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তের যে সমুদয় সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকার পরিলক্ষিত হয় বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে, তাহা পূর্বে ও পরে শরীরের চেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল। গগন সাধু ও আরও আরও নাকি কত লোকে চোখের জলে ভাসিয়াছিল। যাহারা দেখিয়াছে ও এ শরীর ধরিয়া আনিয়াছে তাহারা আনন্দে চোখের জলে ভাসিয়া তাহাদেরও কিরূপ ভাব হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় ঐ জায়গার ভাবধারা যেন অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল বহুক্ষণের জন্য। শুনিয়াছি গ্রাম শুদ্ধই একটা আলোড়ন পড়িযা গিয়াছিল ঐ স্থানটিতেও নাকি ঐ সময়েতে এক নূতন ভাবের বিস্তার হইয়াছিল। যে আসিত তাহারই কেমন একটা ভাব।

কীর্তনে গৌর নিতাই

পরে 'সারদা' (জয়শঙ্করবাবুর ছেলে) এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করিল - কীর্তনে আপনি কি দেখিলেন? আপনার কেন এমন হইল? তখনও শরীর অস্বাভাবিক। আপনা আপনি চোখ দিয়া জল প্রবল ধারায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মুছিলেও মুছা যায় না। এ শরীর উত্তরে বলিল - কীর্তন যখন রাত্রে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কীর্তনীয়ারা - 'এসো হে গৌর নিতাই' বলিযা গাহিতেছিল তখন ঘরে আসা যাওয়ার সময দেখিতেছিলাম গৌর নিতাই দুইজন বালক বেশে কীর্তনে। বালকদের কোথা হইতে প্রকাশ এই প্রশ্নের উত্তরে বলা - 'এই হইতেই' (নিজেকে দেখাইযা)। তখন সারদার কাছে বলিবার ভাবটা হয় নাই।

সেই সময়ও বাহিরের কর্মের গতির প্রকাশ ছিল। কৃষ্ণলীলা পালা গাহিবার সময়ও ছোট বালকের মতো ছুটাছুটির ভাব এ শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাহিরে বসিতে বসিতে ক্রমশঃ হাত পা ঠান্ডা হইয়া আসিতে লাগিল এবং কেমন হইল, এই শরীরটা যেন কীর্তনে এক বিশেষ ভাবেও সকলর সঙ্গে মিলিয়া আছে। এইসব ভাব যে কি বুঝাইবার ভাব আসিতেছে না। ভাষাই বা কোথায়?

দ্বিতীয়বার যখন কীর্তন হইতেছিল, তখন বর্হির্দৃষ্টির ক্রিয়ার দিকটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সহিত একই, আবার বিশেষ ভাবেও আছি, এই প্রকাশও দেখাইতেছিল। প্রথমে গায়ে কাপড় দিবাব ভাবই ছিল না, সকলকে দেখা সত্বেও ভিন্ন ভাব প্রকাশ ঐ সময কোথায়! ক্রমে ক্রমে গায়ে কাপড়াদি ঠিক

করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরও তিন চার দিন পর্যন্ত ঢুলু ঢুলু নেশার ভাব ছিল। কথা বলিবার সময়েও একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বাহিবে প্রকাশ হইযা পড়িত।

আর একদিন মামীমার বাড়িতে কীর্তন হয়। এ শরীরকে দেখিয়া রাখিবার জন্য ভোলানাথ একটি স্ত্রীলোককে নাকি বলিযা দেন। কীর্তনের নিকট হইতে অনেক দূরে একটি ঘরে, নিত্য যেমন সাধারণ ভাবে বসিযা থাকি সেদিনও তেমনি বসিযাছিলাম। এই সময়ে বিদ্যুতের মত একটি স্পর্শ যেন নিজের ভিতর হইতে জাগরিত হইয়া ফুটিয়া বেশ সুন্দর স্থিব একটি আসনে বসিযাছিল। কিন্তু দেখিলাম কীর্তন যতক্ষণ চলিতেছিল, একই ভাবে শরীবটা স্থিব হইয়া পাথরের মত অনড় রহিল দীর্ঘ সময়। পরে কেহ আসিযা ধাক্কা দিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তাহার অনেক পরে ধীরে ধীরে উঠিযা আসিলাম। শবীর অবশ, কিন্তু আনন্দে ভরপুর প্রকাশ বাহিরেও।

ইহার পর্র একদিন অন্য বাড়িতে যখন গগন সাধুর কীর্তন হয়। এ শরীর গিয়াছে, শরীরের ভাবের একটু পরিবর্তনেব দরুণ তাড়াতাড়ি কোন রকমে বাসায় চলিয়া আসিতে পারা গিয়াছিল। প্রথমেই তুলসী তলায় কীর্তন হইতে দেখিতেছিলাম যে নাম কীর্তন কানে আসিলেই শরীর অস্বাভাবিক হইয়া যাইত। জোর করিয়া ভিতরের ভাব চাপিয়া বাখিতে চেষ্টা করিলেও শবীর আর মানিতে চাহিত না। কি এক ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।

একদিন দূবে কোথাও কীর্তন হইতেছে, মধুবাবুব মেযে আমার কোলে ছিল, তাহাকে নিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেই, ভোলানাথ ধরিযা ফেলিলেন। সেটা কেমন? শবীবটা ঢলিয়া পড়িতেছে, হাত খুলিযা মেয়েটি পড়িযা যাইতেছে। গগন সাধুর কীর্তনের পর হইতেই ভাবাদি বিশেষরূপে দেখা যাইত। এক একদিন এক এক রকম হইত।

পূর্বে ছেলেরা যখন হরির নাম করিত, তখন তাহাদিগকে কোন কোন সময় বলিতাম - দেখিস্ দশায় পড়িস না। কিন্তু তখনও দশায় পডা যে কিরূপ দেখা দূরে থাকুক, তাহা কাহারও কাছে শোনাও ছিল না। কাহাকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখি নাই।

অষ্টগ্রামের স্থানীয় লোকগুলির মধ্যেও কীর্তন করার ভাবগুলি বেশ ছিল। উপস্থিত যখন পাড়া পড়শীরা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল যে উহাব দশা হয়, তখন হাসি পাইল। সবই ত খেলা, খেলা

ছাড়া ত কিছুই নাই। লোকে জানে না বোঝে না, তাই এইরূপ নানা ভাবে এই শরীরের সম্বন্ধে কথা বলে।

কীর্তনে যখন এই শরীরের উক্ত অবস্থাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন বিদ্যকূটে খবর গিয়াছিল যে এ শরীরের হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। শরীরের পিতামাতা সেই রোগের ঔষধ খুঁজিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। ভোলানাথ উত্তরে লিখিয়া দিয়াছিলেন হিষ্টিরিয়া নয়, সে ভালই আছে।

ভাগবত শ্রবণে জ্যোতি প্রকাশ

সারদা একদিন ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীকে বলিল - আপনারা যদি ভাগবত শুনিতে চান তবে খাওয়া দাওয়া সকাল সকাল সারিয়া আমাদের ঘরে আসিবেন। আমি আজ ভাগবত পাঠ করিব। সেইদিনই প্রথম একটু ভাগবত শোনা। আমরা সেখানে যাইয়া ভাগবত শুনিতেছি, দেখি কি এই শরীর দিয়া বিদ্যুত চমকাইবার মত অস্বাভাবিক ভাব এবং বিজলি বাতির আলোর মত প্রকাশ পাইতেছে - কেমন জানি এক রকমটা। হাত পায়ের আঙ্গুল ঠান্ডা ও শরীর অবশ। কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। ঘোমটা টানিয়া 'আমি যাই' বলিয়া ঘরের থাম ও বেড়া ধরিয়া কোনমতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘরে আসিযা চুপচাপ শুইয়া পড়িলাম। খানিক পরে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানোর মত আলো ও অস্বাভাবিক ভাবটা কমিয়া গেল, কিন্তু অসাড় ও ঢুলু ঢুলু ভাবটা অনেক সময় পর্যন্ত ছিল। এইরূপ হইলে অনেক সময় পর্যন্ত থাকিত।

ইহার পর আর একদিন সারদা সাধুর প্রসঙ্গ নিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল, তাহার সব কথা আমার কানেও আসিতেছিল না, তবুও শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। সর্বদাই শরীরে একটা এলান এলান ভাব মজ্জাগত ভাবে রহিয়া যাইত।

সারদা আমার এই সমস্ত অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিত। আমি একদিন তাহাকে বলিলাম - এইরূপ কেন হয় বলিতে পারেন? সে বলিল - আপনি যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করেন না, তাঁহার নাম ও গুণগান শুনিয়া যাহা হয় সবই ভাল। আপনি আপনার ভাবে চলিতে থাকুন।

হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত আসনাদি

অনেক সময় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ থাকিলে আপনা হইতে হরিবোল মুখে উচ্চারিত হইত ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবটা কেমন হইয়া লোমগুলি খাড়া হইয়া যাইত।

ক্রমে ক্রমে শরীর কাঠের মত স্থির হইয়া যাইত। দেহজ্ঞানে বাহ্য প্রকাশ কোথায় লুকাইতে থাকিত। আবার সে সময় দেখা যাইত সবই যেন এক শূন্যময় ভাবের প্রকাশ হইয়া কোথায় মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে। কিছুদিন যাবতই নিজের খেয়ালে হরিনাম শোনার দিকটা কিছু কিছু হইয়াছিল ত। তাহার পর হইতে এইরূপ প্রকাশটা।[৭]

একদিন খেয়াল হইল বসিয়া নাম করিব। অন্ধকারে চোখ বুজিয়া বসিযা মুখে নাম করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিতে ইতিপূর্বে কাহাকেও দেখি নাই। ২/৩ দিন বসিবার পর কতক্ষণ নাম চলিলে যেদিকে তাকাই আকাশ ও তারা দেখিতাম। ভোলানাথ কাহাকেও জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিলেন, ইহা যোগীর লক্ষণ ও ভাল।

একদিন রাত্রিতে খাওয়ার পর ভোলানাথকে বলিলাম - আমি একটু বসিব তুমি ঘুমাও। বিছানায় বসিয়া একটু নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি ভিতর হইতে শ্বাসের সহিত মিলিয়া হরিবোল উঠিতেছে ও মুখেও নাম হইতেছে। পবে দেখি আমার মুখ ও জিহ্বার যোগ একেবারে বন্ধ হইয়া কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাম চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শরীবের পবিবর্তনাদি আরম্ভ হইল এবং আপনা আপনি পা গুটাইয়া একটি আসন হইযা গেল। পবে শুনিলাম ইহা সিদ্ধাসন।

চিত্র ঃ সিদ্ধাসনে শ্রীশ্রী মা

তখন দেখি এ শরীর দুলিতেছে, আর দুলিতে দুলিতে আসন অবস্থাতেই চারিদিকে ঘোরা হইতেছে। বেশ আনন্দময় একটা ভাবের প্রকাশ। শক্তিতে যেন ভরপুর। সর্বাঙ্গ দিয়া নাম স্ফুরণ হইতেছে বোধ করিতে লাগিলাম। আর নামের তালে তালে আসন অবস্থায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। এমন সময় এ শরীরের একখানি হাত গিয়া ভোলানাথের গায়ে পড়িল। ভোলানাথ চোর মনে করিয়া চমকিয়া হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিলেন। পরে এ শরীরের হাত দেখিযা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে হাতখানি তখন খুব মোটা ও ভারী বোধ হইযাছিল। ক্রিয়ার গতিকে শরীরের পরিবর্তনের জন্য ভোলানাথ এইরূপ মনে কবিযাছিলেন।

অষ্টগ্রামে আর একদিন ভোলানাথকে বলি - তুমি শুইযা থাক, আমি নাম করিতে বসি। আস্তে আস্তে সাধাবণ আসনে বসিয়া নাম করিতেছি ক্রমে ক্রমে

[৭] দ্রষ্টব্য ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় - 'কীর্ত্তনের সপ্তভূমি'।

লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল। পা দুটি নিজে হইতে ওঠাইয়া পদ্মাসন হইয়া গেল। মুখে নাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেও নাম চলিতে লাগিল। শেষে দেখি শরীরটা মহা উৎসাহে ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে লাগিল এবং আসন অবস্থাতেই ঘুরিতে লাগিল। যেমন একটি চাকা কেহ ঘুরাইয়া দিলে আপনা আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ নাম আরম্ভ হইলেই শরীরে এইরূপ ক্রিয়াদি আপন ভাবে হইতে থাকিত। **সে সময় এইরূপ খেয়াল হইল যে সাধারণ শরীর একেবারে নাই কিন্তু এইরূপ শক্তি আছে যে আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারিব।** অবাধ প্রকাশ, যেন এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর। হঠাৎ খেয়াল হইল রাত বেশি হইয়াছে। আমার শোয়া হয় নাই। সুইচ বন্ধ করিবামাত্র বিজলী পাখার যেরূপ গতি হয়, সেইরূপ ভাবে আমার সব ক্রিয়া তখনি আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল। শুইয়া পড়িলাম।

আর একদিন আপন মনে ঐ ভাবে রাত্রিতে অনেকক্ষণ বসিয়া আছি। গৃহ অন্ধকার। দেখি কি ভোলানাথের ভ্রূমধ্যে (ত্রিপুটি) হইতে একটা জ্যোতি। ঐ লাইন বহুদূর অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আলো একটু সময়ের জন্য বাহির হইয়া তখনই মিলাইয়া গেল। উহাতে তাঁহার সমস্ত মুখ চোখ দেখা গিয়াছিল।

পূর্বে যখন আমি নরুন্দি ছিলাম, তখন তথায় একদিন রাত্রে মালগাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া গাড়িগুলি লাইন হইতে পড়িয়া যায়। তাহার পরদিন দেখি মাটি হইতে লাইনে গাড়ি কল দ্বারা এক একটি করিয়া উঠান হইতেছে প্রত্যেক বারই ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছে। অষ্টগ্রামে একদিন রাত্রে সাধারণ ভাবে মাটিতে বসিয়া 'হরিবোল হরিবোল' করিতে করিতে বোধ হইল শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আপনা আপনি একই তালে নাম হইতেছে। তখন দেখি জিহ্বায নাম বন্ধ হইয়া শরীর স্থির ভাবে সোজা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঐ রূপ কল তুলিবার সময যেইরূপ ঠক্ ঠক্ শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ কোমরের মাঝের দিকে মেরুদন্ড বরাবর মাঝখানে এক একটি শব্দ হয়। আর আমি যেন মাটিতে থাকা সত্বেও একটু একটু করিয়া উপরের দিকে উঠি। এই রকম কয়েকবার শব্দ হইলে শ্বাস উপরের দিকে যাইয়া কতক্ষণ বন্ধ হইয়া রহিল। মেরুদন্ড-টান হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসা অবস্থায়, পরে আস্তে আস্তে নীচের দিকে শ্বাস পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর একটি বিশেষ আসনে স্থির, যেন স্ক্রু আঁটিয়া স্থানে স্থানে সমস্ত অঙ্গ স্থির করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। জ্ঞান ত অটুট। খেয়াল হইলেও শরীর যেন নড়িতে পারে না। সেইরূপ নড়িবার পাকা খেয়ালও আসে না, অথচ

কোন অসুবিধার চিহ্ন মাত্র নাই, শরীর শান্ত স্থিব। পূরক রেচক কুম্ভক মিলিত হইয়া নাম আপনা আপনি বরাবর চলিয়াছিল। কিন্তু আমি সে সময় প্রাণ বায়ুর এইরূপ ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কাহারো মুখে শুনি নাই বা দেখি নাই। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম শরীরটা ছাড়া ছাড়া ও হালকা বোধ হইতেছে। একটি আনন্দের ভাব ২/৩ দিন পর্যন্ত বিশেষভাবে ছিল। বেশ থাকিয়াই যাইত। পরে যত দিন নাম করিব বলিয়া বসিতাম, প্রথম দিকে ঐ রকম অবস্থা হইযা যাইত। পরে নাম চলিত।

মাঝে মাঝে রাত্রে নাম করিতে বসিতাম। সবদিন কাজের ভীড়ে হইয়া উঠিত না। যেদিন নাম করিতাম ক্রিয়াদির সঙ্গে সঙ্গে শরীবটা নেশাখোরেব মত হইয়া যাইত। সে অবস্থায় সংসারের সকল কর্মাদি কবিতাম। যখন নাম ভিতরে চলিত, কতক্ষণে রাত্রি হইবে সময় পাইব, কতক্ষণে আবার নীরবে বসিতে পারিব, কেবল এই আকুলতা থাকিত। এইরূপে নামেব গতি নানা রকম ভাবের ভিতরেব দিক দিয়াও চলিতেছিল।

'সারদা' আমাকে এর মধ্যে একখানি সাধু জীবনী দিযাছিল। এ শরীরের একে ত ভাল করিয়া পড়া হয় না আবার যতটুকু পড়া হইত, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভাব কেমন হইয়া যাইত। ২/৪ দিন বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া পবে রাখিয়া দিয়াছিলাম। সে একদিন ঢাকা যাইবে বলিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম আপনার আজ যাওয়া হইবে না। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু স্টীমার না পাইয়া ফিবিয়া আসিল। সে বিদেশে গিয়া মাঝে মাঝে চিঠি দিত, আমিও সময়ে সময়ে ভোলানাথের আদেশে আমার অবস্থাদি তাহাকে লিখিতাম। অনেক বৎসর পব কলিকাতায় অল্প সময়ের জন্য তাহাব সহিত দেখা হইয়াছিল। পরে আমি ঢাকা সাহবাগে থাকিতে একবার আসিয়াছিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল - আপনার এইরূপ কেমন করিয়া হইল?

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূটে

আশ্বিন মাসে ভোলানাথের বাজিতপুর বদলীর কথা হয়। আমাদের অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূট আসা স্থির হয়। বিদ্যাকূট আসিবার সময় মধুবাবুরা আমাদের সঙ্গে ছিল। রাস্তায় সন্ধ্যার সময় একটি বিপদসঙ্কুল জায়গায় আমাদের নৌকা পৌঁছিল। তথায় নাকি খুব ডাকাতের ভয়। রাত্রিতে কেহ এই জায়গায় চলাফেরা করে না। আমরা সেখানে আসিতেই দেখিলাম দূরে একখানি বড় নৌকা, মানুষে ভরা তাহারা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল - তোমরা কোথায় যাইবে? স্থানের নাম করিলে পর আমাদের মাঝির নিকট হইতে তামাকের আগুন লইবে বলিয়া সে নৌকা তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের নৌকা ও দুই পরিবারের জিনিষপত্র, খুব জোরে চলিতেছিল। দুই পরিবারের লোকজন জিনিষপত্রাদি একই নৌকায়, সঙ্গে কসবা কালীবাড়ির জন্য একটি পাঁঠা ছিল, সেইটি খুব জোরে ডাকিতেছে। ইহার ডাকেও সকলের ভয় পাছে ডাকাতেরা টের পায়। সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু তখন এই অল্প অল্প অন্ধকারের মধ্যে সরু একটি নৌকার রাস্তা একদিকে দেখা গেল। বলিলাম - নৌকা ঐ রাস্তায় চালাইয়া নাও।[১] তাহাই করা হইল। ঐ বড় নৌকাওয়ালারা এই নৌকার উপর যেন লক্ষ্য রাখিতেছিল। সে রাস্তায় অনেক দূর যাইয়া একটি জেলেপাড়া পাওয়া গেল। সেই ঘাটে রাত কাটিল। পরদিন বিদ্যাকূট পৌঁছিলাম। অনেকে ঘটনাটি শুনিয়া বলিল - ঐখানে বর্ষায় বহু ডাকাতি হয়। সকলে খুব বাঁচিয়া আসিয়াছেন। মধুবাবুরা তাহাদের বাড়ি চলিয়া গেল।

[১] খাল - অগভীর হওয়ার কারণে বড নৌকার পক্ষে প্রবেশ সম্ভব নয়।

সেইদিন মহাষ্টমী ছিল।[২] মা ও বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্য ঘরে জ্যাঠাইমাকে (শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর[৩] বোন) দেখিতে গেলাম। অল্পদিন হয় জ্যাঠামহাশয় মারা গিয়াছেন। এই প্রথম জ্যাঠাইমাকে বিধবা দেখিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিতেই জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিল - বুড়া মানুষ মরিবে না? পরে দেখিলাম এত তীব্র আকর্ষণ এই শরীরটার উপর হইয়া গেল যে জ্যাঠাইমা তাহার সুখদুঃখের সকল কথা এই শরীরের কাছে বলিতেন। এই শরীরকে খুব আদরও করিতেন। ইনিই কৃষ্ণের শতনাম এই শরীরের নিকট হইতে আগ্রহ কবিযা মুখে মুখে শিখিযাছিলেন। তাঁহাব চিঠিপত্র লিখাইতে হইলে এই শরীরকেই ডাকিতেন। এ শরীরের লেখা ভুল হইত ও ভাল হইত না। তাঁহার চিঠি লিখিতে লিখিতে লেখাগুলি পরিষ্কার হইয়াছিল এবং তাড়াতাড়ি লিখিতে অভ্যাস হইয়াছিল কিন্তু অশুদ্ধ থাকিয়া যাইত। তাঁহার ঘরে যদি কাহারো সঙ্গে ঝগড়া হইত, আমাকে সব ভাঙ্গিয়া বলিত। অপর পক্ষ আসিয়াও এই শরীরকে সব জানাইত।

একদিন জ্যাঠাইমা জানিতে পারিলেন যে আমার কাছে কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে। ইহা শুনিয়া জ্যাঠাইমা অপর একজনকে বলিল - আমি অবাক হইলাম এই মেয়ে সকলের কথা শোনে অথচ কাহারও কথা কাহারও কাছে বলে না। কেমন করিয়া নির্বিকাব ভাবে সব শোনে, আশ্চর্যের বিষয়। উহার কাছে কথা বলা আর কুয়ায় ফেলা একই কথা। পরে কাশীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

তখন সাধারণ গ্রাম্য ভাবে ক্বচিৎ কখনও সৎকথা, ধর্ম-প্রসঙ্গাদি জাগতিক হিসাবে যতটুকু শোনা, আর খেয়ালে যতটুকু আসা তাহা মুখ দিয়া বাহির হইত এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা হইত। সব রকম বয়সের লোকদেরই এই শরীরের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহারটা ছিল। সে সময় কখনও কখনও কি এক বিহ্বল ভাব প্রকাশ হইত। যাহা বলিতাম সকলে মনোযোগের সহিত শুনিত আর বলিত - তোমার মুখে এইসব কথা শুনিতে যে কি আনন্দ পাই তাহা আর কি বলিব। ছোট মেয়েরাও কথা শুনিতে ভালবাসিত। এই শরীরের যখন যাহা খেয়ালে আসিত, তাহাই বলিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয় এই শরীবের কোন দিন হইত না। উপস্থিত যখন যেমন হইয়া যাইত।

[২] ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

[৩] বৃন্দাবনের কাঠিযাবাবার বিশিষ্ট শিষ্য।

বিদ্যাকূটে আমি নাম করিতে বসিতাম না। কেননা বসিলেই শরীর অন্য রকম হইয়া যাইত। কখন কখন বহুদূর হইতে কীর্তনের শব্দ কানে আসিলে বা নিকটে কোথাও কীর্তন হইলে শরীরের অবস্থা বুঝিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতাম। সুতরাং বাহিরের কাহারো নিকট বিশেষ প্রকাশ পাইত না। অষ্টগ্রামেই যাহা এই সব সম্বন্ধে প্রকাশ হইয়াছিল। নতুবা ভোলানাথ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। মা-বাবার কাছেও এই সব কথা বলিবার খেয়াল হয় নাই।

আর একদিন অন্য প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতে লাগিলেন - কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে হাঁটিয়া নাম করিতে থাকিলে দেখিতাম শরীর রোমাঞ্চিত হইত এবং বাম চোখের কিনারায় একটি আলো দেখা যাইত। যতক্ষণ নাম হইত শরীর ঢুলু ঢুলু ভাবে মহানন্দে ভরপুর থাকিত এবং ঐ আলোটি বড় নয়, অনেকটা নক্ষত্রের মত। যতক্ষণ নাম করিতাম ততক্ষণই উহা থাকিত, নাম বন্ধ করিলে উহা আর দেখা যাইত না। প্রশ্ন - ইহার কারণ কি? উত্তরে মা - নাম, মন্ত্র, জ্যোতি, তাঁহারই রূপ। আরে! ঐ জ্যোতি তাঁহারই রূপ।

শরীরের মা মাখনের[৪] কল্যাণে মাসে মাসে হরির লুট দিত। একদিন ছোট ছোট চার পাঁচটি ছেলে ঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরিনাম করিতেছে। এমন সময় দেখি শরীর অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। নাম থামিবার অনেক পরে স্বাভাবিক হইল।

গ্রামে কলেরা লাগায় বাড়ি বাড়ি সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতেছিল। সে কীর্তন পিত্রালয়ে আসিলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং নামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। সময় কম বলিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল, নতুবা এ শরীরের তখন অষ্টগ্রামের মত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আরও দুইদিন বাড়িতে কীর্তন হইল। সকলে শুনিতে কীর্তনের কাছে গেল, এই শরীরটা অন্ধকার ঘরের ভিতর গড়াইয়া পড়িল। আগেকার মত শরীরের ভাবাদিও অনেকটা হইয়াছিল। নিকটে কেহ ছিল না, তাই ভাল হইল কেহ জানিতে পারিল না। কেহ না জানিতে পারে এই খেযালটা সর্বদা আপনিই থাকিত। কোন কোন সময় বাহিরে দেখিতে শরীর অস্বাভাবিক বা তন্দ্রাভাবে জড়িত এইরূপ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ তখন সকলে অসুস্থ বলিয়া মনে করিত।

[৪] যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, মা'র কনিষ্ঠতম ভ্রাতা (১৯১২-১৯৮৩), জন্ম ঃ বিদ্যাকূটে, মৃত্যু ঃ বারাণসীতে।

একদিন অনেক রাত্রে বহুদূরে খোল করতালের ধ্বনি ও নাম শুনিলাম। শরীরের পূর্ববৎ অবস্থাদি হইল। ঘর অন্ধকার ছিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হইল। মা ইতিমধ্যে একবার বাহিরে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু শরীরের ভাবের জন্য উত্তর দিতে পারি নাই। দেখা যাইত, শরীরের এ অবস্থাদি কেহ না জানুক এইরূপ ভাব আসিলেই এ শরীর সকলের কাছ হইতে আলগা হইয়া সরিয়া যাইত এবং যেইরূপেই হউক ইহার সুযোগ হইয়া পড়িত।

এ শরীর ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলাও করিত। এইজন্য অনেক সময় সমবয়সীরা বা বয়স্করা বলিত - তোর যেন বয়স হয় নাই, এত ছোটদের সঙ্গে তোর কেমন করিয়া খেলার প্রবৃত্তি আসে?

পাড়ার বা গ্রামের সকলেই এই শরীরকে ভালবাসিত। বৌ, ঝি ও প্রাচীনরা অনেকক্ষণ না দেখিলে অভাব বোধ করিত। একবার পাইলে ছাড়িতে চাহিত না। বৌ-এরা বাপের বাড়ি যাইবার সময় বলিত - আপনাকে সেখানে ত পাইব না, তাই যাইবার আনন্দ ভোগ করিতে পারিতেছি না। যখন বিদ্যাকূট হইতে চলিয়া আসিতাম, তখন পাড়ার কেহ কেহ দৌড়িয়া আসিত ও বলিত - বাঁচিয়া থাকিলে আবার তোমাকে দেখিব। মুসলমান প্রতিবেশীরাও কান্নাকাটি করিত।

দেখিতাম দেশ বিদেশে রাস্তা ঘাটে যেখানে যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত হিন্দু বা অন্য জাতি হউক সকলেই এ শরীরটাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিত, আবার কবে দেখা হইবে জানিতে চাহিত। তাহারা এ শবীরকে ভুলিতে পারিত না, এ শরীরও তাহাদিগকে ভুলিবে না বলিত। কেহ এ শরীরকে পর ভাবিলে কান্নার প্রকাশ দেখা যাইত। এইরূপ অনেক ঘটনা হইয়াছে যাহাতে ঘরের কি বাহিবের লোক হউক এই শরীরকে আপন বলিয়া মনে না কবিলে, এ শরীর তাহাদেরই একজন ইহা জানাইবার জন্য ভাবে ও ব্যবহারে কেমন যেন একটা ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

একদিন দাদু সম্পর্কীয় বাবার এক জ্ঞাতি এ শরীরকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। নিমন্ত্রণ অসময়ে হইয়াছিল। আমি সে বাড়ি গেলে দাদা আমাকে বলিলেন - নাতিন, আমার ত্রুটি হইয়াছে বড় অসময়ে ডাকিয়াছি। আমি বলিলাম - আপনি একেবারে পর ভাবেন কিনা, সেজন্য এ কথা বলিতেছেন। আমি ত

জানি আপনি আমাকে আপনার মেয়ের মত খাইতে বসিয়া ডাকিলেও আমি আসিব ও খাইব। তিনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত কিছু দেখিতে পাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন - যেমন দেবী মূর্তিটি, তেমন ভাব ও কথা। কোন কোন সময় আপনা হইতে অস্বাভাবিক ভাবাদি আসিয়া পড়িত। সেদিনও কথা বলিতে বলিতে ক্ষণিকের জন্য তাহাই হইয়াছিল।

পাশের বাড়িতে এক বয়স্ক কাকা (স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য) ছিলেন। তিনি ছুটির দিনে বাড়ি আসিলে আমাকে নিকটে না পাইলে তাঁহার ভাল লাগিত না বলিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার সংসারের যাবতীয় বিষয় এ শরীরকে বলিতেন। সন্তানের বয়স্কার সঙ্গে এইসব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ও মা আনন্দে অবাক হইতেন।

পাড়ায় এক বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয় ছিলেন, নাম বিহারী ভট্টাচার্য। তিনি গীতা ও ধর্মগ্রন্থাদির চর্চা নিয়া বাড়িতে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। তাঁহার সাত আটটি ছেলেমেয়ে ছিল। এ শরীর যখন বিদ্যাকূটে থাকিত তাঁহার কোন কাজে ছেলেমেয়েকে না ডাকিয়া এ শরীরকে ডাকিতেন, আর এ শরীর যাহা করিয়া দিত তাহাতেই আনন্দ পাইতেন। তাহাদের বাড়ির লোকগুলিও এ শরীরকে ভালবাসিত ও বলিত - তুই চলিয়া গেলে আমাদের তো দুঃখ হয়ই তোর জ্যাঠার আরো বেশি হয়। নিজের মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে গেলে ত কিছুই দেখি না।

আর এক বাড়িতে বয়স্কা দিদি ছিল। এ শরীরকে খুব স্নেহ করিত। তাঁহার ছেলে বিদেশে থাকিত। আমি সে বাড়িতে প্রায় সময়ই একা চুপ করিয়া বসিযা শুইয়া থাকিতাম। ক্বচিৎ কোনদিন নাম করিবার ভাব আসিলে ওখানেই বসিতাম। মাঝে মাঝে তাহার চিঠিপত্রও লিখিযা দিতাম। ভোলানাথের পত্রের জবাব দিতে হইলে সেখানে বসিয়া এক এক লাইন বা কোন সময় বেশি লিখিয়া ২/৩ দিনে একখানি চিঠি শেষ হইত। ভোলানাথ কত কি লিখিতেন খুঁজিয়া যেন এ সবের কোন উত্তর আসিত না।

একটি বউ, সে বয়সে আমার অল্প বড় হইবে, আরেক বাড়িতে ছিল। এ শরীরের সঙ্গে তাহার খুব ভাব ছিল। এক সঙ্গে গান গাওয়া, এক সঙ্গে খেলা এইরূপে প্রায় সারাদিন কাটিত। ব্যবহারিক জগতের কোন কথাই তাহার ও আমার ভিতর প্রায় অজানা ছিল না। যাহার সঙ্গে মিশিতাম তাহার নিকট ভাবে

বা ব্যবহারে সামান্য এক অক্ষরও আড়াল থাকিলে গোপন হয়, এইরূপ ভাব থাকিত। একদিন কোন এক ঘটনায় দেখিলাম সে আমাকে প্রায় খুলিয়া সব বিষয় বলিতে চাহে না। একসঙ্গে সরলতা ও কুটিলতার খেলা কেমন চলিতে পারে সেদিন বেশ বাহিরে এ প্রকাশটা তাহার দেখা গেল। সে যাহা করুক তাহার প্রতি এ শরীরের ভাব এক রকমই রহিল। শিশু বযস হইতেই সত্যনিষ্ঠার উপর খেয়াল ছিল। সত্য কথা বলা, সত্য ব্যবহার করা, সত্য প্রতিপালন করা মায়ের আদেশও ছিল। চাল চলন সর্বদাই সোজাসুজি ছিল। কোথাও হয়ত কেহ চুপি কিছু বলিতেছে বা করিতেছে সে সম্বন্ধে পূর্বে কাহারো মুখে কিছু না জানিয়া শুনিয়া এ শরীর হঠাৎ তথায় গিয়া পড়িযাছে। তাহারা ভাবিল চালাকির সহিত গিযাছে। কাহারও ইহাতে দোষ নাই। কারণ কেহ ধারণা করিতে পাবিত না যে এ শরীরের আপনা হইতেই স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ হইয়া যায়।

ছোটবেলায় মা বলিয়াছিলেন পুরুষের চোখ মুখেব দিকে চাহিয়া কথা বলিতে নাই। ভোলানাথও এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। কোন পুরুষ এমনকি বাপ ভাই-এর মুখের দিকেও তাকাইতাম না। বেশি কথা বলা বা অপ্রয়োজনীয বাক্যলাপ করাও অভ্যাস ছিল না। ঠাট্টা তামাসা এ শরীরেব খেয়ালে আসিত না। কিন্তু আবার কোন কোন সময়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাবে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত হইয়া যাইত।

একদিন বড় জ্যেঠতুত ভাই, নাম উপেনচন্দ্র ভট্টাচার্য হাতে কি কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতও পরিষ্কার নয়। তিনি খুব পান খাইতেন। আমার নিকট হইতে পান চাহিযা তাঁহার মুখে দিতে বলিলেন। আমাব খেয়াল হইল পুরুষের মুখেব দিকে ত চাহি না, কেমন করিয়া দিব? তৎক্ষণাৎ খেয়াল হইল কেবল পানটা দিবাব জন্যই পানটিতে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাব মুখে দিব এবং তাহাই করিলাম। ভোলানাথকেও তাহা জানাইলাম।

সত্য ঘটনার প্রকাশ

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে ঐ জ্যাঠাইমার ঘব হইতে নাকি কিছু অলংকার চুরি যায়। সে বাড়িতে তাহাদের একটি জ্ঞাতি ছেলে সর্বদা আসা যাওয়া করিত। ছেলেটিকে তাহারা ভালবাসিত। চুরি হইবার পর সকলে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিল এবং বাড়ি হইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। এ শরীর যখন

বিদ্যাকূটে, সে সময় বাস্তবিক যাহারা চুরি করিয়াছিল তাহাদের একটি মেয়ে আসিয়া এ শরীরকে আপনা আপনিই কথায় কথায় বলিতে লাগিল যে তাহার দিদির এই এই গয়না বাপের বাড়িতে আছে। জ্যাঠাইমার জিনিষ চুরি হইয়াছিল, সেও তখন আমার নিকটেই বসা ছিল। মেয়েটি আমাকে বলিতেই ঐ সম্বন্ধে আভাস পাইযা দেখিতেছিলাম জ্যাঠাইমা ঐ জিনিষ সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ নিতেছিলেন। আমি পূর্বে ঐ ঘটনা কাহারও মুখে শুনি নাই।

জ্যাঠাইমা আমাকে দুঃখের সহিত পরে জানাইল যে আজ ১৫ বৎসর পর তোর সম্মুখে সত্য খবর বাহির হইল। এখন জানিতে পারিলাম জিনিষগুলি কে চুরি করিয়াছিল। ছেলেটি কত কান্নাকাটি করিয়া বলিয়াছিল যে সে কিছুই জানে না। এই দুঃখে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ তোর কাছে সত্য আলোচনা হইতেছিল কিনা, কাজেই ভগবান সত্য প্রকাশ করিয়া এতদিনের পর একজনের উপর আমাদের মিথ্যা সন্দেহ দূর করিযা দিলেন।

বিবাহ উপলক্ষ্যে

বাবার এক জ্ঞাতির বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক লোকজন আসে। তাহার ভিতর এ শরীরের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হয় এমন দুইজন যুবকও ছিল। এ শরীর সেখানে গেলে উহাদের একজন নানা বিদ্রুপ করিল, আর একজন নতুন বৌযের মুখ চিনি দিয়া দেখিতেছিল, সে সময় এ শরীরের মুখেও চিনি দিতে আসে। এ শরীর চুপ করিয়া সরিয়া যায়, কিন্তু দুইজনার উপর হঠাৎ কেমন একটা তীব্র দৃষ্টি বিদ্যুতের মত প্রকাশ হইয়া পড়িল। তোমাদের এ ইচ্ছার যে দৃষ্টি, এমন নয়, তাহাদের ক্রিয়ায় দৃষ্টিটা ঐরূপ হইয়া গিয়াছিল। বিবাহের পরে তাহারা নিজ বাড়ি চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে চিনি খাওয়াইতে চাহিয়াছিল সে মারা গিয়াছে, আর একজনকে কি এক সামান্য কারণে অন্য লোক ধরিয়া মারপিট করিয়াছে।

আমার উপর কাহার কিরূপ ভাব আমি বুঝিলেও মুখে বা ব্যবহারে তাহা প্রকাশ হইত না। নিজেই হাসিতাম। দেখিতাম যদি কেহ এ শবীবের সঙ্গে বিরুদ্ধ আচরণ করিত, সে পরে নিজে আপনা আপনিই ব্যতিব্যস্ত হইযা পডিত।

অন্য বাড়ির একভাই-এর বিবাহে বৌ-এর সঙ্গে তাহার দুই ভাই আসিয়াছিল। ভোলানাথ সেখানে ছিলেন। দেশের প্রথানুযাযী ঠাট্টার পাত্র বলিযা ভোলানাথকে

ও আমাকে তাহারা ঠাট্টা করে দেখিয়া ভোলানাথ বলিলেন - উহাদিগকে খুব জব্দ কর। সেইদিন কেমন অস্বাভাবিক ভাবের সহিত নানা রকমে তাহাদিগকে নাকাল করিয়াছিলাম। শত চেষ্টায় তাহারা এ শবীবেব সঙ্গে আঁটিযা উঠিতে পারিল না। কেবল বলিতে লাগিল - উনি ভয়ানক চালাক। এমন আব দেখি নাই। পরে একদিন নূতন বৌটি বলিল - আমাব বাপের বাডিব সকলে বলে আপনি নাকি বড় চতুরা।

উপরোক্ত ভাইএর বিবাহে সে বাড়ির বড় বৌ রান্না করিবে এবং এ শরীরকে সাহায্য করিতে হইবে, সে নিজে আসিয়া বলিযা গেল। সে ভাল রান্না করিতে পারে বলিয়া সুনাম আছে। যথা সময়ে সেখানে যাওয়া হইল, কোন কাজে হাত না দিতেই সে এ শরীরকে বলে - আপনি যান, আমিই পাবিব। এ শরীরের মা তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন - যখন যাইতে বলিতেছে তুই যা, যাহা দরকার হয় আমিই করিব। তাহাকে বলা হইল - বেলা হইয়াছে আমরা দুইজনে রান্না শেষ করিয়া দিই। কিন্তু সে কিছুতেই দিল না। সে রান্না করে আর এ শরীরের এক খুড়িমাকে চাখায় কেমন হইয়াছে। এ শরীর চলিয়া আসিল।

পরে খাইতে বসিয়া দেখিলাম কোন তরকারী ভাল হয় নাই। আমি বলাতে তাহার বিশ্বাস হইল না আর একজনকে জিজ্ঞাসা কবিল সেও বলিল - নূন কম, পান্‌সা লাগে। আপনি এত ভাল রান্না কবেন আজ কেন কেমন হইল? সেইদিন রান্না খারাপ হইয়াছিল বলিয়া সে মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিল। দুঃখে অপমানে তাহার ফিট হইয়াছিল, পরে কেহ কেহ বলিল, তোকে ডাকিয়া আনিয়া সরাইযা দিল, নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এখন পাক কেমন হইল?

বিগ্রহ-স্পর্শ লীলা

এই শরীরের যাহা খেয়ালে উঠিত তাহা যে কোন উপাযে সম্পাদিত হইত। একবার সীতারামের মূর্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এবং আরও অন্যান্য দেবালয়ের স্থাপিত মূর্তি ছুঁইবার খেয়াল হইয়াছিল। সকলেব অজ্ঞাতসারে বাধা বিঘ্নেব মধ্যে সহজভাবে মুহূর্তের মধ্যে স্পর্শটি হইয়া গিয়াছিল। আবেকবার দুর্গামোহন ভট্টাচার্য নামক বাবার এক জ্ঞাতির বাড়িতে দুর্গাপূজার সময নিমন্ত্রণ কবিযাছে। দুর্গামন্দিবে যাইয়া দেবীকে স্পর্শ কবিবার জন্য কি এক ঝোঁক চাপিল। সেখানে নানা বকমের লোক, পাহারা ইত্যাদি, কেমন করিয়া যাওয়া যায়। কোনদিন সে মন্ডপে যাওয়াও

হয় নাই। যাহা হউক, কি এক অস্বাভাবিক ভাবে সে বাড়ি গিয়া ঠিকমত মন্ডপে পৌঁছিলাম এবং সকলের অজান্তে দেবীমূর্তি ছুঁইয়া চলিয়া আসিলাম।

রোগ আরোগ্য করা

কেহ অসুস্থ হইলে কোন কোন সময় খেয়ালে আসিত এ শরীর ছুঁইলে ও দেখিলে রোগী ভাল হইবে। কার্যতঃ সুফল হইত। সুফল যখন না হইবার হইত, তখন আবার ছুঁইবার ভাবও আসিত না। অথবা সে কাজে কোন না কোন প্রতিবন্ধক রূপটি প্রকাশিত হইত।

ধর্ম-নিষ্ঠদের সহিত যোগসূত্র

পুরুষ, স্ত্রী, ছোট বড় যে কেহ হউক না কেন কাহারও যদি ধর্ম ভাব দেখিতাম, নিয়মিত সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, ভগবানে মন জানিতাম - তাহাদের উপবও কোন কোন সময় স্বতঃই একটা বিশেষ ভাবের প্রকাশ ফুটিয়া উঠিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, বিদ্যাকূটে কয়েকজন ধর্ম-নিষ্ঠ লোক ছিলেন। বিজলীর স্পর্শ যেমন, তাহাদের কাহাকেও দেখিলে শরীর সেইরূপ হইত। দেখিতে পাইতাম যে উহারা আন্তরিক ভাবে বিশেষ উন্নত হইতেছেন। সে সময় এই শরীরের দিকেও তাহাদের লক্ষ্য থাকিত। সে অবস্থায় আমি সরিয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম ভাবটা স্পষ্ট থাকিত। বিশেষ কথা এই যে এই সব ধর্ম-নিষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই এ শরীরের উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্বেও কাছে আসা, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে ত করিতে পারিত না। অপরের বাড়ির বিবাহিতা যুবতী মেয়ে, পুরুষদের জাগতিক দৃষ্টিতে ত অনীতি। কিন্তু এ শরীরের প্রতি এই যে বিশুদ্ধ আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা উদ্দীপক ভাব ইহাও তাহারা সম্যক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিত না। এ শরীর কিন্তু তাহাদের ভিতরের বিশুদ্ধ ভাবগুলির খেলা দেখিয়া যাইত। তাহাদের অজ্ঞাত ভাবেও ইহা ধর্ম পথের বিশেষ অনুকূলই হইত।

কসবাকালী দর্শন

বিদ্যাকূট আসিবার পর কসবা কালীবাড়ি গিয়াছিলাম। খেওড়া রাস্তায় পড়ে বাবার মামাবাড়ি। শ্রীশদাদার বাড়িতে এই শরীরের ঠাকুরমার সই চিক্কনদিদি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল - এতদিন পর দেখিয়াছি, তাই

আনন্দে আমার কান্না আসিতেছে। সে প্রায় সমস্ত রাত কাঁদিল ও মনের কত কথা বলিল। কিন্তু এ শরীর হাসিতেছে। পরদিন কসবা গেলাম, দেখি দূর সম্পর্কীয় এক কাকাও ছিল, খুব ধার্মিক। কালীবাড়ি যাইয়া সকলের সাথে প্রণাম করিতে কি রকম হইয়া গিয়াছিলাম। মা ও কাকা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ছেলেপিলের জন্য বুঝি কালীর কাছে প্রার্থনা করিতে যাইয়া এইরূপ ভাবের পরিবর্তন হইযাছিল। এই শরীরের যে এইসব দিকই নাই তাহারা তাহা জানে না।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী কসবা কালী

ডাকপিওন হরিশ

৫/৬ বৎসর বয়সে মামাবাড়ি ছিলাম। সে বাড়িতে স্থানীয় ডাকপিওনটা থাকিত। তাহার নাম ছিল হরিশ। জাতিতে সে শূদ্র। তাহার ভিতর খুব ভাল লক্ষণ দেখা যাইত। দেখিলেই বড আপন লোক বলিযা ব্যবহার করিত। তাহার স্বভাবও বড় সুন্দর ও সরল ছিল। মাটির দিকে তাকাইয়া কথাবার্তা বলিত। সকলের মুখেই তাহার প্রশংসা ছিল। এ শরীর অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূট আসিয়া দেখে সে তখন সেখানকার ডাকপিওন। অনেকদিন পর দেখিয়া তাহার খুব আনন্দ হইল।

রাত্রিতে কোন জিনিষের উপব টর্চ লাইট পডিলে তাহা যেমন উজ্জ্বল পরিষ্কার দেখা যায়, সেইরূপ তাহার উপব এই শরীরের যখন এক রকম দৃষ্টি পড়িত, দেখিতাম সে বদলাইয়া উন্নত হইতেছে। তাহার ভিতর অসাধারণত্ব রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইত। এ শরীর যখন ছোট্ট, এই হরিশ এ শরীরের মামাবাড়ির গ্রামে ডাকপিওন ছিল। এ শরীরকে সে কখনও কোলে কাঁধে করিত। পরে যখন বীরভুম যাই (১৯৩২ ইং), কথায় কথায় শুনিলাম তাহার সাধনার এত ফল হইয়াছিল যে সে সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছে। অনেক লোক তাহার কৃপা পাইয়াছিল। এখন তাহার স্ত্রী ঐ সমাধিস্থানে বসিয়া সাধন ভজন করিতেছে।

বিদ্যাকূট হইতে আটপাড়ায়

প্রায় ৩ বৎসর পর ভোলানাথ বিদ্যাকূট আসিলেন। ঠিক হইল যেদিন তিনি বাজিতপুরে যাইবেন সেইদিন বাবা আমাকে নিযা আটপাড়া যাইবেন। ক্রমে আটপাড়া যাওয়ার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। বাডি ও পাড়াব সকলেই দুঃখিত।

যাওয়ার দিনের পূর্ব হইতে এ শরীরও সকলের মধ্যে গম্ভীর হইয়া গেল। দীর্ঘ-দিন বিদ্যাকূট থাকায় - ছাড়াছাড়ি সকলের বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিল। ধর্মভাবের ভাবটা সৎসঙ্গের মত আপনা আপনিই যেন ঐ সময় সকলের মধ্যে চলিতেছিল। সৎসঙ্গ কাহাকে বলে কেহ কিন্তু জানিত না, বুঝিতও না।

পাড়ার মুসলমান মেয়েরা অবধি সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর আসিত ও কান্নাকাটি করিত।

এ শরীরের যখন যাহা হয় তাহা সীমা অতিক্রম করে। সমস্ত শরীর অবশ, যেন আর চলে না। বাড়ি হইতে কোন মতে নৌকায় যাইয়া স্টীমারে উঠিয়া বসিয়া আছি। দেখি কি - আমি বিদ্যাকূটের বাড়িতে আছি। মা ও পাড়া-পড়শীর উদাস ভাবের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছি। তারপর নেশাখোরের মত শুইয়া পড়িলাম। যখন যে ভাবটি খেলিত তাহা এমন করিয়া আঁকড়াইয়া প্রকাশ হইত যে সর্ব শরীর যেন সেই ভাবে। পরে শোনা গেল পাড়া প্রতিবেশীদেরও নাকি এ জাতীয় ঘটনায় - এমন ছট্‌ফটানি পূর্বে আর হয় নাই।

রাত্রে স্টীমার স্টেশনে নামিয়া এক পরিচিত বাড়িতে রহিলাম। পরের দিন একটি কুলি ও একটি ডুলি করা হইল। কুলির সঙ্গে সঙ্গে বাবা রহিলেন। কুলি হাঁটিতে পারে না, বিশ্রাম করিয়া করিয়া আসিতেছে। ডুলিওয়ালা আগে আগে আসিয়া আমাকে নিয়া এক বাগানের ভিতরের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। আমি দাঁড়াইতে বলিলাম - শোনে না। পরে তাহারা রাস্তা ঠিক করিতে পারে না, ডুলি নামাইয়া বসিয়া পড়িল। সরু সরু তিন পথ। উহার ভিতর আমি একটা দেখাইয়া বলিলাম - এই রাস্তায় যাও, কাহাকেও পাইলে এইখানে নিয়া আসিও। একজন গিয়া একটি লোক নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করে এই ডুলি কোথায় যাইবে? আওয়াজে বুঝিলাম ভদ্রলোক। অথচ আমি বউ, গ্রামের লোকের সঙ্গে কি করিয়া কথা বলি। আমি কি করিলাম, ডুলির ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া রাস্তায় মাটিতে ভোলানাথের বড় ভাইয়ের নাম লিখিয়া দিলাম। সে আমাকে নিয়া সেই বাড়ি গেল। পিতা অনেক পরে কুলিকে নিয়া আসিলেন।

এ শরীর তখনকার মত সে বাড়িতে ছোট বলিয়া সংসারের সব কাজ একাই করিত। আশুর মা[৫] যদি কোন কাজ করিত তবে খেয়াল হইত উহা আমারই করা কর্তব্য ছিল। কাজের দিকে এইরূপ খেয়াল থাকায় শরীরের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য পড়িত না। বাড়িতে আশুর মা, আশুর দাদা, আশু ও তাহার এক বোন ও আমি ছিলাম।

গ্রামের বউয়েরা ঘোমটা ইত্যাদি যে নিয়ম বাখে, এ শরীব সে ভাবে আরো খেয়াল করিয়া চলাফেরা করিত। কোন কোন সময় এক কাজ করিতে গিয়া অন্য কাজে একটু দেরী হইলে, কেহ কিছু বলিলেও এ শরীর আনন্দে গ্রহণ করিত। তখন বর্ষাকাল। সময় সময় বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাজ কবিতাম। এ কারণে ঠান্ডায় টন্‌সিল ফুলিয়া জ্বর হইল। অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে দুধ বার্লি খাওযাও কষ্টকর। ঔষধের ব্যবস্থা হইল। সকলে খুব যত্ন করিল। ভোলানাথও বাজিতপুর হইতে আসিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে অসুখ সাবিয়া উঠিতে লাগিল।

ইহাব ভিতর একদিন পাশেব বাড়িতে কীর্তন হয। তখন এ শবীরে অবশ হইবার মত অবস্থাদি হয়। এ শরীর তখনো বিছানায়। সকলে ভাবিল অসুস্থতার বোধ হয় নূতন উপসর্গ। পরে বাড়িতে একদিন ছেলেবা হরিলুট দিল। সেইদিনও ঐ রকম অবস্থা হইল। বাড়িতে ইতিমধ্যে একদিন চুরি হইয়া যায়, এ কারণে সকলের বাজিতপুর যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া ভোলানাথ চলিয়া গেলেন।

প্রতিবেশীগণের সেবা

নিকটস্থ শূদ্র বাড়ির দুই তিনটি মেয়ে এ শরীরের জন্য খুব করিত। অসুখ হইতে অল্পদিন উঠিযাছি। ভোরে উঠিযা কাজ করিলে ঠান্ডা লাগিবে, এই ভাবিয়া খুব সকালে আসিযা আমার কাজগুলি - বাসনমাজা ইত্যাদি ইহাবা গোপনে করিযা যাইত। কোন কোন সময় ভাল আম পাইলে আমাব জন্য রাখিয়া দিত। সময় মত আপন হাতে ক্ষীর বানাইয়া, মুড়ি চিনি সব জোগাড় করিয়া আমাকে চুপি চুপি ডাকিয়া নিযা খাওযাব জন্য হাতে পায়ে ধরিত। অগত্যা না পারিয়া সামান্য কিছু খাইযা অবশিষ্ট এক সঙ্গে মিলাইযা তাহাদেব হাতে দিতাম।

কোন সময় আমার মাথা ও চুল পবিষ্কার কবিয়া দিত, কাপড় কাচিয়া দিত। বলিত - না আছে তোমার শরীরের খেয়াল, না আছে খাওয়ার দিকে খেয়াল।

[৫] প্রমদা দেবী ঃ ভোলানাথেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

কেবল ২৪ ঘন্টাই কাজ। আমি যদি কোন সময় বলিতাম - আমি ত তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারি না, তোমরা আসিয়া এই শরীরের জন্য এত কর, তাহারা বলিত - তুমি যে আমাদের সঙ্গে হাসিয়া কথা কও, ইহাতেই আমাদের আনন্দ। তাহারা খুব গরীব ছিল। যেইদিন শুনিতাম তাহাদের খাওয়া হয় নাই, সেইদিন রক্ষিত মুষ্টি-চাউল হইতে, তাহাদিগকে কিছু দিতাম। আর আমি খাইতে বসিলে তাহারা যদি আসিত, কিছু খাইয়া থালাটি দিয়া দিতাম।

বাজিতপুরে মা

আষাঢ় মাসে[৬] আমরা বাজিতপুরে চলিয়া গেলাম। বাজিতপুরে আশুর মা কাছারির সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট-এর স্ত্রীকে দিদি ডাকিত। আমিও তাহাই একদিন বলিতে সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট-এর মেয়ে ঊষা[৭] বলিল - না, তাহা হইবে না, আপনি মাকে অন্য কিছু ডাকুন। আমরা আপনাকে দিদি বলিয়া ডাকিব। আমি সেইদিন হইতে তাহার মাকে মাসিমা বলিতাম। ঊষাকে দিদি ডাকিতাম। ঊষাদিদির মা ও তাহাদের বাসার সকলে এ শরীরকে খুব ভালবাসিত ও নাম ধরিয়া ডাকিত। ঊষাদিদির মা একদিন বলিল - প্রথম যখন তোমাকে ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতে দেখি, তখন আমার মনে হইয়াছিল - বোধ হয় কোন বড় লোকের বৌ বা মেয়ে হইবে। ঊষাদিদির বাবা ঢাকা বদলী হইযাছিল। ঊষাদিদি বাজিতপুর হইতেই তাহার শ্বশুরবাড়ি গেল। যাইবার সময় বলিযা গেল - দেখিব দিদি তোমার কেমন টান, শীঘ্র যেন দেখা হয়।

আশ্বিন মাসে যে তুমুল ঝড় বৃষ্টি (সাইক্লোন) হইয়াছিল, সে রাত্রে ইহার ভিতর এ শরীর ঘরে বসিয়া আপনভাবে নাম করিতেছিল। ভোলানাথ ঘরে আসিয়া ডাকিল। নাম করিতেছিলাম, তাহা হইতে উঠাইল দেখিলাম ঘরখানি নড়িতেছে। বলিলাম তবে চল অন্য ঘরে যাই, এ বলিয়া আমরা বাহির হইতে তখনই ঘরখানি পড়িয়া গেল। ঝড় বেশি হইতে লাগিল দেখিয়া আমরা নিজেদের বাসা ছাড়িয়া অন্য এক বাসায় চলিয়া গেলাম। পরে দেখিলাম পাড়ার অনেক ঘরই ভূমিসাৎ হইয়াছে। কয়েকদিন পর আশুর মা তাহাদের দেশের বাড়ি আটপাড়ায় চলিয়া গেল। আশু আমাদের নিকট রহিল।

[৬] জুন-জুলাই, ১৯১৮।

[৭] নবাবের এস্টেটের রাশবিহারী দত্তের কন্যা - স্বামী জানকীনাথ গুহ।

তুলসীমালা পরিবার উপদেশ

একদিন বাসায় কয়েকজন মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। পূর্বের মত অবস্থাদি হইয়া এ শরীর মাটিতে পড়িয়া গেল। ভোলানাথ আসিয়া দেখিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুক্ষণ পরে এ শরীর প্রকৃতিস্থ হইল। প্রায় তিন বছর পর এ সব ভাবাদি আবার দেখিয়া ভোলানাথ চিন্তিত হইলেন। বৈষ্ণব ও ভক্ত এক মুনসেফ[৮] বাজিতপুরে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে অহোরাত্র কীর্তন করাইতেন এবং নিজেও নাম করিতেন। ভোলানাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন - এই সব ত খুব ভাল। তবে তাঁহাকে গলায় তুলসী মালা পরিতে বলুন। এই কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম - মালা বাহিরে, না ভিতরে? মুন্সেফ এই কথা শুনিয়া বলিলেন - তাঁহার মালার দরকার নাই।

ভুদেববাবুর বাসায় কীর্তনে মা

পরে একদিন নূতন সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট ভুদেববাবুর বাসায় কীর্তন হয়। এ শরীর যাইবে না বলিয়া ঘরে বসিয়াছিল, নায়েবের স্ত্রী আসিযা ডাকিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া লইযা যায়। ভোলানাথের আদেশ ছিল, কেহ বিশেষ করিয়া ডাকিলে যাওয়া। বাহিরের এক খন্ডে কীর্তন হইতেছে, সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট-এর স্ত্রীর সহিত কি কথা বলিতেছি, এমন সময় দেখি কি সর্ব শরীর অবশ হইযা উঠিয়াছে, আর তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না। দেখিতেছি সে যেন বহুদূর হইতে কথা বলিতেছে। এ অবস্থায় কোন রকমে যাইয়া বারান্দায় এক চৌকির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছু পরে নেশাখোরের মত অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠিলাম এবং নায়েবের খুড়ি আমাকে বাসায় দিয়া আসিল।

বাজিতপুরে কালীপূজা

আমাদের সঙ্গে জ্ঞান চক্রবর্ত্তী নামক এক কর্মচারী ও তাহার স্ত্রী অমিয় থাকিত। অমিয় ছেলেমানুষ। আমরা আপন বোনের মত মিলিয়া মিশিয়া ছিলাম। কিছুদিন পরে অমিয় তাহার অন্য বাসায় চলিয়া গেল।

একদিন রাত্রে নাম নিয়া বসিয়াছি, দেখি আপনা হইতে পদ্মাসন হইল। অষ্টগ্রামের মত ভাবাদি একটু প্রকাশ পাইয়া আবার থামিযা গেল। ইহার মধ্যে

[৮] নাম - বেরতীবাবু। তাঁহার একটা পা কাটা ছিল, কাঠের সাহায্যে চলিতেন. বাড়ি নবদ্বীপে।

ভোলানাথ তাঁহাদের বার্ষিক কালীপূজা নিজে বাজিতপুরে করিবেন স্থির করিলেন। জিনিষ পত্র কেনা আরম্ভ হইল। চাউল আসিলে আমি তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া একটি নূতন হাঁড়িতে রাখিয়াছি, কোথা হইতে একটি কাক আসিযা এই চাউলে ঠোক্কর মারিল। সে চাউল ঘরে রাখিয়া, আবাব নূতন চাউল আনিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইল। বাধা পড়াতে ভোগ রান্না করিতে পারিব না বলিয়া, পূজার দিন অমিয় ভোগ রান্না করিবে স্থির হইল। আমাদের বাসা হইতে এক বাসা পর বাহিরে এক খন্ডে পূজার স্থান ঠিক হইল। অন্য পুরোহিত না পাওয়ায় স্থানীয় একজন উকিলকে পূজক ঠিক করা হইল। পূজক ভাল তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি বলি ও কারণ ছাড়া পূজা করেন না। অথচ ভোলানাথদের কালীপূজা বংশানুক্রমে সাত্ত্বিক মতে হয়। বিশেষ অনুরোধে তিনি অবশেষে এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবেই পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যার সময় বাবা ও মাখন আসিলেন, রাত্রে পূজা আরম্ভ হইল।

অমিয় ভোগের রান্না করিতেছে, অন্যান্য জিনিষাদি সব তৈয়ার হইয়াছে, কেবল অন্ন বাকি। তখন পূজা প্রায শেষ করিয়া পূজক ভোলানাথকে বলিলেন - শীঘ্র ভোগ নিযা আসুন। যজ্ঞেও ভোগেব দবকার হইবে। অন্ন বাকি আছে বলিয়া পূজককে বলাতে, তিনি বলিলেন - বেশি রাত্রি হইয়াছে, তবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিই।

এইদিকে অন্ন নামাইয়া দুইখানি পাথরে অন্ন ও অল্প অল্প প্রত্যেক পদের ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া অমিয় সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আমি ভোগ রান্নার এক দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দেখি - অমিয় লাকড়ীর উপরে চক্ষু বুজিয়া হেলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এ শরীর দুয়ারে বসিল। এমন ভাবে দরজা বন্ধ হইল যে, কিছু ঘরে ঢুকিলে আমার হাঁটুর উপর দিয়াই যাইতে হইবে। যেখানে আমি বসিয়াছি সেখান হইতে পূজার স্থান একটু দূরেই। মাঝখানে সামনে দুই ঘর, তাহা ছাড়া পর পর পর্দার জন্য দুই বাসার ঘেরা বেড়া। এইসব ব্যবধান সত্বেও মন্ত্রাদি ত স্পষ্ট কানে আসিতেছিল। কিন্তু আমি আগুন সহ যজ্ঞাদি পরিষ্কার রূপে চোখে দেখিতেছিলাম। ইহার ভিতর আরো দেখিলাম কি পূর্ণিমায় পূর্ণ চন্দ্রসহ মধ্য রাত্রিতে আকাশে থাকিলে যেইরূপ হয় সেইরূপ জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাড়ি আলোকিত হইয়া গিয়াছে। এ শরীরের গায়েও সে আলো পড়িতেছে। রান্না ঘরের বাতি জ্যোৎস্নার আলোতে অস্পষ্ট দেখাইতেছে। হঠাৎ আমার ডান পাশ হইতে উজ্জ্বল ছায়ার মতন লাল আভায় যুক্তগৌর বরণ পৈতাধারী এক দীর্ঘকায়

মূর্তি প্রকাশ হইয়া ঘরের ভিতর দুই পাথরের থালায় যেখানে ভোগ রাখা হইয়াছিল সেখানে বসিল এবং প্রত্যেকটি হইতে মুদ্রায় তিন তিন বার গ্রহণ কবিল। আমি বার বার দেখি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এখান হইতে - তাহার উৎপত্তি স্থানেই ঐ মূর্তি মিলাইয়া গেল।

ইহার পর ভোলানাথ তাড়াতাড়ি আসিয়া পূজার স্থানে ভোগেব ঐ পাথরেব থালা দুইখানি দুই হাতে নিয়া চলিলেন। তাঁহার আগে একজন রাস্তায় গোবর জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিতেছে, পাছে একজনের হাতে লণ্ঠন। সঙ্গে আরও একজন লাঠি হাতে সাথে সাথে যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে একটি কালো কুকুর আসিয়া লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নানা চেষ্টা সত্ত্বেও ভোলানাথকে ছুঁইয়া দিল। ভোলানাথ মহা ভাবিত হইয়া, যেখানে কুকুরে ছুঁইয়াছে সেখানে একটি আম গাছ ছিল, তাহারই তলায পাথর দুইখানি ফেলিয়া পুকুরে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া বলিল - শীঘ্র আবার অন্ন পাক করাও কুকুরে ভোগ নষ্ট করিয়াছে। পূজোয় নিবেদনের জন্য প্রস্তুত অন্ন কুকুর স্পর্শজনিত দোষে পরিত্যক্ত। আমি বলিলাম - বাজার হইতে আতপ চাউল আনাইতে হয, তাহা না হইলে ঐ দিন যে কাকে ঠোকব দিযাছিল, তাহা ছাড়া ঘবে অন্য চাউল নাই। এত রাত্রিতে আবার বাজাব যাইয়া চাউল আনিযা ভোগ বান্না কবার সময থাকিবে না। ভোলানাথ নিরুপায় দেখিয়া বলিল, ঐ কাকের ঠোকব দেওযা চাউলই কালী মায়ের ইচ্ছা, তাহা না হইলে এইরূপ ঘটিবে কেন? কোথায় ঐ চাউল? শীঘ্র ভোগের আয়োজন কর, সময় খুব কম। তাহাই রান্না কবা হইল।

পাক হইলে ভোগের জন্য পাথর তালাস হইল। ভোলানাথ দৌড়াইয়া আমগাছের তলায় যাইয়া দেখিল পূর্বের ভোগ কিছুতে খায় নাই, অমনি পড়িয়া আছে। কি করিবেন দিশা না পাইয়া পুকুরের জলে তাহা ফেলিয়া পাথর দুইখানি ধুইয়া আবার স্নান করিয়া ভোগ লাগাইযা অতি সাবধানে নিয়া কালীর সম্মুখে নিবেদন করিলেন।

পরে প্রসাদ নিবার সময়, আমি ভোলানাথকে পূর্বোক্ত ঘটনা জানাইলাম এবং পূজককেও জানাইতে বলিলাম। পূজক শুনিবামাত্র অতি ব্যগ্রতা সহকাবে বলিলেন - ঐ ভোগ কোথায? আমি ঐ ভোগ নিব, ঐ আসল ভোগ হইযাছে। কুকুরে ছুঁইয়া থাকিলেও নষ্ট হয় নাই। পরের ভোগ বাহ্যিক হইযাছে মাত্র। ভোগ জলে দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। আবও বলিলেন - ঐ মহাপ্রসাদ পাওয়ার অধিকারীও ত চাই। অনধিকারীতে ত আর উহা পাইতে পারে না। এই

ভোগ ত কেহ পাইবার অধিকারী নয় কাজেই এইরূপ হইল। এই সব কথা যখন জানাজানি হইল, কেহ কেহ হাসিয়া উড়াইল, কারণ পূর্বে কীর্তন সম্বন্ধেও এ শরীর নিয়া আলোচনা হইয়াছে।

কাজের খেয়াল ও তাহার উপায়

একবার খেয়াল হইল যে আশুর গায়ের একটি পাঞ্জাবী ও মাখনের নিমা, নিজে ছাঁট্‌কাট্ শিখিয়া সেলাই করিয়া দিব। নিকটবর্তী এক স্ত্রীলোকের নিকট শিখিবার জন্য প্রায় দুই দিন গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর একদিন গিয়াছি পাঞ্জাবীব ছাঁট একটু ইঙ্গিতে বলিয়া দিল ও বলিল আমি ভাল জানি না। আর একজনের নাম করিল, সে শিখাইবে বলিল। কিন্তু যখন তাহাব কাছে গেলাম, সে বলিল আমি জানি না, ও কিছুই দেখাইল না। আমি সেইদিনই বসিয়া নিজে নিজে আন্দাজে পাঞ্জাবী কাটিয়া সেলাই করিলাম। আশুর গায়ে দিয়া দেখি বেশ ঠিকমত হইয়াছে। পরে দেখি যাহার কাছে শিখিতে গিয়াছিলাম, তাহার ছেলের গায়ের জন্য সে যে পাঞ্জাবী করিয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই। সেও আমাকে বলিল - আশুর গায়ের পাঞ্জাবী ত দেখি বেশ হইয়াছে। আপনি নিজে জানিয়া আবার শিখিতে চান কেন? তাহাদের ধারণা আমি পূর্বে কিছু কিছু জানিতাম। কেহ বুঝিত না যে কোন কিছু করিবার ভাব আপনা হইতে জাগিলে, তাহার উপায়ও আপনা হইতেই সুন্দরভাবে হইয়া যাইত। **মায়ের কোনকিছুই পূর্বপরিকল্পিত নয়, যখন যা প্রয়োজন তখন তা মায়ের ক্ষেত্রে আপনা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়।**

অক্ষয় নামে এক চাকর কাছারি ও কর্মচারীদের বাসায় কাজ করিত। বাসায় কাজ করিবার জন্য সে থাকিত। ছেলেটি শান্ত ও ভক্ত। যত বেলাই হউক সে পূজা না করিয়া খাইত না। এ শরীর কুর্শিতে আসনাদি বানাইতে পারে দেখিয়া সে একদিন বিশেষ বিনয়ের সহিত বলিল - যে আমাকে হরি কীর্তনের জন্য একখানি আসন বানাইয়া দিবেন মা ঠাকুরাণ? ভোলানাথের কথামত সে গুলিসূতা আনিয়া দিল তাহাকে একখানি আসন তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ দেখিয়া বলিল - এ কেমন, চাকরকে আসন বানাইয়া দেওয়া হয়? এ লোকটি সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট ভূদেববাবুর বাসায়ও ছিল। আমি ঢাকা থাকিতে ভূদেববাবুর বাসায় একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঐ আসনের মত একটি আসন তথায় দেখিলাম। শুনিলাম অক্ষয় সেই আসনটি ভূদেববাবুকে দিযাছিল।

যখন কাজ করিতাম তখন শরীরের দিকে একেবারেই খেয়াল থাকিত না। একদিন কি উপলক্ষ্যে একটি টুলের উপর উঠিয়াছি, বেকায়দায় পা পড়িতে পড়িয়া গেলাম। ব্যথা যে পাইলাম, খেয়াল নাই, সে কাজ করিয়া আসিলাম। দুই তিন দিন পরে কাপড় পরিতে গিয়া দেখি হাঁটু হইতে উরু পর্যন্ত একটা দিক সামনে নীলবর্ণ দাগ হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানটি যেন অসাড় বোধ হইল। পরে আপনা আপনিই সরিয়া গেল। কাহাকেও জানাইবার খেযালই হইল না।

অবিদ্যার মায়ার খেলা

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - বাজিতপুরে আমাকে সমবযসী সকলেই প্রায় দিদি বলিত। আর একজন বয়সে আমার অনেক বড়, আদরে সীতা ডাকিত। সে স্ত্রীলোকটি একদিন বলিল - তহুরী ইত্যাদি পাইবার সময় হইয়াছে, এবাব অনন্ত চুড়ি গড়াইবেন না? এ শরীব কিছুই খেযাল করিল না। এ কি বলিতেছেন বলিযা হাসিযা উঠিল। সে ভাবিল আমি গোপন কবিলাম। সে আমাকে খুব আপনার ভাবিয়া সকল সময়ই আলাপ করিত। সেদিন বৈকালে দেখা হইলে দেখি কি, পূর্বের মত তেমন খোলা সরল ভাব নাই।

এই রূপে কযদিন গেল। তখন কথায় কথায় ভোলানাথেব নিকট শুনিলাম যে এই সময়তে জমিদারী কাছারিতে বৎসরের হিসাবনিকাশ হয এবং কর্মচাবীরা তহুরী ও মামুলী পাইযা থাকে। তাই স্ত্রীলোকটি ঐরূপ বলিয়াছিল। তাহাব পরদিন ভোলানাথের ইচ্ছানুযাযী এ শরীব যাইয়া তাহাকে জানাইল যে এ শরীর এইসব কোন খববই রাখে না। তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বোধ হইল আমি ঘরের মানুষ আমি জানি না, ইহা অসম্ভব। এ শরীর চুপ করিয়া চলিয়া আসিল। বেশ দুনিযার খেলা। এইরূপে অনেকে সত্য কি বুঝিতে না পারিয়া ভূলের ভিতর দিয়া মিছামিছি দুঃখ পায। ইহাই ত অবিদ্যার মায়া।

ইহার পর সে তাহার নিজ দেশে গেল। সে প্রতিবার দেশে যাইতে এ শরীবের সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। কিন্তু এইবাব যায নাই। দেশে গিযা কাহারও বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া ভয় পায। পরে মাথাও বিকৃত। তাহাব স্বামী ছুটি ফুরাইলে বাজিতপুরে ফিরিয়া আসিযা

তাহার স্ত্রীর অবস্থা ভোলানাথকে জানাইল যাহাতে সে সারিয়া যায়। এ

শরীর শুনিল। তাহার সম্বন্ধে এ শরীরের খেয়াল হইলে, কিছুদিন পর তাহার রোগ বিনা চিকিৎসায় সারিয়া গেল।

মার ভোজ রান্না

বাজিতপুরে ভোলানাথের সকলের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। একদিন কাছারির এক ভদ্রলোক, তথাকার মুন্সেফ, উকিল হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারী কাছারির আমলা ইত্যাদিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিল। এ শরীরের উপর রান্না করার ভার পড়িল। প্রায় ২৫০ লোক। সেদিন একা এত লোকের পাক যে কেমন করিয়া এত অল্প সময়ে হইল ইহাও অস্বাভাবিক, লোকেরাও বলাবলি করিতে লাগিল। পোলাও ও নানা পদের রান্না এত বেশি পবিমাণে সেইদিনই এ শরীবের প্রথম।

ঠিকা ঝি

১২/১৩ বছরের একটি মেয়ে, নাম সরলা। দুইবেলা আসিয়া ঠিকা মাহিনায় আমাদের ও অন্য বাসায় কাজ করিত। মাঝে মাঝে ভাল খাওয়া দাওযা হইলে তাহাকে খাইতে বলিতাম, পূজার সময় কাপড় চোপড়ও তাহার পছন্দ মত পাইত। বাসনাদি ভাল মাজা না হইলে আমি নিজে আবাব পরিষ্কার করিতাম। এ কারণে সে আমার কাজগুলি খুব মন লাগাইয়া করিত। হাসিতে হাসিতে বলিত, আপনি মুখে কিছু বলেন না বটে কিন্তু কাজ করাইয়া নেন। অন্যেরা মুখে বলে কিন্তু আমি চুপ করিয়া সরিয়া পড়ি। আপনার কাছে তাহা পারি না। কেহ কেহ বলিত আশুর খুড়ীর বাসন তুই এত পরিষ্কার করিস, আমরা কি তোকে পয়সা দিই না?

একদিন সে একটা সামান্য অন্যায় কাজ করিয়াছিল, অথচ আমি বাহিরে দেখি নাই। হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল - তুই বুঝি ইহা করিয়াছিস? এই কথা বলিয়া যে স্থানে সে জিনিষটা রাখিয়াছিল, সেই স্থানে উহাকে লইয়া এ শরীর চলিয়া গেল। ও তো দেখিয়া অবাক, এইমাত্র এই কাজটা করিয়া দরজা খুলিয়া এ শরীরের ঘরে সবে ঢুকিয়াছে। সেইদিন হইতে তাহার যেন একটু ভয হইল এবং আরও মনোযোগ দিযা সব কাজ সুন্দর রূপে করিত ও অতিরিক্ত কাজ পর্যন্ত করিয়া দিত।

ভোলানাথের কুকুর পোষা

ভোলানাথ একদিন একটি সুন্দর সাদা কুকুরের বাচ্চা আনিল। ক্রমে ক্রমে এটি বাসার চৌকিদার হইয়া উঠিয়াছিল। একবাব ইহার পেটের অসুখ হয়, রাত্রে যতবার বাহ্য পাইত, সে মানুষের মত প্রকাশ করিত ও তাহাকে বাহিরে নিয়া পায়খানা করাইয়া আবার ভিতরে লইয়া আসিতাম। ৩/৪ দিন এ অসুখ ছিল। ইহার ভাবভঙ্গী কতকটা মানব শিশুর মত ছিল। নিজের খাওয়ার সময় হইলে ডাকিত, এ শরীর কাছে গেলে চুপ করিত। যখন একটু বড হইল দেখিতাম সকলের খাওয়া না হইলে আড়ালে বসিয়া থাকিত। খাওযা শেষ হইল কিনা চুপি দিয়া দেখিত।

ভোলানাথ, পিতা ও আশুর রোগারোগ্য

এক সময বাজিতপুরে ভীষণ কলেবা দেখা দেয। ভোলানাথও সে বোগে আক্রান্ত হন। বাড়িতে কেহই নাই আমি একা। তাহার প্রস্রাব বন্ধ। অবস্থা খুব খারাপ। হঠাৎ খেয়াল হইল যে যদি এ শরীরেব বাম হাতেব বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখটি মরিয়া যায়, তাহা হইলে ভোলানাথ ভাল হইযা উঠিবে। বলিলাম - তাহাই হউক। ধীরে ধীরে ভোলানাথ ভাল হইতে লাগিল। এদিকে নখটি ক্রমশঃ মরিয়া গেল।

একদিন সকাল বেলা আপনভাবে বসিয়া আছি, দেখি কি শবীরের পিতা কোন একস্থানে হাঁপানিতে সাংঘাতিক অবস্থা। শ্বাস পড়ে না, মৃতের মত। হাঁপানির ব্যারাম তাঁহার বরাবরই ছিল, এই শরীরটা উঠিয়া গিয়া ভোলানাথকে ওই ঘটনার কথা জানাইল। তিনি বলিলেন - যাহাতে ভাল হয়, তুমি দেখ। ঐ সময়ে কতদিন পর্য্যন্ত ভোলানাথ যাহা বলিতেন, তাহাই পালন করিতে চেষ্টা করিতাম। যাহা হইত না, তাহা কাতরভাবে বলিতাম যে হইতেছে না। তিনিও এতদিন পর্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া এ শরীরেব ভাব ও অবস্থা বুঝিতে পাবিতেন।

সেদিন আবার যখন স্থির হইয়া বসিয়া আছি দেখি কি আমি যেন পিতা যেখানে আছেন সেইখানে যাইয়া তাঁহাব বক্ষাব জন্য কিছু দিলাম। আর ভিতর হইতে বাহির হইল - ইনি এইবাব বাঁচিলেন। কিন্তু পবে কি ব্যাবামে, কি ভাবে শরীর ছাড়িবেন, তাহাও ভিতর হইতে আসিল। পরে বাবাব সঙ্গে দেখা হইলে জানিলাম, বাস্তবিকই ঐ সময়ে কসবায় হাঁপানিতে তাঁহাব অবস্থা নিতান্ত খাবাপ

হয়। কে একজন আসিয়া একটি কবচের কথা বলিয়া যায়। সে কবচ ধারণ করিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

একবার আশুর খুব জ্বর ও রক্ত আমাশয় হয়। ভোলানাথ সামান্য কিছুতেই ভয় পাইতেন, প্রাণও কোমল। এইরূপ অসুখ দেখিয়া তাঁহার কাঁদ কাঁদ ভাব। আমি বলিলাম - সেবার দরকার, কাঁদিলে কি হইবে? তিনি হয়ত মনে করিলেন ইহার মায়া মমতা নাই, না হয় পরের ছেলে। ইতিমধ্যে তাঁহাকে মফঃস্বল যাইতে হইল। এ শরীর একা আশুকে নিয়া দিনরাত্র সেবায়। খেয়াল হইত সর্বদা বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে সে বাঁচিবে না। রাত্রি জাগিয়া তাহাকে বাহিরে নিযা বাহ্যি-প্রস্রাবাদি করাইতে হইত। আশুর বযস তখন ১২/১৩ বৎসর। কিছুদিন বাদে সে সুস্থ হইযা উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাজিতপুরে উষাদিদি ও জানকীবাবু

উষাদিদির স্বামী বদলী হইয়া বাজিতপুর আসিল। কযেকমাস পরে উষাদিদিও আসিল এবং পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া খুব আনন্দ পাইল। আমাদের পাশের বাস্নায়ই থাকে। আমরা ঘরের ভিতর বসিয়াই কথাবার্তা কহিতে পারিতাম।

ঘর, বিছানা, জিনিষপত্র সবই পরিষ্কার বাখিতাম। নিজহাতে সাবান দিযা কাপড় ধুইতাম। আমাদের বিছানায় কাপড ইত্যাদি ধোপায় ধোযার মত পরিষ্কার দেখিয়া উষাদিদি কখনো কখনো তাহার কোলের শিশুকে বিছানায় বসাইযা দিত আর হাসিত। একদিন সেটি বিছানায় প্রস্রাব করিল। নিজেই সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। আমি খুব হাসিতেছি দেখিয়া বলিল - তোমার ত হাসি, আর আমি নিজের দোষে খাটিতেছি। **বলিলাম - জীবের ধর্মই এই, নিজে কর্ম তৈয়ারী করিয়া আবার নিজেই খাটিয়া দুঃখ পায়।** তাহার ব্যবহারিক সরলতা ও বুদ্ধি বেশ ছিল।

একদিন কোথায় পূজা হইল, কে আসিযা দুইখানি নৈবেদ্য আমাদেব দুইজনকে দিয়া গেল। উষাদি প্রসাদ তাহাব মেযেদের দিল ও নিজেও নিল, বাকিটা ঘরে তাহার স্বামীর জন্য রাখিয়া দিল। আমাদেরটা আমি রাখিযা দিতে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিলে না? বলিলাম - ভোলানাথ আসুক, আগে খাইতে নাই। উষাদিদি বলিল - আজ হইতে আমিও আগে খাইব না। সে সর্বদা আমার কাছে আসিযা কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিত। কাপড় ধোয়া, সংসাবের কাজকর্ম ইত্যাদি। অথচ আমি যে কিছু জানিতাম ইহাব বহিঃপ্রকাশ ছিল না। যখন যাহা দরকার আপনা হইতে হইয়া যাইত।

একদিন নিকটে এক বাড়িতে কীর্তন হইতেছে, উষাদিদি বলিল - চল ঐ

বেড়ার কাছে বসিয়া কীর্তন শুনি। আমরা গেলাম। সেখান হইতে আসিয়া আমি মামাতো ভাইকে[1] পরিবেশন করিতেছি দেখি আমার হাত পা ঠান্ডা, শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, ভাতের থালা হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহা ধরিতে যাওয়া হয় হাত হইতে গড়াইয়া পড়ে। শরীর যেন অবশ। কোন মতে টানিতে টানিতে অন্য ঘরে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি হইয়া শরীরটা কেমন হইয়া একধারে পড়িয়া রহিল। মামাতো ভাই ও ঊষাদিদি এ শরীরের পূর্বের অবস্থাদি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। অনেকক্ষণ পর মাটি হইতে উঠিলাম। পরদিন ঊষাদিদি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম - মাঝে মাঝে এই রকম হয়।

ঢাকাতে দুই বোনের বিবাহ

এ শরীরের দুই বোনের বিবাহ ঢাকাতে হইয়াছিল।[2] সে উপলক্ষ্যে আমরা ঢাকাতে যাই। বিবাহের সময় বড়টির বর দেখিয়া, মা'র কাছে বিশেষ করিয়া বলিলাম - এ বর উপযুক্ত নয়। মা ও অন্যান্য সকলে বুঝাইল যে শুভকর্মের সময় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে নাই। বলিলাম - কি করিব যাহা দেখিতেছি তাহাই ত বলি। এ শরীরে যখন যে দিকটা খেয়াল তখনই তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় ত। মা হাসিতেছেন আর বলেন - বর দেখিতে আমার ত মন্দ লাগে না। তুই কেন এই রকম বলিতেছিস? বিবাহ হইল। ঘটনাচক্রে এ শরীর দ্বারা লৌকিক আশীর্বাদ ইত্যাদি হইল না। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় সুরবালা নমস্কার করিতে আসিল। আমার মুখ হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল - তুমি আর বেশি দিন সংসারে থাকিও না। পরে জানা গেল স্বামীর মাথা খুব ঠিক ছিল না। বিবাহের প্রায় ৩ বছর পরে সুরবালা মারা গেল।[3]

বিবাহের পরই ছোটবোন ও তাহার জামাইকে নিয়া আমরা অনেকজন ঢাকায় ঢাকেশ্বরী বাড়িতে যাই। ঢাকেশ্বরী বাড়িতে নমস্কার করিতে করিতে এই শরীরের ভাব কিছু সময়ের জন্য অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম আপনা হইতে আসন হইল, তাহার পর নানা প্রকারের নমস্কার হইল। পরে ধীরে ধীরে স্থির হইয়া বসিল। এইসব সকলেই বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিল। দেবালয়ে এই প্রথম

[1] শ্রী নিশিকান্ত স্মৃতিভূষণ ঃ শ্রীশ্রী মাযেব হইতে বয়সে বড়, তিনি কিছুকাল এই গৃহে ছিলেন।
[2] ১৯২১।
[3] আগষ্ট, ১৯২৪।

এ অবস্থার প্রকাশ হইল। ক্রমশঃ কোন ঈশ্বরীয় ভাব দর্শনে, শ্রবণে ও স্মরণে শরীরের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যাইত।

চিত্র ঃ প্রাচীন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী - যেখানে শ্রীশ্রী মা'র ভাব হইয়াছিল, সেটি এখন কুমারটুলি, কলকাতায়

সাধু শিবানন্দ

বাজিতপুরে গিয়া সুবিধা পাইলে আগের মত রাত্রিতে বসিতাম। কোন কোন সময় দেখিতাম আমার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কখনো চলাফিবা করিতেও এ রকম হইয়া যাইত। ভোলানাথকে ইহা জানাইলাম।

ঐখানে সব্-রেজিস্ট্রারেব বাড়িতে এক সাধু আসিযাছিল, নাম শিবানন্দ। সে আমার অবস্থাদি শুনিয়া আমাদের বাসায় একদিন রাত্রে আসিল। আমি স্থির হইয়া আসন করিয়া বসিলাম শরীরের আলোড়ন ক্রিয়াদি সামান্য হইল। সে দেখিয়া চলিয়া গেল। পরে তাহার অনুরোধে ভোলানাথ ও আমি সব্-রেজিস্ট্রারের বাসায় একদিন গেলাম। সাধু যেখানে পূজা করে সেখানে একটি আসন দিল। আমি বসিলাম। সাধারণতঃ ঘরে রাত্রে বসিলে শরীরের ক্রিয়াদি কতক্ষণ হইয়া ধীরে ধীরে শরীর স্থির হইয়া যাইত, ঠিক সেইরূপ হইল। মহা আনন্দেব স্রোত ভিতরে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। শরীর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে বাসায ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন ভোলানাথ বলিল - ঐ সাধু আমাদের বাসায় শিবপূজা করিতে চায়। আমি বলিলাম আচ্ছা। একদিন পূজা ও তাহার খাওযাদিব ব্যবস্থা কবা হইল। ঐ সাধু আসিযা পূজা শেষ করিয়া আমাকে ডাকিল। সে চৌকির উপর বসিয়া বলিল - আপনি আমার এই শিবের উপর পূজা করুন। ভোলানাথের আদেশে পূর্বেও তাহার সহিত বেশি ঘোমটা টানিয়া কথাবার্তা বলিয়াছি। বলিলাম - কোনদিন ত শিবপূজা করি নাই। সে বলিল - আপনি পূজায় বসুন আমি বলিয়া দিব। ইহার ভিতরই আমার শরীরের ভাবান্তব হইতেছিল। তখন আসনে বসিলে আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাধু বলিয়া উঠিল - আপনি আর কিছু করিবেন না, কেবল ফুল-চন্দন, বেলপাতা শিবের মাথায দিন। আচমন কবিতে গেলে হাত এলো-মেলো হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, হাত আর উঠে না। সে আমার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া ব্যস্ত সহকাবে বলিল - থাক থাক আর প্রয়োজন নাই,

কিছু করিতে হইবে না। সে খাওয়া দাওয়া করিয়া নিজের শিব নিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। সেই সাধু নাকি কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিল এ শরীরের উপর আনন্দ ভৈরবীর দৃষ্টি আছে।

লক্ষ্মীর ঘটে পূজা

বাজিতপুরে এ শরীর যখন আসে তখন একদিন ভোলানাথকে একটি ঘটের আকার দেখাইয়া ঐ জাতীয় একটি ঘট আনিয়া দিতে বলিলাম। ভোলানাথ অনেক খুঁজিয়া ঐ প্রকার ঘট না পাইয়া আসিয়া বলিলেন - তুমি যে রকম বলিলে, একটাই দোকানে পুরানো সেই রকম একটি ঘট দেখিয়াছি। আনিব কি? বলিলাম - সেইটিই ত। সেই পুরানো ঘটটাই আন, ঐটির জন্যই ত বলা। দেখা গেল ঘটটির গায়ে সিন্দুর এবং বহুকালের পূজার চন্দনের ছিঁটার দাগ পড়িলে যেমন, তেমনটি। তাহার আর ধাতুর রং দেখা যায় না। এই শরীর তাহা দেখাইয়া বলিল - দেখিলে, এই ঘটে বহুকাল পূজা হইয়াছে। সেইটি বিশেষ করিয়া নিজের হাতে মাজা হইল। তাহাতেই এ শরীরের লক্ষীপূজা চলিতে লাগিল।

বেশ কিছুদিন পরে সাহবাগে আসিলে যখন এ শরীরের পড়িয়া থাকার দিক, তখন দিবারাত্র কোথা দিয়া চলিয়া যাইত। বৃহস্পতিবারে লক্ষীপূজার সময়মত এ শরীরের পূজা হইয়া উঠিত না। প্রায়ই বৃহস্পতিবারটি এইরকম ভাবের ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রতি বৃহস্পতিবারে আর পূজা হইয়া উঠে না। একদিন বৃহস্পতিবারে রাত্রিকালে এ শবীবের খেয়াল হইলে বলিল - চল, আম্রপল্লব তুলিয়া আনি। ভোলানাথ বলিলেন - তুমি এখন এই রাত্রে উঠিলে, পূজার যোগাড় কোথায়? রাত্রে তো আম্রপল্লব তুলিতে নাই। এ শরীর ত দিবা রাত্রির মধ্যেই নাই, কেমন এক ভাব ঢলঢল। একবার চোখ খোলে, আবার চোখ বন্ধ হয়, কখনও অর্দ্ধোন্মিলিত। কখনও ছেলেমানুষের মত হাসে, চোখে জল, চোখে মুখে রক্তিমাভা। কখনও বা আধো আধো কথা, কখনও বা কি এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে কথা বাহির হইতেছে না। ভোলানাথকে বলিল - পূজা তো করিতেই হইবে। চল, তুমি আম্রপল্লব তুলিও না। এই বলিয়া ভোলানাথের সঙ্গে আমতলায় গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল - এই শরীর তুলিতেছে। ইহাতে যদি পাপ হয়, তবে এখানে এমন অপূর্ব স্থিতি - পাপ পুণ্য, সময় অসময়, বিধি নিষেধের গন্ডি, বন্ধন - এখানে প্রকাশ কই? পূজা করিতে গিয়াও ঐভাব, দীর্ঘ সময় নিয়া কোনও রকমে সমর্পণ।

অটলবাবু[৪] সাহবাগ আসিয়াছিলেন। এ শরীর তাহাকে বলিল - এ শবীরের তো প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা হইয়া উঠে না, তুমি কি এই ঘটটি নিবে? সে অতি আগ্রহের সহিত নিল। সে ও তাহাব স্ত্রী আগ্রহের সহিত তাহাতে পূজা করিতে লাগিল।

হরিনামে স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ

এ শরীর একাদিক্রমে মাটিতে প্রায় মাসখানেক ধরিযা সমানভাবে রাত্রিতে বসিতেছে। শরীরে নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিলাম বসিবার পর মুখে ঐ হরিনামের ধ্বনিব সহিত পুরকে 'হরি' রেচকে 'বোল' হইতে কোন একটি বিশেষ আসন হইয়া, দুলিতে, দুলিতে চারিদিকে ঘোরা আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। ঘুরিতে ঘুবিতে আবার স্থির হইয়া যাইতাম। শরীর নিশ্চল, পাথরের মত স্থির, ভাব সম্পূর্ণ সাম্য। চোখের দৃষ্টি দূরে স্থিত - যেন কি এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। দেখিতাম শ্বাস বন্ধ হইয়া কুম্ভকের মত হইত। কিন্তু তখন প্রাণবায়ুর ক্রিয়াদি বা বেচক, পূবক, কুম্ভকাদি কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে কাহারো নিকট শুনা ছিল না।

কখনো কখনো আপনা হইতে পা লম্বা হইয়া যাইত, ক্রমে ক্রমে আবার হাত স্পর্শ না করিয়া গুটাইয়া পদ্মাসন, বা অন্য আসন হইত। সময় সময় আবার পা মেলিয়া যাইত এবং এক এক হাত এক এক পাযের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেব উপর রাখা হইত। আর মাথা ও বাকি শরীব আপন উরুর উপব দিযা পড়িয়া থাকিত।[৫] সাধনার বিভিন্ন অবস্থা। আবার কোন দিন গোমুখী আসন ও নানা বকমে দিনে দিনে কত কত অনেক রকমে রকমে আসন হইয়া সামনেব দিকে মাথা মাটিতে পড়িত। হাত দুইখানি শরীরের সঙ্গে মিলিযা পিছনের দিকে যাইযা মাটিতে পড়িয়া থাকিত। যখনই যে কোন প্রকার আসন হইত উহাতে হাতেব কোন সাহায্য লইতে হইত না। পেট, বুক ও মাথা আসনে স্থিত অবস্থায়ই মাটির উপর পড়িয়া থাকিত। এ আসন অবস্থায় মাথা ও গাল মাটিতে স্পর্শ রাখিয়াই এই ক্রিয়া হইত। আবার ঘুরিয়া আর এক গাল মাটিতে, আবার কপাল হইতে নাক মুখ থুতনী মাটিতে, হাত দুইখানি কখনো কখনো পিছনের দিকে মাটিতে বাখিয়া এবং ঊর্দ্ধে গিয়াও মাটিতে সটান থাকিত। এই রকম নানা প্রকার ক্রিয়াদি ও

[৪] অটল বিহারী ভট্টাচার্য্য ঃ রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক।

[৫] পশ্চিমোত্তব আসন।

প্রণামাদি হইত। পরে উঠিয়া ঠিক হইয়া যাইত। কিন্তু প্রত্যেক আসনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হইত এবং রেচক, পূরক ও কুম্ভক সব আসনের সঙ্গে সঙ্গে যখন যেখানে যত সময় দরকার ঠিক যেন কলের পুতুলের মত হইতে থাকিত। শুধু শ্বাসের বিবিধ গতির খেলাই শরীরটার নড়াচড়ার দ্বারা প্রকাশ হইত।

পড়িয়া থাকিবার সময় দেখিতাম, এ শরীরটার ক্রিয়াদি চলিতে চলিতে হঠাৎ চুপ হইয়া যাইত। আবার কি হইত - শরীরটা প্রথম প্রথম অপেক্ষা করিয়া থাকিত। কোথায় থাকিয়া কিভাবে কাহাকে কে দেখিতেছে, এইসব কি হইতেছে, পরেও বা কি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিচার রূপে প্রকাশ হইত। শবীর একেবারে চুপ হইলে তখন কিছুক্ষণ বসিয়া পরে শুইয়া পড়িত। প্রাতে উঠিলে শরীব হাল্কা এবং পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটি আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে এইরূপ বোধ হইত। দিন রাত্রি সে আনন্দে ভরপুর প্রকাশ থাকিত।

বাসায় একা, গৃহের কাজ তাড়াতাড়ি করিতাম। কতক্ষণে রাত্রি আসিবে আর আমি আপন ভাবে গিয়া বসিব ইহা শরীরটায় যেন লোভের মত প্রকাশ হইত। যতই এক এক দিন এক এক রকম আসন ও শরীরের নানা রকম ক্রিয়া হইতে লাগিল, ততই সে আনন্দ ও উৎসাহে শুইবার ও খাইবার ভাব ওই সময় চলিয়া সেইগুলি বে-খেয়ালের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও ভোলানাথ এ শরীরের এইসব কার্যে কখনও বাধা দেয় নাই তথাপি এসব দেখিয়া, দীক্ষা হয় নাই, অথচ এই সব কি হইতেছে, ইহা ভাবিত ও বলিত। এই শরীর ইহা শুনিয়া হাসিত।

দীক্ষার খেলায় মা

বাজিতপুরে আসিয়া কিছুদিন পরই পুকুরের উত্তর পাড়ে বসিয়া এই শরীরের একটা খেয়াল আসিল - ভগবানকে মানুষ কি রকম করিয়া চায় ও পাওয়া যায়। **সেই সাধনার খেলাটা খেলিতে হইবে। এক দিন দীক্ষা কি, কেমন করিয়া হয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষ ভাবে খেয়ালরূপে প্রকাশ হইল।**

দীক্ষার ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন - যতটুকু হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আশুর মা'র নিকট তাহার গুরুদেব এক পত্র দিয়াছিলেন। সে পত্রখানি ছিল। সে সময় বয়স খুব কম। সেই চিঠি হইতে তাঁহার ঠিকানা বাহির

করিয়া ভোলানাথ তাঁহাকে পত্র দিলেন আসিবার জন্য। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আশুর মার কাছেও ঠিকানা চাওয়া হইল, কোন জবাব আসিল না। এইদিকে দীক্ষা সম্বন্ধীয় যে কথাটা খেয়ালে আসিতেছিল, সেই খেলাটা আরম্ভ হইল। কেননা এই শরীরের ত সব দিকেই চূড়ান্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আরও খেয়াল হইল দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতায় ভগবান স্বয়ং দীক্ষারূপে প্রকাশ পান। যেমন গাছের মধ্যে বীজ নিহিত থাকে ও বীজেব মধ্যে গাছ নিহিত থাকে তদ্রূপ গাছ হইতেও বীজের প্রমাণ, বীজ হইতেও গাছেব প্রমাণ - স্বাভাবিক প্রকাশ।

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা।[৬] সন্ধ্যায় পাড়াব একটি বউ আসিযা জিজ্ঞাসা করিল ঝুলন দেখিতে যাইব কিনা। আমি 'না' বলিয়া দিলাম। ভোলানাথ খাইবার পর আমি তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু খাইয়া তাহার চৌকির একটু দূরে মাটিতে বসিয়া বলিলাম - দেখ আমার শবীরটা আজ যেন বিশেষভাবে কেমন লাগিতেছে। আমি আজ এখনই বসিব। অন্যান্য দিন এত সকালে খাই না। সেদিন সামান্যই খাওয়া হইল। আজ যেন কেমনই একটা ভাব।

ইহার দুইচার দিন পূর্বে একদিন ভোলানাথ আমার এইরূপ নানা ভাব দেখিয়া চিন্তা সহকারে বলিয়াছিল - দেখ, তোমাব দীক্ষা হয় নাই অথচ এইসব কি হয় আমি ত বুঝিনা। আমরা শৈব ও শাক্ত অথচ তুমি হরিনাম কব, আর এইরূপ অলৌকিক অবস্থাদি পর পর হয়। আমাদের ঐ মতেও ত নাম করিয়া দেখিতে পার। বলিলাম - আচ্ছা। সেই হিসাবে আমি নিজেই 'জয় শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম হর হব' ভিতরে ঠিক করিলাম এবং ভোলানাথকে ইহা বলিলাম - তাহা হইলে আমি কি এই নাম করিব? ভোলানাথ বলিল - বেশ ত কর।

ঘবে আলো জ্বলিতেছিল, দেখি কি পূর্বে হরিনাম করিতে বসিলে শরীরের উপর দিয়া যে ক্রিয়াদি বিশেষ করিয়া হইত, তাহাই এই নাম করিতে কবিতেও আরও বেশি এবং ক্রমশঃ পরিবর্তিত ভাবে সেই সব ক্রিয়াদি হইতেছিল, সেইভাবে পরিবর্তন হইতে হইতে নূতনভাবে বাড়িয়াই চলিল। স্থিব ভাবে একটু উত্তর পূর্ব কোণাভিমুখী হইয়া একটি বিশেষ আসন করিয়া শবীরটি বসিয়া গেল। মাটিতে ঘব লেপার মত লেপিয়া একটি যজ্ঞ-মন্ডল আপনা হইতেই তৈয়ারী হইল এবং আসনস্থিত অবস্থায় শরীরটা সামনের দিকে মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন রাত্রি আন্দাজ দশটা এগারটা বাজিতে চলিল। পূর্বে যজ্ঞমন্ডল তৈযারী কবিতে কোনদিন

[৬] ৭ই আগষ্ট ১৯২২, সোমবাব। বাধাকৃষ্ণকে দোলনায বসাইযা এই উৎসব পালিত হয।

দেখা হয় নাই। সেদিন ত আপনা হইতে যজ্ঞমন্ডল তৈয়ারী হইল। ঐ আসন অবস্থাতেই উঠিয়া পূর্ব দিকে মুখ করিয়া বসা হইল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নূতন পরিবর্তনের ধারায় কি এক সুন্দর অপূর্ব ভাবে ভাবিত। ভিতর হইতে নাভিমূলে সাড়া দিযা একটি বীজ জাতীয় মন্ত্র উঠিতেছিল। আসন যেভাবে যখন, সেখানে সে সময় পূজা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। হাত ঘুরিয়া যাইয়া ঐ মন্ডপেব মাঝখানে যন্ত্রের উপর অক্ষর অঙ্কিত হওয়া, অগ্নিমূর্ত প্রকাশ, যজ্ঞের ও আহুতির উপচারাদি সহ আপনা হইতে আপনাতে প্রকাশ হইয়াছিল ত। স্থূল ও মানসপূজা ও যজ্ঞাদি আহুতি যে ভাবে হয় সেইরূপ প্রকাশও হইয়াছিল। মন্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি সহ স্থূল প্রকাশিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের শরীরের অঙ্গাদি যেখানে যে রকম দরকার ইহার সঙ্গে সহায়তা করিল। মন্ত্রের দ্বারা পূজা, দ্রব্যের দ্বারা পূজা কেমন সুন্দর এইগুলির প্রকাশ।

এই সব হইতে হইতে আবার শরীরটা চুপ হইযা গেল। আর ভিতবে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষরের ধ্বনি অস্পষ্টই উঠিতে আরম্ভ করিল। নাভির নীচের দিক পর্যন্ত যেন সেই ধ্বনি সাড়া দিয়া প্রকাশিত হইযাছিল। যোগক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা। অস্পষ্টতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে হইতে এই শরীরটার চোখ সাময়িক বুজিয়া গিযাছিল। মুখ ও জিহ্বার নানা রূপ আঁকাবাঁকা ক্রিয়া হইয়া নাভি হইতে সর্ব শরীরের ভিতরে বাহিরে জোর লাগিয়া নূতন একভাবে সেই অক্ষরটি বেগের সহিত আসিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে ও মুখে উচ্চারিত হইয়া গেল।[1] পরে মন্ত্রটি স্থন্ডিলে অঙ্কিত হইয়া মন্ত্রদ্বারাই আহুতি ইত্যাদি সমাপ্ত হইয়া গেল।

যোগশাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রভেদের কথা আছে এইটি তাহারই বিশেষ একদিকের প্রকাশ ত। **সর্বাঙ্গের জড়তা বাহিরে ভিতরে না ভাঙ্গিলে নামের ঝঙ্কার ও বীজাদির উচ্চারণ, স্মরণ বা চিন্তা ঠিকমত চলিতে পারে না।**

ঐ আহুতি হইয়া গেলে পর তখন শরীরের গতি এক অভিনব উৎসাহ ও স্ফূর্তিতে শিহরিয়া উঠিল। এই শরীরের গতি এক মহা আনন্দময় বাজ্যে প্রবেশ করিয়া চুপ হইয়া গেল। ঐ অক্ষর কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা আসিবাব সঙ্গে সঙ্গে ইহার অর্থ ও রূপ-গুণাদি সহ এবং পবে পব পর যে সকল মূর্ত ও অমূর্ত ভাবাদি প্রকাশ হইবে এই শরীরের ভিতর আভাস প্রকাশ হইল এবং নিজের

[1] যোগী শাস্ত্র অনুযায়ী 'বাক' এর চারটি স্তর আছে - 'পরা' (অস্পষ্ট) - নাভীর নিম্নভাগে, 'পশ্চন্তি' - নাভী, 'মধ্যমা' - হৃদয় এবং 'বৈকারী' - মুখে নিসৃতঃ ধ্বনি।

ভিতর হইতে কানে শব্দরূপেও ধ্বনিত হইল। বসিযা আছি, দেখিলাম হাতের করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যাইতেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা এধার ওধার ঘুরিয়া যথাস্থানে আসিল এবং ঐ মন্ত্র জপ হইতে লাগিল। সেই বাত্রেই প্রথম এই শরীরের ভিতর দিয়া এমনভাবে মন্ত্র, জপ, পূজা ও যজ্ঞাদি যাহা কিছু প্রকাশ পাইল। পবদিন প্রাতে সর্ব শরীরের এমনকি পেটের নাড়ীতে ও শিরায় শিরায় একটু একটু সাড়া ছিল এবং ক্রিযার গতিতে ধীরে ধীবে কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

ভোলানাথ গত রাত্রিতে এ শবীরেব দুই একটি ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আজ জিজ্ঞাসা করিল - কাল যেন তোমাকে কি কি করিতে দেখিলাম? তাহাকে হঠাৎ বলিলাম - আমাকে এ বিষযে প্রশ্ন কবিও না। তোমার কাছে এ যাবৎ কোন কথা গোপন করি নাই। কিন্তু কি করিব বলিবাব ভাব হইতেছে না। তুমি যদি বল, দেখা যাক, যদি বলা হয়। কিন্তু যদি বলা হয়, তবে পরে এ শরীরের কি হইবে তাহা বলা আসিতেছে না। তখন বলিযা উঠিল - আমিও জানিতে পারিব না? আচ্ছা! দেখিলাম অবাক হইযা যেন একটু চিন্তিত হইল। বোধহয় বলিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে ইহা ভাবিয়া বলিল - আচ্ছা বলিও না।

সেইদিন সকালেও একটু এইসব নিয়া বসা হইয়াছিল। বাড়ির সকলে খাওয়ার পর স্নান করিয়া না খাইয়া, লোকের দীক্ষা হইলে যেমন সন্ধ্যা করে সেইরূপ ভাবে শরীরটা যাইয়া বসিল। দিনে এই ধরণে প্রথম বসা। কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম পরে জপ আরম্ভ করিতেই দেখি হাত গুটাইয়া আসে। শূন্যভাব নিয়া শরীরটা বসিয়া আছে। কেননা সন্ধ্যার ক্রিয়া শেষ করিতেই হইবে এই ভাব। অনেক পরে দেখি পূর্ব রাত্রে যেমন সাধারণ আসনে বসিলে মেরুদন্ড ববাবর কোমরেব কিছু নীচে টক্ টক্ শব্দাদি ও শ্বাসেব ক্রিযাদি হইযাছিল সেইরূপ হইল এবং একটা বিশেষ আসনে বসিযা গেলাম। বসিবাব পর আপনা হইতেই ঐরূপ ক্রিয়াদি হইতে লাগিল।

যেমন আসনের বামপাশে জলের ছিটা দিয়া পূজাব স্থানটি লেপা, সেইরূপ বামপাশে জল, আমি বাম হাত দিয়া ডান হাতে জল ঢালিযা পূজাব জায়গা করিলাম, পবে একটি বাসনে ভাল করিয়া হাত ধুইলাম। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, নৈবেদ্য কবা, ধূপ দীপ জ্বালান ইত্যাদি সব আযোজন কবিলাম। এই সবই স্থিরভাবে সিদ্ধাসনে বসা অবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। সবকিছু নিজের ভিতর হইতেই নিজের কাছে প্রকাশ। শেষে যেখানে বসিয়াছি সেইখানে হাত দুইখানি

মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মাটিতে পড়িল এবং দুই হাত দিয়া মাটিতে একটি আসন করা হইল। উহার উপর বসিয়া মাটিতে মাথা রাখা হইল। পূর্বে কখনও কাহাকেও এইরূপ আসন করিতে দেখা হয় নাই। তাহার উপর স্থিব হইয়া বসিযা আপনভাবে মন্ত্রাদি সহযোগে আচমন, জলশুদ্ধি, সূর্যপ্রণাম ইত্যাদি সন্ধ্যার সমগ্র ক্রিয়াদি হইয়া গেল, পরে আপনাতেই সব দেব দেবী সেইভাবে শরীরের উপর হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কোন কোন জায়গা গিয়া মুদ্রাদি সহ পূজা হইতে লাগিল স্বতঃ প্রণোদিত প্রক্রিয়া। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদিও নিবেদিত হইল।

অন্যান্য দিন স্থিরভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কখনও কখনও উপুড় হইয়া মাথা মাটিতে পড়িয়া থাকিত। কখনও অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়া শরীর কেমন একটা অসাড়ের মত আপনভাবে পড়িযা থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল মন্ত্র ও স্তোত্রাদি উচ্চারিত হইত। এই পূজা শেষ হইলে চিৎভাবে দুই হস্তের দ্বারা ব্রহ্মতালু হইতে একটি দেবতা বুকের উপর দিয়া নামাইয়া সম্মুখে মাটিতে কোন আসনে (আসন ইত্যাদি সব কিছুই স্বয়ং প্রকাশ) রাখিয়া আবার উক্তরূপে পূজা হইল। তাবপর যেইরূপ নামান হইয়াছিল ঠিক সেইরূপে অতি সন্তর্পণে সেই আসন হইতে দেবতাকে তুলিয়া ব্রহ্মতালুতে আপনাতেই বিলীন করিয়া সর্বাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা হইল।

সন্ধ্যা পূজার বিধানাদি এ শরীরের ক্রিয়ার অনেক বৎসর পরে লোকমুখে যেমন অবগত হওয়া গিয়াছিল, ঐ সময়েতে এক এক করিয়া সবই যথাযথ ভাবে আপনা হইতেই শরীর দিয়া হইয়া গিয়াছিল। শরীরটা যেন যন্ত্রের মত চালিত হইয়া কি এক বিচিত্র ভাবে সকল অনুষ্ঠান সমাধা করিয়াছিল।

এই কর্মাদি সমাপ্ত হইলে বেলা শেষ হইয়া গেল। দিনে আর খাওয়ার সময হইল না। রাত্রে পাকের আয়োজনাদি করিতে গেলাম। বাত্রে ভোলানাথকে খাওয়াইয়া শরীরটা আবার বসিল। খেয়াল হইতে লাগিল দিনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। পূর্বের মত শারীরিক ক্রিয়াদি হইবার পর পূজার আয়োজনাদি হইয়া গেল। নানা বীজ ও মন্ত্রাদি সহ নানারূপ দেবতার পূজা হইল। পরে সায়ং সন্ধ্যা শেষ করিবার মত ক্রিয়াদি হইল।

খাইযা উঠিতে দেখি ভোর হইবার আর দেরী নাই। একটু গড়াইয়া নিলাম। পরে যাইয়া ভোলানাথের সেবার সব গুছাইযা রাখিয়া আবার প্রাতঃকর্মের জন্য

যেমন বসে তেমনই বসিলাম। পূর্বের মত ক্রিয়াদি হইযা সন্ধ্যাব পর পূজাদি হইল। একেরই বহুরূপ ত। তাই বহুভাবে বহু রূপে পূজা হইল।

ঝুলন রাত্রি হইতে আরম্ভ হইয়া পরে কত মূর্তি লইযা কত কত রূপের প্রকাশ এবং দেব দেবীর রূপ ও কত ভাবের যে প্রকাশ হইল ইয়ত্তা নাই। বাহিরে কখনোও দেখা হয় নাই বা শোনা হয় নাই, এই প্রকারও অনেক মূর্তি ছিল।

পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে একটি বীজ ভিতরে জাগিত ও পরে তাহা মুখে ফুটিত। সঙ্গে সঙ্গে বীজাত্মক দেবতার রূপ ও গুণাদি প্রকাশ পাইত। সেই অনুযায়ী আসন, মুদ্রা, ধ্যান, প্রণাম প্রভৃতি এ শরীরের উপর হইয়া যাইত। এই রূপ ভাবে একে একে বহু মূর্ত প্রকাশাদি এ শরীরের উপর হইযাছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস, আসন, মুদ্রাদির অনেক রকম যাহা বাহিরেও কোথাও কাহারো কাহারো কাছে দেখা বা শোনা হয় নাই তাহার প্রকাশ। কিছু সময়েব জন্য যখন এদিক ওদিক চাহিতাম, কেবল সর্বত্র হলদে রং, কখনও গাঢ কখনও ফিকা এইরূপ দেখা যাইত। একটা সময় এইরূপ গিয়াছে। ইহার ভিতব একটা ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল - এ শরীবটা যেদিকে তাকাইত ও যখন যেভাবে পূজা ইত্যাদি হইত তৎভাব ও তৎস্বরূপ একমাত্র, এই প্রকাশ থাকিযা আবার অন্য ধারায় আরম্ভ হইত।

কোন সময় কোন মূর্তিকে দেখিয়া, এ সব দেবদেবী কাহারা - এই জিজ্ঞাসা আসিত। সে সব দেবদেবীর এদিকে পূজা ইত্যাদির বিশেষ প্রচলন নাই। তখনই আবার আপনার মুখ দিয়াই উত্তর বাহির হইত এবং আপনার কাছেই সুমীমাংসা ও সেই তত্ত্বাদির প্রকাশ হইত। বিনা বাহ্যিক উপচারে কেবল শরীর ও ক্রিয়াদির দ্বারাই আপনা হইতে আপনিই সবকিছু সৃষ্টি হইয়া যাইত। আবাব শুধু মন্ত্রের দ্বারাই পূজা ইত্যাদি হইযা যাইত। এসব সাধাবণ চিন্তা বা বিচারেব কোন কিছুই নয়। যাহা কিছু যেখানে প্রয়োজন তদ্রুপ আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যাইত।

ঝুলনের পর হইতে নিমন্ত্রণাদিতে আর যাওয়া হইত না। পরে আর একটি ভাব হইয়াছিল - কাহারো কিছু গ্রহণ নিষেধ। কিন্তু দেশাচার হিসাবে সধবাদের গ্রহণীয় জিনিষ, যেমন শাঁখা, সিন্দুর, পান ইত্যাদি যদি অপরের নিকট হইতে গ্রহণ না কবিতাম ভোলানাথ অসন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণে এইগুলি নিতাম। বাকবন্ধ অবস্থায়ও পাড়ার কাহাবো বাড়িতে নিমন্ত্রণাদি হইলে আমাকে

আগ্রহ করিয়া রান্না করিবার জন্য লইয়া যাইত, আমি যাইয়া সব করিয়া দিতাম। কিন্তু নিজে খাইতাম না এ জন্য অনেকে দুঃখিত হইত। পরে রান্নার জন্য এ শরীরকে ডাকা বন্ধ হইয়া গেল।

দীক্ষার খেলা ২/৩ মাস চলিতেছে - একবার এক সময়ে ভিতর হইতে কথা আসিল - এ ছায়া যখন দেখা যাইবে না তখন এ শরীর থাকিবে না। কেমন সুন্দর - আচ্ছা! তাহা হইলে ত এ শরীর, ছায়া না দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অদেখা - এ খেয়ালটা আসিল। কিছুদিন চলিল। পরে এক সময় হইল কি, হঠাৎ দেখা গেল - শরীরটি হাঁটিয়া যাইতেছে বা দাঁড়াইয়া আছে, নিজেই নিজে দেখিতেছে - একটা জ্যোতি, আলোর শরীর। অন্ধকারের মধ্যে সে আলো। সে আলোর দ্বারা অন্ধকারের মধ্যে বেশ চলা যাইতেছে, আবার দেখা গেল সূর্যের বা চন্দ্রের আলোতেও যেমন প্রদীপের আলো বা ইলেকট্রিক লাইট দেখা যায় - তেমন সূর্য চন্দ্রের আলোতে থাকিলেও এ শরীরের আলোর রূপটি বেশ দেখা যাইত। নিজেই নিজেকে দেখা যাইত। দাঁড়াইয়াও - যেদিকে তাকানো যাইত প্রমাণ মূর্তিতে এই আলোর দেহ দৃষ্টিপথে পড়িত। সেই আলোর রকমটাও যেন কিরূপ অবর্ণনীয় - কিছুর উপমাই চলে না।

চন্দ্র সূর্যের আলোতে যেমন শরীরের ছায়া - সেই ছায়ার পরিবর্তে ঐ আলোর রূপটিই দেখা যাইত। কোন সময় নীলাভ, কোন সময়ে পীতাভ, কোন সময় লালাভ ইত্যাদি রকমারিটাও। কখন শুভ্র জ্যোতিটাই প্রধান, কোন সময় অন্যটাও প্রাধান ইহাও হইত। এক জ্যোতি সব সময়। তখনই ভিতর হইতে সুমীমাংসা - আচ্ছা, তবে তো এই ছায়াও নাই, এই শরীরও নাই। এই তো সেই - দিব্য দেহ, চিন্ময়, তোমরা কত কি বল না, কত যে রকমারিটা। তখন এই দিকটাই আসিয়া গেল। মেঘ হইতে সূর্যোদযের মত কেমন একটা প্রকাশ, বিশ্বব্রহ্মান্ডময় সমগ্র এক জ্যোতি - সেই মহা জ্যোতি ইহাও প্রকাশ।

এ দেখার পূর্বে যখন যোগাদির ক্রিয়া হইত, সূর্যের দিকেও দাঁড়াইয়া তাকানোর খেয়াল হইত সাময়িক। বাহির হইতে ভিতরে তাকাইবার সঙ্গে সঙ্গে পরক্ষণে চক্ষু বুজিলে বা খুলিলে দেখা যাইত সূর্যকিরণের যে লাল রং বিশ্বব্রহ্মান্ডময় সেই লাল জ্যোতি। সন্ধ্যা ও সকাল বেলায় আলাদা আলাদা। এ সাধারণ প্রকাশ নয়, সবগুলিই পূর্ণাঙ্গীন। বলা যাইতেছে না কিরকমটা। বাহিবেব সমগ্র আলোটা

চক্ষু বুজিলে ভিতরে দেখা যাইত, অন্ধকাব ঘবে তাকাইলে সে ঘরেও দেখা যাইত, এমনও কখনও হইত। ইহার ভিতর যে কোন সূত্রে যে কোন দিকে একটু তাকানো যাইতেছে - চন্দ্র সূর্যের আলোর ভিতরে গাছপালা, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি সব কিছুর দিকে ঐ সূত্র সহ একটু স্থিরভাবে তাকাইলেই সেই প্রমাণমত আলো প্রধান হইয়া দেখা যাইত - শুভ্র জ্যোতির মত। কিছুক্ষণ থাকিয়া যাইত, এ আলোর দেখাটি বেশ দিন দিন চলে, সব সময় শূন্যেতে নানা রকম কত কি যন্ত্র, নানা আকারে কত কি দেখা যাইত।

পরিচয় দান

দীক্ষার খেলাটা হওয়ার ৫/৭ দিনের ভিতর একদিন, সেইদিন ছিল সোমবার। সকলে যেইরূপ বসে সেইরূপ প্রাতে বসিয়াছি। বিশেষ কিছু ক্রিয়ার লক্ষণ নাই। সামান্য ক্রিয়াদির পর খানিক অপেক্ষা করিয়া বান্না কবিতে গেলাম। নেশার মত ঢুলু ঢুলু ভাবে বসিয়াই বান্না শেষ করিলাম। সকলেব খাওযা দাওযাব পব আবার যেমন সন্ধ্যা করিতে বসে তেমন বসিলাম।

দিনে বসিবাব সময দরজা একটু টানিয়া রাখিতাম। ভোলানাথ ও মামাতো ভাই বাহির হইতে সেখানে আসিল। আপন ভাবেই সাধাবণ ঘোমটা দিযা বসিয়া আছি। মামাতো ভাই নিশিবাবু ভোলানাথকে বলিল - আপনি কিছু বলেন না? দীক্ষা হওয়ার পূর্বে এই সব ক্রিয়া কর্ম ভাল নয়। আপনি জিজ্ঞাসা করুন না, বসিয়া বসিয়া এই সব কি করিতেছে? এই কথা বলিয়া, সে বাহিরে গেল। আবার আসিযা ভোলানাথকে বলিল - জিজ্ঞাসা করুন না সে এইসব কি করে? তখন শারীরিক ক্রিয়াদি হইতেছিল। আপন ভাবে বসিযা আছি। মামাতো ভাই শরীরের এই সব কিছুই জানিত না। ভোলানাথ সহ আমাব ডান পাশে বসিয়া বার বার ঐরূপ বলিতেছে। আবার বলিল - জিজ্ঞাসা করুন না?

এই কথা বেশ খেয়ালের সহিত শুনা হইল। তখনই ঐ আসনে বসা অবস্থাতেই মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলাম - কিরে? কি জিজ্ঞাসা করবি? এত জোরের সহিত তেজপূর্ণ আওয়াজ ও দৃষ্টি এবং এইরূপ ভঙ্গি দেখিয়া মামাতো ভাই ব্যস্ত সহকারে পিছন দিকে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল, আর সন্ত্রস্ত ভাবে হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল - আপনি কে? এই শরীরের তৎমুহূর্তেই আবাব হাসি ও শান্ত ভাব আসিল। মুখ হইতে বাহির হইল - কি, ভয় পাইয়াছিস? না, না - ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। বলিতে বলিতে হাতখানি একটু সান্ত্বনার ভাবে

উঠিয়া গেল। তখন এই শরীর আসন অবস্থাতেই উত্তরমুখ হইতে পূর্বমুখী হইয়া গেল।

মামাতো ভাই বয়সে বড় ছিল। তাহাকে ঠাকুরভাই বলিয়া ডাকিতাম। দেশের প্রথানুযায়ী বড় ভাই বলিয়া তাহার সামনে কখনও ভোলানাথের সহিত কথা বলিতাম না। ঘোমটা দিয়া থাকিতাম। সেই সময়ে বাতাসে গায়ের কাপড় উড়াইয়া নিবার মত লজ্জা সঙ্কোচের ব্যবহারটা তন্মুহূর্তের জন্য একেবারে সরিয়া গিয়াছিল। বুকে পিঠেও কাপড় ভালমত ছিল না। এই শরীরটা বেশ খেলিতেছিল, আল্‌গা দ্বিতীয় ব্যক্তির মত।

ঠাকুরভাই ও ভোলানাথ যখন জিজ্ঞাসা করিল - আপনি কে? ধীরে ধীরে মুখ দিয়া বাহির হইল - **পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ**।[৮] স্ত্রী শরীর বলিয়া নারায়ণকে নারায়ণী, নিজেরা বিশেষরূপে সমালোচনা করিতে করিতে পুনরায় দুইজনেই রকমে রকমে 'আপনি কে' বারবার জিজ্ঞাসা করায় - 'মহাদেব' 'মহাদেবী', 'নারায়ণ' 'নারায়ণী' ইত্যাদি সব বাহির হইল।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল - তুমি যদি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং এই সবই হও, তবে এখন একটু অস্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতেছ কেন?

তখন বলা হইল - উপস্থিত মানব রূপে শরীরটা দেখাইতেছে কিনা তোমাদের কাছে, সেইমত ব্যবহারটার প্রকাশ খেলিতেছে।

ভোলানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল - তুমি কি করিতেছিলে?

বলা হইল - সন্ধ্যা পূজা হইতেছিল।

ভোলানাথ বলিল - তুমি ত দীক্ষা নাও নাই।

মুখে বাহির হইল - গত ঝুলনের রাত্রিতে তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

ভোলানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল - আমি কে?

উত্তর বাহির হইল - সেই তাই, মহাদেব।

আমার দীক্ষা কবে হইবে?

[৮] বিস্তারিত বিবরণ - দ্রষ্টব্য ঃ পবিশিষ্ট-২।

মুখ হইতে বাহির হইল - অগ্রহায়ণ মাসে।

ভোলানাথ বলিল - কোন তারিখ?

মুখ দিয়া বাহির হইল - ১৫ই তারিখ।[৯]

বার ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় সবই বলা হইল। আবার ঠাকুরভাই ও ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল - কে দীক্ষা দিবে?

নিজেকে দেখাইয়া দেওয়া হইল - আমি।

তখন তাহারা পঞ্জিকা আনাইয়া বার ও তারিখ মিলিয়াছে দেখিতে পাইল এবং সে তারিখ দীক্ষারও প্রশস্ত দিন। তখন উভয়ে পরামর্শ করিযা ভোলানাথ প্রশ্ন করিল - আচ্ছা বল দেখি সেইদিন কোন নক্ষত্র? তখন মুখে নক্ষত্রের নাম বাহির হইল। ভোলানাথ বুঝিতে পারিল না, কারণ সকল নক্ষত্রের নাম তাহার জানা ছিল না। তখন মুখে বাহির হইল - ঐ বাসার জানকীবাবু এখনও কাছারি যায় নাই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা তথায় যাইবে কিনা ইতস্ততঃ কবিতেছে, ইতিমধ্যে এই শরীর উঠিতে চায় এবং মুখে বাহির হয় - তবে আমি যাইয়া জানকীবাবুকে নিয়া আসি? এইরূপ এলোমেলো বেশে এই শরীর পাছে নিজেই তাহাকে ডাকিতে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ভোলানাথ নিজে গিয়াই জানকীবাবুকে ডাকিয়া আনিল।

জানকীবাবু আসিয়া বলিল - তিনি ঠিক নক্ষত্রই বলিয়াছেন। এই সব প্রসঙ্গে মুখ হইতে রোহিণী নক্ষত্রের নাম বাহির হইলে এই সব কথা নিযা তাহাদের নানা রকম জিজ্ঞাসা ও নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ঘন্টাব পব ঘন্টা চলিতেছিল। তখন এক সময়েতে তাহাদের 'রোহিণী নক্ষত্র কে' এই কথা জিজ্ঞাসায় মুখ হইতে ইহাও বাহির হইয়াছিল - রোহিণী নক্ষত্র যে, এও সেই-ই।

জানকীবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিল - আপনি কে?

তখন শান্তভাবে আস্তে আস্তে বাহিব হইল - পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

তখন জানকীবাবু বলিল - আপনি শয়তান। অনেক পরে আবার বলিল - আপনি শয়তান, শয়তানী।

[৯] ১লা ডিসেম্বর ১৯২২, শুক্রবাব।

তখন এই শরীরের খুব হাসি আসিতে লাগিল। আর মুখে বাহির হইল - যাহা বলিয়াছি, তাহাই। তোমরা যে যাহাই বল না কেন। তোমরা ত পরীক্ষা করিতেছ।

তখন আবার বলে - আপনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাহাব প্রমাণ কি?

মুখ হইতে বাহির হইল - দেখিতে চাও? ইহা বলিতে বলিতেই এ শরীরের কেমন একটা সুন্দর ভাব হইল। জানকীবাবু ও ঠাকুরভাই একটু দূরে আলোচনা করিতে লাগিল। এ শরীর ভোলানাথকে নিকটে বসিতে বলিল। একটি মন্ত্রের সহিত হাতের দ্বারা ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করা হইল। ভোলানাথ 'ওঁ' শব্দ করিতে করিতে আপনা হইতে কলের পুতুলের মত স্থির ভাবে মাটিতে আসন করিয়া বসিয়া গেল। প্রস্তর মূর্তির মত অর্ধ উন্মীলিত ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া এত অচল ও শান্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছিল যে ইতিমধ্যে স্কুল হইতে আশু আসিয়া অনেক সময় পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ শরীর বেশ স্থির ভাবে বসিয়া তামাসা দেখার ন্যায় দেখিতেছে।

ঠাকুরভাই জানকীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিল। জানকীবাবু আসিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল - আচ্ছা! এখন রমণীবাবুর (ভোলানাথ) স্বাভাবিক অবস্থা হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। কিছুক্ষণ পর এ শরীর আবার ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিলে ক্রমে ক্রমে তাহারা যেরূপ চাহিয়াছিল প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ভোলানাথ বলিয়াছিল - আমি এতক্ষণ যে কি আনন্দে কোথায় ছিলাম তাহা অবর্ণনীয়। বেলা প্রায় শেষ হইল, আবার লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কাপড়ের মত পরিধান করিয়া সংসার কর্মে ব্যাপৃত।

এই স্থানে মাকে প্রশ্ন করা হইল - আচ্ছা, ভোলানাথের যে এই অবস্থা - ইহার পরিণামে কী হইতে পারিত? এ-ই কি? উত্তরে মা - এ তো স্পর্শ। এ-ই কেন, স্বরূপ স্থিতির দিক পূরণ। এ তো আর ভেলকি দেখানো নয়।

আবার বিশেষ কান্নাকাটি ও আবদারে, তাহারা বারবার হাত জোড় করিয়া যখন বলিতে লাগিল - রমণীবাবুকে স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরাইয়া আনিয়া দিন, তখন আবার স্বাভাবিকে আসিয়াও তাহার ভাব ভঙ্গীতে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও সব ব্যক্ত করিতে পারিল কি? সব তো ব্যক্তও হয় না, ও যে অনাময় অব্যক্ত। এই স্পর্শ - মূলে সাময়িকই বুঝিও না। দেখ ঐ স্থিতিতেও

এই জগতের তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে এইটি মনে রাখিও।

এই জানকীবাবুই উষাদিদির স্বামী, বড় ধীর ও সরল প্রকৃতির লোক। পরে শুনিলাম সে আমাকে চটাইবার জন্য ঐ সময়তে বারবার শয়তানী বলিয়াছিল। সে ইহাও নাকি মনে করিয়াছিল যে মানুষের উপব যেমন দেবতার আবেশ হয় এই শরীরের বুঝি সেইরূপ হইয়াছিল। পরে তাহার এই সন্দেহ নির্মূল হইয়া গিয়াছিল।

তাহার সামনে এই শরীব পূর্বে কখনও বাহির হয় নাই। সেইদিন প্রথম দেখা ও আলাপ। পরে ঢাকা আশ্রমে এই শরীরের নিকট আসিয়া ঐ সকল তাহার মনের ভুল ভ্রান্তি বলিযা হাসিত ও আনন্দ কবিত। এই সব ভাব দেখিযা তিনি নাকি অবাক ও আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। পবে তাহার এই শবীবেব উপব কেমন একটা অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিশ্বাসের ভাব আসিয়াছিল।

প্রঃ - মা। এই যে 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' শব্দটি শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল, এখানে এ প্রশ্ন ত আসে যে ইহা কি সাধনলব্ধ স্থিতিব কথা? না, ঐ চরম পরম স্বয়ং? ইহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে উত্তবে মা বলিলেন - আবে। এই ছোট্ট মেয়েটা ত যা-তা। তাই-ত প্রকাশ। সাধনার গতিতে কি এই কথা? তোরা চতুর্ভূজ মূর্তিই কি কেবল ভাবছিস্? একটু পরেই গম্ভীর স্বরে বলিলেন - **আমাকে জানিতে চেষ্টা কর - যেখানে নির্দ্বন্দ্ব। এ মন দিয়া কি দ্বন্দ্ব মিটাইবি?**

সাধনার খেলায় মা

ব্রহ্ম বা দেব দেবী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব জানা ছিল না। কাহাবো মুখে শোনাও নাই বা কোন পুস্তকেও পড়া নাই। এই প্রথম এ মুখে বাহির হওযা ত। পূর্বে যেমন আপন ভাবেই পূজা মুদ্রা ও আসনাদি শবীবে প্রকাশ পাইয়াছে ইহাও তদ্রূপ। তিথি নক্ষত্র বা পঞ্জিকারও কোন দিন কোন সন্ধান ছিল না। ভোলানাথ ও মামাতো ভাই যখন ঘরে প্রবেশ করিযাছিল সেই সময়ে এই শরীরে সন্ধ্যা পূজার ভাবে পূজাদির ক্রিয়া হইতেছিল।

রাত্রিতে সকলে খাওয়ার পর আবার বসিয়াছি। শরীবের ক্রিয়াদির পর আসনে স্থির হইয়া বসিলে পূর্বের মত মাটিতে হাত দিয়া আর একটি নূতন রকমেব আসন হইল। তাহার উপর বসিলাম। সন্ধ্যা পূজার আয়োজনাদি হইল। সেইদিন

দেখিলাম শরীরে আসন করিয়া বসা ও পূজা ইত্যাদি সবই নূতন রকমের হইল। তাহার পর হইতে একবেলা যে আসন হইত অন্য বেলায় তাহা হইত না। পূজা জপ ও বিভিন্ন প্রকার হইত। রূপ, গুণ, বীজ, ধ্যান ইত্যাদি লইয়া এক এক সময় আলাদা আলাদা দেবতা। প্রথম রাত্রির বীজমন্ত্রটি সর্বদা স্মরণ থাকিত। কিন্তু নিয়মিতভাবে কর ধরিয়া জপ করার ভাব বন্ধ হইয়া গেল।

সব সময়ই কিন্তু একবার যাহা পূর্ণাঙ্গীন হইত, পরে আর তাহা হইত না। আসনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ মন্ত্র ও স্তোত্রাদি মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। এক একটি নূতন আসন হইত আর চোখ বুজিয়া যাইত। আর আপন হাত দিয়া আপন মাথায় পূজা হইয়া যাইত। খেয়াল হইত - আমিই পূজক, আমিই তন্ত্রধারক, আমিই পূজ্য দেবতা ও জিজ্ঞাসু, আমিই দর্শক ও শ্রোতা। শরীরের এই প্রকারের প্রত্যেক ভাবগুলি একাদিক্রমে দিনে দিনে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিত।

বৈষ্ণবেরা মন্ত্রাদির সহিত যেভাবে তিলকাদি দেয় বা শাক্ত ও শৈবেরা যেরূপ সিন্দুর, কুমকুম, চন্দনাদি লাগায় ব্রহ্মচারীরা যেইরূপ বিভূতি চিহ্নাদিতে ভূষিত হয়, যথাযথ স্থানে এবং যথাসময়ে এইগুলিও এই শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। সময়মত আবার কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্রিয়াদি ও লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল, পূর্ণাঙ্গীন মন্ত্র সহ।

তখনকার ভাবের গতি ভাষায় বোঝান যায় না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে বহুবিধ দেবরূপের পূজা ইত্যাদি প্রকাশ এই শবীরে হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে ঐ সময় কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কখনও কখনও লজ্জাবতী লতা যেইরূপ আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া যায় সেইরূপ চুপ হইয়া যাইতাম। কেহ দেখিতে গেলেও ক্রিয়াদি সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরের দিকে বন্ধ হইয়া যাইত। **এইরূপে আপনা আপনি সব বিষয়ই গোপন হইত।** আবার কখনও যেখানে যতটুকু প্রকাশ হওয়া দরকার ততটুকু স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িত।

এ শরীরে যখন পূজাদি আরম্ভ হইল, তখন দেখা গিযাছে, যে যে দেবতারূপের পূজা, সেই আসন মুদ্রাদি হইয়া তৎস্বরূপে পূজাদি হইত। পূজা আরম্ভেরও পূর্বেও ক্রিয়া চলিত। পূজার সময় ত চলিতই, পূজান্তেও আবার যেইভাবে থাকা দরকার তাহাও হইত। যদিও বিভিন্ন রকম।

এই শরীরের উপর যখনই ঐরূপ পূজাদি হইত, শরীরের আসন ও দেবদেবীরা যে যে ভাব ও আসনে প্রকাশিত তাহাই হইয়া যাইত। দেবতা পূজাদির পূর্বে

এ শরীরে যে আসন প্রকাশ থাকিত তাহার সহিত উপরোক্ত আসনাদি বিভিন্ন। কোন্ দেবতারা কি কি গুণ ও কাহার কোন রূপ, কি ভাব তাহাই হইয়া যাইত এবং সম্পূর্ণ তৎস্বরূপে প্রকাশ হইত।

এ শরীর ঐ সময় একা ঘরে ঐ ক্রিযাদি নিযা থাকিত বলিয়া স্বাভাবিক লোকসঙ্গ প্রায় না হওয়ার দরুন বাসায় অন্য লোকের সমাগম প্রাযই হইত না। যখন সাংসারিক কাজ কর্ম করিতে যাওয়া হইত, শরীরের গতি হাঁটা চলা দৃষ্টি ঐ সব ক্রিয়ার সময়ে যে যে স্থিতি, সেইভাবে প্রকাশ থাকিত। আবার বিশেষ ভাবের কথা, কেহ যেন বুঝিতে না পারে সেইরূপ নিজের সংবরণ ভাবটাও তখন প্রকাশ থাকিত। অর্থাৎ যে স্থিতিতে যতটুকু স্বাধীন শক্তির প্রকাশ হওয়া তাহার ক্রিয়া দেখা যাইত।

বাজিতপুরে সাধনার এই খেলাটা যখন চলিতেছিল তখন ইহার ভিতরে প্রথম দেখিতাম একটি শির শির ভাব নাকের দুই শিরার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে উর্ধ্বদিকে যাইয়া ভ্রুর মধ্যে সামান্য কতটুকু কপাল জড়াইয়া স্থিব হইয়া আছে। ধীরে ধীরে উহা তালুতে যাইত ও একটু ভার ভার বোধ হইত। শরীব যেন খেয়াল করিযা হাতে সংসারের কোন কাজকর্ম করিতে পারিতেছে না, যেন ক্রমে ক্রমে টলিয়া যাইতেছে, এইরূপ লাগিত। তখন এ শবীব যাইযা তাড়াতাড়ি স্নান করিযা বসিত, শরীরের ভাব যেন ঝিমু ঝিমু স্থির। কতক্ষণ বসিলে শবীরটা আপনা হইতে শুইয়া পড়িত। উঠিলে দেখা যাইত বাহিরেব ভাবে ও কর্মে কোন আকর্ষণের প্রকাশ নাই। যেদিকে দেখি যেন ভোলা ভোলা আলগা আলগা ভাব। ইহাতে বুঝিবে যে ভিতরের গতি ও ভাবের প্রবণতায় বাহিরের কর্মভাবগুলি কমাইয়া দেয়। আর **বাহিরের সব ভাব না ভুলিলে অন্তর্জগতের দরজা পূর্ণভাবে খোলে না।**

ষটচক্রের গ্রন্থি-চক্রাদি

এই যে ষটচক্রেব গ্রন্থি-চক্রাদি[১০] আছে বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থিস্থলে যে বীজাদি নিহিত রহিয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, মূর্তি, গুণ ও রূপাদি সহ আছে ত। কিন্তু জাগতিক হিসাবে জীবেরা যে যে সংস্কার নিয়া আসে, কি আসিবে, সেই সংস্কার অনুযায়ী তাহাদের ততটুকু সেই সেই মূর্তরূপাদি প্রকাশ।

[১০] দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট-৩।

তদনুযায়ী ততটুকু ক্রিয়াও তাহাদের হয়। সেই ক্রিয়াদি পূর্ণ হইলে ও দেবতা পূজা ও দেবভাব সংস্কারটি পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক ভাবের নিজের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের যে আকর্ষণাদি খন্ড খন্ড মূর্ত ভাবের প্রকাশ ও পূজা ইত্যাদির আকর্ষণ এবং জাগতিক দেহাত্ম বুদ্ধি নির্মূল হইয়া ঐ এক মহান ভাব সমুদ্রে ডুব দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ক্রমে ক্রমে মূর্ত ও সমগ্র অমূর্ত তত্ত্বের সুমীমাংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে যাওয়া।

জীবন্ত দেবদেবীর প্রকাশ

এইরূপে দিবারাত্রি নানাভাবে সন্ধ্যা পূজাদির ক্রিয়ায় আরও কয়েকদিন চলিয়া গেল। একদিন ক্রিয়াদি করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর দেখি আর বিশেষ কিছু হয় না। তখন খেয়ালে আসিল আজিকার মত কাজ শেষ হইয়াছে। উঠিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া বিছানায় দুই এক মিনিটের জন্য একটু গড়াইলাম। ভোর হইলে সংসারের কাজকর্ম সারিয়া আবার বসিয়া গেলাম। সেদিন দেখিলাম নিত্য শারীরিক ক্রিয়াদির পর একটি বিশেষ আসনে স্থির ভাবে বসিয়া গেলাম। শরীর যেন অবশ ঢুলু ঢুলু। শুইবার ভাব হইল, সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ শুইবার পর দেখি এক সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে ঠিক মানুষের মত এক জীবন্ত দেবীমূর্তি। সেই মূর্তিটি সিংহবাহিনী। ইহার পর যেখানে বসা হইত প্রায়ই দেখা যাইত, ঐ সিংহবাহিনী মূর্তিটি এ শরীরের কাছে বাম পাশে সিংহের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদিন পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে অসাড় ভাবে তথায় পড়িয়া রহিলাম। উঠিলে দেখিলাম বেলা হইয়াছে। রান্না করিলাম, সকলকে খাওয়াইয়া আবার বসিলাম।

কেমন আর একটা নূতন ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। নানা ক্রিয়াদির পব একটু চুপচাপ পড়িয়া থাকার ভাব হইল। শুইয়া শুইয়া দেখিতেছি যে আবাব একটি দালানে জীবন্ত মানুষের সমান দেব দেবীর অনেক মূর্তি। লক্ষণে ভিতরে প্রকাশ হইল ইহারা দেবতা। প্রচলিত যে মহাদেব, দূর্গা, সরস্বতী, লক্ষী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ইত্যাদি আছে তাহাদেরও নানা রূপাদিই। যেমন লক্ষীনারায়ণ, শিবপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম এই সব যুগল রূপাদিও কত দেখা গেল। সাঙ্কেতিক কথার ভাব ও ইঙ্গিতাদি জাগ্রতভাবে প্রকাশ ছিল। দেখা গেল ক্রমে ক্রমে এক একটি ঐ স্থানে মিলিয়া গেল। যেন তামাসা দেখিবার মত এই ঘটনা দেখিলাম। শরীরের

দিকে কোন খেয়াল একেবারে নাই। পরে দেখি একটা নাট মন্দিরের চারিদিকে দেবালয়। ইহার ভিতর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। ঐ স্থানটি যেন একটি আনন্দধাম। মূর্তিগুলিও ওখানে জীবন্ত প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের শরীর হইতে অলৌকিক শক্তি, তেজ, সৌন্দর্য বিকশিত হইতেছে। এইরূপ অনেক সময় কাটিয়া গেল। পরে দেখি সেই মূর্তিগুলি ও মন্দিরাদি সেইখানেই মিলিয়া গেল। শরীরের অবশ অবস্থা। সর্বাঙ্গ ঢুলু ঢুলু।

এইরূপ যখন দেবতাদি জীবন্ত দেখা হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মন্ত্রাদিও মুখে উচ্চারিত হইত এবং তৎস্বরূপে গুণাদিও প্রকাশ পাইত। যথা সময়ে বরদানাদিও কোথায় কিরূপ হয়, তাহারও প্রকাশ হইত। অর্থাৎ বরদানে অধিকার প্রকাশ হইত। যাহারা সাধন করিয়া এই অবস্থা লাভ কবে তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকে নানা মূর্তরূপাদির দেবতা-সিদ্ধ অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সাধকের সংস্কার অনুযাযী বা কামনা-বাসনা অনুযায়ী বরলাভ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অনেক কথা আছে।

অন্য আর একদিন যখন এইরূপ হয়, তখন উঠিলে দেখি শরীর, সেই বিবিধ মূর্তিভাবে পরিপূর্ণ এবং তাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল। কোন কোন সময় ইহারও প্রকাশ হইত - নানা দেবদেবী এবং আরও কত সব, প্রসন্ন মনে এই শরীরের কাছে দাঁড়াইয়া এই শরীরটাকে দেখিতেছে। সেই দেখিবার ভঙ্গি ও ভাব অবর্ণনীয়। এ জাতীয় কত রকমটাই যে।

রাত্রিতে পূর্বের মতই বসিয়াছি। ক্রিয়াদির পরে সর্বাঙ্গ যেন অবশ। শুইয়া পড়িলাম। দেখি কি একটা বাড়িতে এ শরীর চলিতে চলিতে গিয়াছে। তথায় দেখিতেছি এক জায়গায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, কালী, শিবদূর্গা, সীতাবাম ইত্যাদি সব নানা মূর্তি স্থাপিত আছে। কিছু পরে সেখান হইতে এ শরীব আসিযা পড়িল। এ শরীবটা যেমন এ বাড়ি ও বাড়ি পূর্বে যাওয়া আসা কবিত এবং যেখানে যাহা আছে দেখাশোনা করিত, শরীরটা এ ভাবে একস্থানে পড়িযা থাকিযা অন্য স্থানে যাইয়া দেখা শোনার প্রকাশ। সে রাত্রিতে নানা রকম শবীরেব ভাব প্রকাশ হইল। যোগক্রিয়ার প্রকাশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত খালি মাটিতে পড়িযা বহিলাম। এইভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হইলে উঠিয়া খাইতে গেলাম, দেখি বাত্রি প্রায় শেষ।

প্রতিবেশীদের উপদেশ

একদিন দুপুর বেলা ক্রিয়াদির পরে, চুপ করিয়া বসিয়া আছি। পাড়া হইতে কয়েকজন মেয়ে মানুষ আসিয়া দরজা ধাক্কাইতে লাগিল। দরজা খুলিয়া দিয়া আবার বসিলাম। যাহারা আসিয়াছে তাহারা এই শরীরটাকে ছোট বোনের মত দেখিত, আমি তাহাদিগকে দিদি ডাকিতাম। তাহারা শুনিয়াছে যে আমি দরজা বন্ধ করিয়া থাকি, আহার নিদ্রা নাই। কোন খারাপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, কালের দৃষ্টি বা মহাকালের দৃষ্টি ইত্যাদি। ইহা ভাবিয়া এ কারণে আমার কাছে কেহ ভয়ে আসে না। কারণ পরে তাহাদের উপরও পাছে দেবতার দৃষ্টি পড়িতে পারে। এ বাসা হইতে অন্য এক বাসায় পুকুর ঘাটে যাওয়ার যে রাস্তা ছিল, তাহারা ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া আসা করিত। সেই হেতু আমাদের বাসা একান্ত হইয়াছিল ও এ শরীরের আপনভাবে থাকার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

যাহারা আসিয়াছিল তাহারা নানা রূপ উপদেশ দিল। বলিল - আমরা কি দীক্ষা নিই নাই ও সন্ধ্যা করি না? অসুস্থ হইলে ত আমরা কিছু খাইয়াও সন্ধ্যা করি, আপনিও কিছু খাইয়া বসিবেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল - আপনি কি পাইয়াছেন? এ রকম হইয়াছে কেন? হাসিলাম, বিশেষ কিছু মুখে আসিল না।[১১] একজন আমাকে বলিল - আপনি স্বামীর আদেশ নিয়া খাইবেন, পরে এই সব করিবেন। আমি বলিলাম - তিনি যদি স্বেচ্ছায় আমাকে বলেন তুমি খাইয়া কর, তবেই আমি তাহা চেষ্টা করিব। সে আরো বলিল - আমার গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা নিলে, তিনি সাক্ষাৎ সিদ্ধিলাভ করাইয়া দিতে পারেন। আরো কত কি বলিল। আমি বিশেষ উত্তর প্রত্যুত্তর না করাতে তাহারা চলিয়া গেল।

আমি উঠিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিতে গেলাম। পরে ভোলানাথকে খাওয়াইলাম। তিনি খাইতে বসিয়া নিজে হইতেই বলিয়া উঠিলেন - কাল হইতে তুমি দিনে কিছুক্ষণ সন্ধ্যাপূজা করিয়া খাইবে, বাকি কর্মাদি পরে করিও। ইহা শুনিযা পূর্বোক্ত স্ত্রী লোকটির সহিত যাহা আলাপ হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন - আমার আপনা হইতেই একথা মনে উঠিতেছিল, কাল হইতে সে

[১১] মন যখন সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকে তখন মানুষ আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় না - ইহাই আমাদের অজ্ঞান। সব সাধনার মূলে উদ্দেশ্য হইল - 'নিজেকে জানা, নিজেকে পাওযা', তখন বর্হিজগতের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যায।

ভাবে ব্যবস্থা করিও। আমি বলিলাম - আচ্ছা। তখন একটা সাময়িক ভাব হইয়াছিল যে ভোলানাথ আপনা হইতে বলিলে যদি অনুকূল হয় তবেই। ভোলানাথ এ শরীরের কাছে শুনিয়া যেন খাওয়ার কথা না বলেন। আর একটা খেয়াল আসিত ত্যাগের দিকটা রাখিয়া যদি সেই জাতীয় খাবার আসে তবেই গ্রহণ নতুবা নয়। অর্থাৎ যে নিয়ম বাঁধা হইল, সেই নিয়মের মধ্যে হইলেই খাওয়া তাহা না হইলে খাওয়াই নয়।

সাধনার খেলায় একটি কুকুর

এই সব ভাবের সময়ে আর এক সহায ছিল একটি কুকুব।[১২] যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বাত্রিতে দেখিতাম যে পর্যন্ত এ শবীর ক্রিয়াদি শেষ করিযা বাহিরে না আসিত সে ঘরের দরজায় বসিয়া থাকিত। অন্য সকলে ঘুমাইত, কেবল সে এই শরীরের সঙ্গে সারারাত জাগিয়া থাকিত। জিনিষপত্র খোলা থাকিলে বিড়াল প্রভৃতি হইতে পাহারা দিত।

বাহ্যিক পূজার খেয়াল নাই

সন্ধ্যা পূজায় বাহিরের দিক দিয়া ফুল, বেলপাতা, চন্দন, কোশাকুশি, পুষ্প পাত্র, জল, বাতি ইত্যাদি ব্যবহার কবিবার খেযাল আসিত না। এই উপলক্ষ্যে সমুদয় কাজ আপনা হইতেই দৃষ্টি প্রকাশ হইয়া সম্পাদিত হইত।

একদিন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভোলানাথ জপ কবিতে বসিলেন। তাঁহার জন্যে কোশাকুশির ব্যবস্থা করিলাম। পাশে আমিও বসিলাম। ভোলানাথ আচমন করিয়া কোশাকুশিটি আমার দিকে দিল। কিন্তু বাহ্যিক জলের দ্বাবা আচমনেব ভাব হইল না।

এই সব যখন হইতেছিল ঊষাদিদিও খুব কমই আসিত। কারণ তাহার স্বামীর ইচ্ছা নয় যে এই অবস্থায় আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে। পরে ঢাকা আশ্রমে আসিয়া স্বামী-স্ত্রী এই সব বলিয়া হাসিয়া আনন্দ করিত।

[১২] মা প্রকাশ কবিয়াছিলেন যে এই কুকুরটি সাধাবণ আত্মা ছিল না। জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম কবিবাব জন্য ইহাই শেষ জন্ম নিয়া ছিল - মোতি নামে পবিচিত। সোলন-এ, ১৯৫৫ এ জুন-জুলাই মাসে সে নিয়মিত শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনের জন্য আসিত। বৈকালে সোলন-এব বাজপ্রাসাদেব সংলগ্ন খোলা টেনিস কোর্টে মা যখন হাঁটিযা বেড়াইতেন সে তখন পিছনে অথবা পাশে মাকে স্পর্শ না কবিয সাথে সাথে চলিত এবং অতি উৎসাহেব সহিত প্রসাদ - বেশিবভাগ সময বসগোল্লা - গ্রহণ কবিত।

সংসার আশ্রমে পতি-সেবা

একদিন প্রাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছি। ভোলানাথ কাছারিতে যাইবেন আমি প্রণাম করিলাম। অ, "র নিয়ম ছিল তাঁহাকে নিত্য প্রণাম করা, প্রত্যহ তাঁহার চরণামৃত নিতাম, তাহা নিলাম। এই সব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চরণামৃত পূর্ব হইতে কখনও রাখা থাকিত। কর্মশেষে ঐ চরণামৃত গ্রহণ করিয়া খাওয়া দাওয়া হইত। ইহার ভিতরে বেখেয়ালে যেদিন চরণামৃত রাখা হইত না, সেইদিন ভোলানাথ কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহা গ্রহণ করিয়া তবে আহারাদি হইত।

পতি দেবতা হিসাবে সংসারাশ্রমে এইরূপ করিতে হয়। হিন্দুসমাজের অনুশাসন বা নিয়ম। পবে হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম - আমি তোমাকে আরতি করিব, তুমি একটু এইখানে থাক। এই বলিতে বলিতে শরীরের কেমন একটু অস্বাভাবিক অবস্থা হইল। সর্ব শরীর হেলিয়া দুলিয়া ভাব বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়াইয়া গড়াইয়া বসিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ আরতির মত করিলাম। তিনি কাছারি চলিয়া গেলেন।

এ শরীর কাজে বসিল। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতে হইতে মাটিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পদ্মাসন অবস্থায় মাথা পিঠের দিকে যাইয়া ও বুক উঁচু হইয়া ধনুর মত একটি অসাধারণ আসন হইয়া গেল।[১২] মাথাটি এপাশ ওপাশ ও ঊর্ধ্বদিকে ঘুরিয়াছিল এবং জিহ্বাও এপাশ ওপাশ ঘুবিয়া এ মাথার উপব দিয়া তিন বার মাটি স্পর্শ করিয়াছিল। এই অবস্থায় হাত দুইখানি মাথার দিক হইতে ঘুরিয়া পদ্মাসন ছুঁইয়া আসিয়া বুকের মাঝখানে মুদ্রাদির দ্বারা পূজার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সাধনার বিভিন্ন অবস্থা বা প্রক্রিয়া পূজা হওয়ার পবে দেখিলাম শরীর একইভাবে আসনস্থ আছে। খেয়ালে আসিল, এ শরীর স্বাভাবিক কি রূপে হইবে? কেননা নড়িলেই কোথাও মচকাইয়া হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিবার একটু পরেই দেখি, শ্বাসের গতি ক্রমে পরিবর্তন হইতে হইতে শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে লাগিল। এক একটি ক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে বেশ একটু সময় লাগিয়াছিল। দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সেদিনও আর খাওয়া হইল না। কেবল আদেশ পালনের জন্য সামান্য একটু চরণামৃত মুখে দিলাম। ঘরে বাতি দিলাম, ভোলানাথের পা ধোয়ার জল ইত্যাদি ঠিক করিয়া রান্না করিতে গেলাম।

[১৩] এক অত্যন্ত কঠিন আসন - মৎস্যাসনের একটি বিস্তারিত রূপ।

ভোলানাথ আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া এ শরীরের আরতি করিবার ভাব আবার জাগিল। তাঁহার উপর আরতি করিলাম। পরে তিনি আহারাদি করিলেন এবং আমাকে খাইতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ পালনের জন্য খাইলাম।

আবার আসিয়া বসিয়াছি, দেখিলাম শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ভাল হয় নাই, খুব জোর লাগে। কেমন একটা চাপা চাপা বোধ হয়। শরীবটা অস্থির এবং সবই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। ভোলানাথকে বলিলাম - বোধ হয় আহাব করাতে এইরূপ হইল। তিনি বলিলেন - তোমার যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই কাল হইতে করিও। তোমার এইসব যে কি আরম্ভ হইল কিছুই বুঝি না। মানুষেও নানা রূপ বলাবলি করে। বলে আমি স্ত্রৈণ। তোমাকে বলিলে পাছে কিছু খারাপ হয় এইজন্য এইসব বলিও না। কি যে করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। এ শরীর বলিল - তুমি যাহা বল, যতটুকু পারি তাহাই আমি কবিতে চেষ্টা করিব। তবে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে এইসব খারাপ কিছু নয়, ইহা নিশ্চয জানিও। তুমি বাধা দিলে, ভাল কি খারাপ হয তাহা তোমাকে বলা আসিতেছে না। এইসব শুনিয়া তিনি আরও চিন্তায় পড়িয়া গেলেন।

আমি যে সারাদিন খাই না অথচ সংসাবের কাজকর্ম সবই চালাই, ইহাতে কেহ কেহ বলে - তিনি যে স্নান করিতে যাইয়া লক্ষীর আসনের জন্য ঘটি ভরিয়া জল নিয়া আসেন আর দরজা বন্ধ করিয়া বসেন, নিশ্চযই ঐ ঘটি হইতে জল খাইয়া পিপাসা নিবৃত্ত করেন। নতুবা এইভাবে কিছুই না খাইযা থাকেন কি করিয়া? আরও কত রকমের কথা। আমি শুনি আর হাসি। যাঁহাব ধাবণায যতটুকু আসে ততটুকুই ত বলিবে। কাহারো কোন দোষ নাই।

ভয়ের স্বরূপ

একবার খেয়াল আসিল যে সময়ে ৩/৪ দিন স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যা আহ্নিক করে না আমিও করিব না। দেখিতে পাইলাম সে অবস্থার মধ্যেও শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও পূজাদি ভিতর ভিতর সবই চলিল। বাহিরে আসনাদি বা অঙ্গাদি সঞ্চালন তেমন ভাবে হইল না মাত্র। শরীরে যেন সর্বক্ষণ নেশার মত ভাব থাকিত।

এ সময় একদিন রাত্রে প্রত্যক্ষ একটি কালো বিরাট মূর্তি গায়ের কাছে দেখিলাম। সাধারণে এইরূপ কেহ দেখিলে ভয পাইত। কিন্তু এ শরীবেব এমনি গতি, ভয়ের কথা খেযাল হইতেই - সে কে? কাহাকে ভয় দেখায? একেবই

ত ভিন্ন রূপ। **এই ভয় ত সংস্কারের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।** অল্পক্ষণ থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই মূর্তিটি সেই স্থানেই মিলাইয়া গিয়াছিল।

সকালে স্নান করিয়া বসিতে যাইয়া খেয়াল হইল, আজও সন্ধ্যা হইতে পারে না শাস্ত্র নিয়মে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়াল আসিল যে তাঁহার নামে ও তাঁহার চিন্তায় শরীরে আবার পবিত্রতা অপবিত্রতা কি? তাঁহার জপ কর্ম যেখানে - তিনি ত নিত্য সত্য, নিত্য শুদ্ধ। এই সব ভাবিতে ভাবিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখি কি পূর্বের মত ক্রিয়াদি ও পূজাদি বাহিরে ভিতরে হইল। বাস্তবিক অন্তঃক্রিয়া আরম্ভ হইলে অবাধ গতিতে ঐ প্রকাশ স্বাভাবিক।

ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্ময় বাণলিঙ্গ শিব

আবার চোখ বুজিয়াছি ভ্রূর মধ্যখানে একটি ছোট বাণলিঙ্গ শিবের আকার দেখা গেল। যেই দিকে ঘুরি সেই দিকেই ঐটি স্থির দেখিতে পাই। বাদামের মত বড়, আগুনের রং। চক্ষু মেলিয়াও সেইরূপ দেখি। ক্রমে সেই আকারের জ্যোতিটি দিনের বেলায় প্রজ্বলিত, সেই উজ্বল অগ্নি রংয়েই চোখের সামনে আসিয়া ভ্রূমধ্যে মিলাইয়া গেল। ইহার মধ্যেও সেই যে কিরূপ প্রকাশ, প্রত্যক্ষ কিন্তু। তখন দেহটি স্থির, ধীর, গম্ভীর, শান্ত। কেমনই বলা যায় না। আবার যখন খেয়াল হইত তখনই দেখা যাইত। এইরূপে বেলা প্রায় শেষ হইল। রান্নাদি করিয়া ভোলানাথকে খাওয়ান হইলে, রাত্রিতে আবার বসিলে আগেকার মত সামান্য কর্মাদিতে কাটিয়া গেল।

পরদিন অনেক বেলা হইলে রান্না ও ভোলানাথের খাওয়া শেষ হইলে বসা হইল। সেইদিন নিয়মিত ক্রিয়াদি হইয়া গেল। ভ্রূমধ্যে একটি বড় আলো ফুটিয়া উঠিল। ঐটি লক্ষ্য করিতে করিতে এক আসনে অনেক সময় কাটিযা গেল। পরে চোখ খুলিয়া গেলে যেদিকে চাওয়া হয়, দেখা যায় কপালে সেই আলো স্থির রহিয়াছে। এইরূপে অনেকক্ষণ পরে ওইখানেই অদৃশ্য। রাত্রিতে বসিলে আবার সে আলোটি ভ্রূমধ্যে উদয় হইল। ক্রমশঃ উহা হালকা রং হইতে লাগিল এবং উহাব চারিদিকে রিংএর মত খানিকটা, ধর না কখনও লাল, কখনও সাদা বা হলদে বা কালো ইত্যাদি এইরূপ নানা রং এর খেলা অনেকক্ষণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই শরীরটা কতক্ষণের জন্য অসাড, অজ্ঞান নয়, এইরূপ হইয়া রহিল। এইরূপ নানা ভাবে রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় সব সময় যেই দিকে তাকাই - মানুষ, গাড়ি, বাড়ি, ভালমন্দ যাহাই দেখি না কেন প্রত্যেকটার চারিদিকে তেজ ও জ্যোতি দেখা যাইত - মালা চন্দনের অপেক্ষা থাকিত না। গাছের আড়াল হইতে সূর্য্যের তেজ বাহির হইলে যেমন দেখায় সব জিনিষেরই ঐ রকম দেখা যাইত। ইহা স্থানের বা সময়ের অপেক্ষা বাখিত না। একটু তাকাইলে এইরূপ সর্বদাই দেখা যাইত।

সাধনার খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ও প্রকাশ

চিন্তায় এবং বাণীতে কোন বিষয় আসিলেই রূপে যে পবিণত প্রকাশ হয়, জীব জগতে সাধনায় এই জাতীয়টা সম্ভব। কুন্ডলিনী ও নানা চক্রের খেলা আরম্ভ হইলে হলুদ নীল প্রভৃতি নানা রংয়ের জ্যোতি প্রকাশ পাইতে পারে।

জপের একনিষ্ঠতায় এবং চিন্তাধারা লইয়া বসিলে কেহ কেহ অনেক সময় মানস চক্ষে দেখিতে থাকে যেন তাহার সঙ্গে আরও অনেক সূক্ষ্ম মহাত্মা মূর্তিরূপে বসিয়া আছেন। অনেক সময় পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানা রকম সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাসিয়া থাকে। আবার অনেক সময় চলন শক্তিব মত এই সব নানা দৃশ্য ছায়াছবির মত একটির পর একটি যেন এক এক স্তর ভেদ করিয়া পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সমুদয় দৃশ্যও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার অনুযাযী প্রত্যেকের বিভিন্ন, আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের ধারাও ভিন্ন ত। যেমন প্রত্যেক লোকের চেহারা, মনের গতি ও স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন সাধন রাজ্যে সাধনার ধারাও প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের বিভিন্নতা রহিয়াছে। উপরোক্ত মূর্তি দর্শনে ঐসব অনেক সময় সাধকের সাধনার সাহায্য কবে। স্থূল, সূক্ষেব দ্বন্দ্ব যেখানে পূর্ণ সমাধান, সেখানকার কথা আলাদা।

একদিন মাকে প্রশ্ন করা হইল - আমরা যাহাদের উন্নত সাধক বলিয়া মনে করি, জিজ্ঞাসা করিলেও তন্ন তন্ন করিয়া নিজের সাধনার অবস্থাব কথা ত বলিতে পারে বলিয়া বিশেষ শোনা যায় না। কিছুটা বলে শোনা যায়। আব যাহারা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে তাহারাও কিছু কিছু মাত্র বলিতে পাবে। আপনি কিভাবে আমাদের জিজ্ঞাসায় এতটা বলেন?

উত্তরে মা বলিলেন - তবে শোন একটু। যখন সাধক সাধনা কবে তখন এই সব আবার কাহাকেও বলিতে হইবে এ ভাব ত থাকিতে পারে না। আর

থাকিলে ত প্রকৃত সাধনা বলা চলে না। কারণ ইহাও ত আর একটা বাসনার সৃষ্টি। শুধু বাসনার সৃষ্টিই নয়, অগ্রসর হইবার পথে যে বিশেষ বিঘ্ন। আগাইয়া যাইতে পারিবে কি? কারণ যে যে লাইনে চলুক না কেন, বাসনা নির্মূলের দিকে উদ্দাম গতিতে চলা ত - শুধু তাঁহার দিক নিয়া মাতিয়া থাকা। আর যতটা স্থিতি, সেই অনুসারে প্রকাশ কিন্তু জানিও। আর যেখানে সবই সম্ভব সেইখানে এই প্রশ্ন কোথায় বল? এই শরীরটার কথা বাদ দাও, এলোমেলো যখন যা।

আবার জিজ্ঞাসায় - আচ্ছা মা! এইসব তা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনি যে নবজাত শিশু বয়সের অনেক কথাগুলি বলেন, আমরা শুনিয়াছি যেখানে স্বরূপ, সেই জ্ঞান প্রকাশ, সেখানে সমগ্র বিষয়েরই জ্ঞান নাকি অখন্ড শুনিয়াছি। আগে পরে, অজানার প্রশ্ন নাকি আর সেখানে থাকে না, সাধনার ক্রমোন্নতিতে নিরাবরণ স্বয়ং প্রকাশ যেখানে। আপনার কথাগুলি আমরা কিভাবে নিতে পারি?

মা হাসিয়া বলিলেন - কথা এই, এই শরীর তোমাদের দৃষ্টিতে নবজাত শিশু বয়সেও যা, এখনও তাই ত। সাধনার ক্রমোন্নতিতেই এই কি? ইহাই কি তোমাদের বিশ্বাস? তোমরাই বিচার কর না। তোমরা যে যা বল তাই। এ শরীরের ত সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল হয় না। এখন তোমরা যা বোঝ।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন - পরদিন প্রাতে নিয়মিত ক্রিয়াদির পর চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখি হাতের আঙ্গুলাদিরও নানারূপ ক্রিয়া আরম্ভ হইল, ইহাতে অনেক সময় লাগিল। আবার হাতের কবজিখানি ভ্রূযুগলে রাখিলে প্রায় ভ্রূযুগলের দিক দিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যাইয়া সেই ব্রাটকে হাতের কবজির নিম্ন অংশখানা সরু হইতে হইতে, আছে কি নাই, এই জাতীয় অনেক রকম যোগের ক্রিয়াদির প্রকাশ হইল। আসন যেমন হাতের সাহায্য ব্যতিরেকে হইযা যাইত, প্রাণ বায়ুর সংযোগ তেমনই হাতখানিও আপনা আপনি উঠিয়া ঐ ক্রিয়াদির সাহায্য করিল। নিজের অঙ্গের মধ্যে আরও কত রকম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি হইয়া অনেক জাতীয় ক্রিয়াদি হইত। তারপর হাতের গোড়া হইতে আরম্ভ করিযা খন্ড খন্ড ভাবে আঙ্গুলাদি পর্যন্ত নানা ভাবে ক্রিয়া হইল। আর এই শরীর পলক শূন্য অবস্থায় এক দৃষ্টিতে সব দেখিতে লাগিল। রাত্রে এই সব ক্রিয়া বিবিধরূপে হইল।

পরদিন প্রাতে যখন বসিলাম তখনও এই জাতীয়ই হইল। মধ্যাহ্নে বসিলে

দেখিলাম উপরোক্ত ক্রিয়াদির পর যে কোন মূর্তি ভাবে ভাসিয়া উঠে, অন্য দিকে চাহিলেই তাহার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপে দেখি, যে কোন জিনিষ চোখে আসে তাহারই একটা সাদা জ্যোতি পূর্ণ মূর্তি যেদিকে তাকান হয সেই দিকেই দেখা যায়, আবার দেওয়াল ইত্যাদি সব জায়গায় এইরূপ সবই যে জ্যোতির্ময় চিন্ময়, এ খেলার অনেক রকমারিটা হইবার পর শ্বাসের গতিতে উঠিয়া দাঁড়ান হইল। পরে সেই অবস্থায় সামনের দিকে দুই হাত দিয়া মাটি স্পর্শ করা হইল। যেন হামাগুড়ির মত। ইহার মধ্যে দেখা গেল শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে তলপেটের নাড়িভুঁড়িগুলি নড়াচড়া করিযা উর্দ্ধ মুখে উঠিয়াছে এবং খেয়াল হইতেছে নাক, মুখ, কান, চোখ, বাহ্য প্রস্রাবের দ্বারগুলি দিয়া পর্যন্ত সরল ভাবে শ্বাস এবং বাতাস চলাচল করিতেছে। যেন একটি খোলা আঁকা-বাঁকা পাইপের ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে ও যাইতেছে।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া শবীর স্থিব হইয়া গেল। তখনও সূর্য্য ডোবে নাই। বাহিরে যাইতেই একবার পূর্বমূখী আবার সূর্য্যমুখী হইয়া হাতে সূর্য্য প্রণামের ক্রিয়াদি হইল। প্রথমে চোখ বুজা ছিল, শেষে খুলিয়া গেল। পরে দেখি স্থির ভাবে দাঁড়াইযা তাড়াতাড়ি করিযা এক এক বার চোখ বুজি আব এক এক বার মেলি। দেখা গেল নানা আভাযুক্ত একটা তেজোময় বস্তু সবদিক জুড়িয়া আছে। কতক্ষণ এইরূপ দেখিবাব পর সে স্থান হইতে সরিয়া যাওযা হইল।

সব সময় লক্ষ্য করা হইত একস্থানে কোন ক্রিয়া আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথা হইতে উঠিবার বা সরিবার একটু খেয়াল আসিলেও তাহা হইত না। মহাশক্তির লীলা হইল স্থিরত্ব ও অপ্রতিহত প্রকাশ এবং অখন্ড ক্রিয়ার গতি। এই সবগুলিই দীক্ষার খেলাটার পরে, যখন এ শরীরের সাধনার খেলা চলিতেছিল।

এক সময়ে স্থিরভাবে বসিয়া আছি, দেখি কি শ্বাসেব ক্রিয়া হইযা জিহ্বাটি যেন উপর দিকে উঠিতেছে, চেষ্টা সত্বেও ঠিক রাখা যাইতে পারে না। তখন দেখি জিহ্বার নীচে যে জোড়া আছে, তাহা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে দেখিলাম জিহ্বাটি উলটিয়া তালুর সঙ্গে একেবারে লাগিয়া গেল।[১৪] সাধন প্রক্রিয়া বিচার রূপে আসিল কি করিয়া জিহ্বা ঠিক হইবে। আর কথাবার্তাও বা কি করিয়া চলিবে? অথচ তাহার জন্য কোন প্রকার অস্থিরতা নাই অনেকক্ষণ পর দেখি

[১৪] খেচুরি মুদ্রা।

জিহ্বা আপনা হইতে যথাস্থানে আসিল। পরে কয়েকদিন জিহ্বার নীচে ব্যথা বোধ হইয়াছিল।

দীক্ষার খেলাটা আরম্ভ হইবার সামান্য কিছুদিন পূর্ব হইতে ৫/৬ মাস ধরিয়া এইরূপ নানা ভাবে ক্রিয়াদি হইয়াছিল। কেবল বিশেষ বিশেষ কোন কোন বিষয় বলা হইল মাত্র। ইহা ছাড়া অনেক রকম হইয়াছিল।

পরে দেখিলাম আসনাদি কমিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিলে শ্বাসের ক্রিয়া, মাটিতে শুইয়া থাকিবার ভাব, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার খেয়াল, ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ভোলানাথ দেখেন স্নান, খাওয়া, ঘুম বা বিশ্রামের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। শরীরের দিকে একেবারে খেয়াল নাই। রাত্রে বিছানায় একেবারে শুই না। সময় বা রাত্তদিনের কোন পার্থক্য নাই। কি এক ভাবের উন্মাদনায় দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। সংসারের কাজ যেন কলের মত চলিয়া থাকে। বাহিরের সকলের সঙ্গে চলাফেরায় কর্তব্য কর্মে কোনও ত্রুটি নাই, কিন্তু সব কাজই যেন আলগা আলগা। সে সময়কার ভাবের সব কথাটা বলিয়া বুঝান যায় না।

বাজিতপুরে এক পন্ডিত ছিলেন। ৭০/৮০ বছর বয়স। তাঁহাকে ভোলানাথ সকল অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন - এ সব ত সাধারণ কথা নয়। ইহাকে অন্তর্যোগ বলে। যাহার অন্তর জাগ্রত হয় তাহার এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ইহাতে কোনও বাধা দিবেন না। আপনভাবে তাহাকে থাকিতে দিন। মুদ্রা আসনাদি যে বহুপ্রকার হয় - ইহা গুরুর শিক্ষা ছাড়া অসম্ভব। আপনা আপনি এইরূপ হওয়া অত্যধিক অলৌকিক অসাধারণ ব্যাপার। ভোলানাথ বাসায় আসিয়া আমাকে সব জানাইল।

প্রথম যখন আসনাদি বিশেষভাবে আবম্ভ হইযাছিল, তখন দেখিতাম পরনের কাপড়াদি যে কখন কোথায় সরিয়া যাইত, শরীরের পূর্ণ খেয়াল থাকা সত্বেও সেইগুলি ঠিক করিয়া দিবার ভাব জাগিত না। কলের মত শরীরটা আপনভাবে চলিত, শরীর ও কাপড়ে মাটি মাখামাখি হইত। স্নান করিয়া চুল খোলা রাখিয়া বসিতাম, দেখিতাম লম্বা চুল আসনে, হাতে পায়ে জড়াইয়া যাইত এবং কোন সময় বেকায়দায় টান পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইত। কোন সময় মাটিতে পড়িয়া ধূসরিত হইত। কিন্তু তাহার প্রতিকার করিবার ভাবও আসিত না। মাঝে মাঝে শরীরে কোনও জায়গায় ব্যথাও পাইতাম, কিন্তু শরীরের কোনও দিকে খেয়াল যাইত না, কেবল দেখিয়া যাইতাম। মাঝে মাঝে কাপড়াদিও ছিঁড়িয়া যাইত। শরীরের

কোনখানে কাপড়ের ও চুলের টানে সামান্য আঘাত দেখা দিত। কিন্তু সব দেখিয়া যাওয়া হইত। শরীরের কোনও কর্মে বিশেষ লক্ষ্য পড়িত না যে ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া লই। কয়েকদিন পরে মাথার চুলগুলি স্নানের পর বাঁধিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম। স্নানের সময় চুল খুলিয়া ডুব দিয়া স্নান করা হইত। সে ভিজা চুল বাঁধাই থাকিত। কয়েকমাস যাইতেই দেখা গেল যতখানি চুল বাঁধাই থাকিত ততখানি পচিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। চুলের গোড়া সর্বদা ভিজা থাকিতে থাকিতে পিছনে ঘাড়েব কাছে অনেকটা ছড়াইয়া ঘায়ের মত হইয়া গেল। জ্বালা বোধ কবিবার অবসবও নাই, খেযালও নাই।

শুইবাব খেয়াল যখন বাড়িয়া উঠিল তখন দেখা যাইত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে কি এক ভাবের পরিবর্তনের গতিতে সর্বশরীর কি একটা স্থিরভাবে মাটিতে আপনা আপনি পড়িয়া থাকিত। সে কথাও যে কেমন বলা আসিতেছে না, বসিয়াও কখনো তাহা হইত - অটল, অচল। আবার ইহার মধ্যে কোনখানে বড় শব্দ হইলে ছোট শিশুর মত চমকাইয়া উঠিত। তন্মুহূর্তে যেন শিশুর ভাব আসিয়া যাইত এবং হাসিকান্না, চলাফেরা ইত্যাদির দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইত। কয়েকদিন পর দেখা গেল কেহ কাহাকেও মারিলে, এমন কি মাটিতে আঘাত করিলেও এই শরীরে আঘাত লাগিত। কোনও জলভরা বাসনে হঠাৎ ধাক্কা লাগিলে যেমন জলটা ঢেউ খেলিয়া কাঁপিয়া উঠে, আবার স্থির হয়, ঠিক সেই রকম এই শরীরটার খেলা হইতে লাগিল। এ শরীরটা সব কিছু নিয়াই যেন একই সত্ত্বা, আলাদা কিছু নাই - এই এক পূর্ণভাব দিবারাত্রি চলিতে লাগিল। দেখিতাম প্রযোজনীয়তার সাথে সাথে এ শরীরের গতি আপনা হইতে পবিবর্তিত হইযা যাইত। সাংসাবিক কর্মের জন্য উঠিযা যাওয়া হইত আবার তাহা শেষ হইয়া গেলেই কলের মত আসিয়া বসিয়া পড়া হইত। কিন্তু বাহির ভিতব একই ভাব।

দিনে দিনে প্রকাশ হইতে লাগিল যে ভ্রূমধ্যে একটি স্পর্শানুভূতি ও সর্ব শরীরেই রাতদিন একইভাবে অস্বাভাবিক একটা ক্রিয়ার গতি চলিতেছে। আনন্দে ঢুলু ঢুলু অবস্থা, বাহিরে ভিতরে সর্বক্ষণ প্রকাশ থাকিত।

একদিন রাত্রিতে এই শবীর চুপ কবিয়া বসিয়া আছে, দেখি কি, এ শরীরেব মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাতের আঙ্গুলগুলি ফিরাইয়া ফিরাইযা ভ্রূমধ্যে একটি চোখ ও এ শরীরের মধ্যেই পূর্ণ একটি মূর্তি তৈয়ারী করা হইল। সব ত বলাও হয় না, আসেও না। কি সুন্দর রকমারিটা হইতেছিল। প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল যে দিব্য ভাব, দিব্য মূর্তি - স্থির ধীর গম্ভীর, কি ভাব, ভাষায় বলা যায় না। ভগবৎ দিকের

ক্রিয়ার - প্রকাশের দিকটা কিনা, কাজেই কিরূপ ভাবটা যে প্রকাশ হয়, তাহাই বলা হইতেছে। আবার এক সময় পরে এইরূপ হইল যে প্রাকৃত, অপ্রাকৃত যাহা কিছু রূপ কিংবা অরূপ, এই যে প্রকাশটা - অবতার, সাধু, মহাত্মা, দেবতা, মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সবই এক সত্ত্বা। সাধক যখন সাধনায় অগ্রসর হইতে হইতে বিরাট রূপ ও এক সত্ত্বার আভাস পাইতে থাকে, পরে তাহার এইরূপ সর্বময় দিব্যরূপ অরূপে - মহাপ্রকাশ। এই শরীরেই এই খেলাটা। রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

পূজা পাঠ জপ বিষয়ে মা

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন - দীক্ষিত হউক বা না হউক যাহার মধ্যে যে ধর্ম সেই অনুসারে জপ পাঠ, ভজন কীর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি যাহার যাহা, একটা কিছু প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কিছু সময়ে জন্য, বহির্জগত ভুলিয়া একান্তে নির্জনে করিবার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এইরূপ সর্বদা করিতে করিতে শাস্ত্র বিহিত কর্মাদির উপর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আসে কেননা সঙ্গগুণের ক্রিয়া স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। জপ, ক্রিয়া ইত্যাদি যে যাহা করে ঠিকমত চলিলে, আপনা হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও আসনাদি যাহার যাহার সংস্কার অনুযায়ী যেইরূপ প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ হইয়া যায়। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাতে দেহের জড়তা নষ্ট হয় ও লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে নাম, মন্ত্র বা ক্রিয়া ইত্যাদির উপর যতই প্রীতি জন্মে ততই ভাবের একাগ্রতা বাড়ে। প্রীতিই, স্মৃতি ও আকর্ষণের মূল। যে জাতীয় ক্রিয়া করা হয় সেই সেই অধিপতি কৃপারূপে প্রকাশ হয়, বিশ্বাস রাখা।

জপের সম্বন্ধে রকমারি করিয়া আরও শুন্‌বি ত শোন্ তবে। হৃদয়ে ও কণ্ঠে লক্ষ্য রাখিয়া যখন জপ করা হয়, তখন ক্রিয়াজ্ঞান থাকে বলিয়া চিন্তার ধারা চেষ্টা করিয়া রাখিতে হয়। জপ করা ও জপ হওয়া, দুইটি একেবারে পৃথক জিনিষ। শরীরে ও মনে ভাব-বিশুদ্ধতা না আসিলে, ক্রিয়া ও মন্ত্রজপ হওয়া হয় না।

হৃদয়ে জপ যখন আপনা আপনি হয় তখন জপ করিবার খেয়াল থাক বা না থাক, প্রবলভাবে জপ উঠিতে থাকে এবং জাগতিক সকল ভাব ভুলাইয়া জপের দিকে স্রোতের মত টানিয়া আনিতে থাকে। শরীরে মন্ত্র ও ক্রিয়াদির ভাব বিশুদ্ধতার চরমতা ধারণ না করিলে, কণ্ঠের জপ হয় না। তখন কণ্ঠের আল্‌জিহ্বা

অবিরাম ঘড়ির পেন্ডুলাম কিংবা পাম্প করিবার ন্যায় আপন কাজ করিতে থাকে, জপভাব অথবা শরীরের ক্রিয়াদিতে খেয়াল থাক বা না থাক। ইহাকে অজপা জপ বলা যাইতে পারে। ইহাকে বলে কণ্ঠজপ হইয়া যাওয়া। সাধারণতঃ কণ্ঠে জপ স্থিতি না হওযার কারণ জাগতিক ভাব যুক্ত স্থিতিতে থাকে বলিয়া কিন্তু।

ক্রিয়া ইত্যাদির যখন পূর্ণাহুতি হয় তখন রূপ, গুণ, বীজ ইত্যাদির গণ্ডি ছাড়াইয়া এক বিরাট মহান ভাব স্বরূপে যাইতে থাকে। যখন ক্রমশঃ উপাসকের শক্তি লাভ হয় এবং একমুখী অখণ্ড ভাবের ধারা উদয় হইতে থাকে, পাছে তাহা হারাইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কায় তাহাকে সর্বদা আকুল কবিয়া দৃঢ়ব্রতী করিয়া রাখে। এইরূপ আসক্তি উদয় হইলে তাহার দেহের ভাবগ্রন্থিগুলিও ক্রমশঃ খুলিতে থাকে। সে দেখিতে পায় যেমন কোন বিষযে হাসি পাইলে নানা বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতর হইতে হাসি আসিয়া মুখ খুলিয়া যায় সেই ভাবে অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে যাহার যে সংস্কারজনিত মন্ত্র ক্রিয়াদি আপনা হইতেই বিনা চেষ্টায় বাহির হইতে থাকে। তোমাদের মন্ত্র-চৈতন্য বলিয়া যাহা কথিত আছে না, সেই জাতীয়। শরীরের ভিতর শিশুদের বাক্যের কেন্দ্রস্থল এবং শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদির আদিস্থান এক বলিয়া - মূলে ত একই, তাহাদের কথা বাহির হইবার পূর্বে এক অক্ষব বার বার বলিতে বলিতে হঠাৎ একটা শব্দ যোজনা হইযা বাহিব হয়, সাধকের মুখ দিয়া মন্ত্র ইত্যাদিও সেই ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। সে অবস্থায় ধরিয়া নিবে যে মন্ত্রেব সহিত উপাসকের পরিচয় হইল।

ছেলেরা প্রথম পড়ে আবার যখন লিখিতে আরম্ভ করে তাহা পূর্বের পড়ার সঙ্গে মিলায়, অর্থ বুঝিতে চায়। সেইরূপ মন্ত্র যখন তাহার আপন স্বভাবে খুলিয়া যায়, তখন মুখে আওড়ান ভাবটার সঙ্গে সঙ্গে - এ শব্দটি কি? ইহাব মূল কোথায়? ইহার অর্থ কি? তাহা জানিবার ঔৎসুক্য জাগে - ঐ দিকের জিজ্ঞাসু যেমন। সেই সময়ে সাধকের বহির্জগতের খেয়াল কমিয়া যায়। এইরূপ যতই অন্তর্জগতের কপাট খুলিয়া যায় ততই সে রূপ, গুণ, অর্থাদি সহ যাহা ধ্যেয় সেই দেবতা ও মন্ত্রের সন্ধান অর্থাৎ সেই তত্ত্ব পায়। ইহাকে মন্ত্র-প্রত্যক্ষ তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ দর্শনের দিক বলে।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না

দীর্ঘ সময নিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যখন হইত, ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে দিনে-রাত্রিতে শ্বাসের ক্রিয়া মাত্র দুই তিনবাব এবং আসনও অদল বদল হইয়া

মাত্র ২/৩টি হয়। বাকি সময় পড়িয়া থাকা বা একই ভাবে বসিয়া থাকা এই অবস্থায় কাটে। সর্বময় একই সত্ত্বা, সর্বদা এই ভাবের আনন্দেই ভিতর বাহির একযোগে ভরপুর।

একদিন শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখিতে দেখিতে খেয়াল আসিল ও জিজ্ঞাসা আসিল - এই সব কি? ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল - ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না গতি। ভোলানাথকে বলিলে তিনি বলিলেন - এই সব নাড়ীর নাম।[১৫]

এই রকম কত রকম ভাবাদি হইতে লাগিল ও মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিই দেখি, আমিই বলি, আমিই শুনি আর চুপ করিয়া থাকি। শোনার ভিতরে এক হইল - নিজের ভিতর হইতে পবিষ্কার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, শোনা হইতেছে, আর মীমাংসা হইতেছে।

ভবিষ্যৎ বাণী

একদিন আবার কোনও সময়ে ইহাও হইয়াছিল - বিছানা হইতে শরীরটা গড়াইয়া উঠিয়াছে, আর বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতেছে - পরশু এই এই ঘটিবে। ইহা, এই ধারাটা ভিতর হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া মুখে বলিয়া শোনা - এ নয়। আচ্ছা, যোগাযোগ হইলে ঘটিয়া যাইবে। দেখা গেল কেমন অস্বাভাবিক ভাবে যোগাযোগ হইল - ঘটিয়াও গেল।

এই যে আলাদা শোনা ও সময় - এইটি সুমীমাংসায় পরিষ্কার ভাবে দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া প্রকাশ। কি রকম? অভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া যোগীদের, সাধকের যখন ক্রিয়ার প্রতিরূপ আলাদা প্রকাশই মাত্র তো। কে, কি? প্রশ্ন আর থাকে না।

মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি

একদিন খেয়ালে আসিল এইরকম কেন হয়? মুখে উত্তর হইল - মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই দুইয়ের খেলা।

সাধারণতঃ জীবের ভিতর দুইটি শক্তির খেলা হয়, ইচ্ছাশক্তি ও মহাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি স্বকীয় বাসনাকে লইয়া খেলিয়া থাকে, আর মহাশক্তি সকল সংকল্প

[১৫] মেরুদণ্ডের মধ্যমা নাড়ী, যার মধ্য দিয়া কুলকুন্ডলিনীব শক্তি সাধনার বলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয।

বিকল্পের উপর দাঁড়াইয়া জীবের কর্মভাবানুযায়ী তাহাকে চালিত করে। ইহাই মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার নিদর্শন। মহাশক্তির লীলা হইল স্থিরত্ব ও অপ্রতিহত প্রকাশ এবং অখণ্ড ক্রিয়ার গতি। আর ইচ্ছাশক্তির স্বভাব হইল কাজে বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছার প্রয়োগ করা। মহাশক্তির স্থায়িত্ব ও ইচ্ছাশক্তির অভাবের দিক।

সাধন জগতে যখন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ক্রিয়াদি সূচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া মহাশক্তির আভাস পাওয়া যায়, তখন এক তত্ত্বের ভিতর এই যে জাগতিক নানাতত্ত্ব তাহা ডুবিতে থাকে। তখন এক চিন্তা, একলক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। মহাশক্তির সিদ্ধান্ত না থাকিলে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পূর্ণ মীমাংসা হয় না। যেমন আগুন ছাড়া ধোঁযা নাই সেইরূপ একেবই প্রকাশে ইচ্ছাশক্তি ও মহাশক্তিব ক্রিয়া।

পূর্ণ প্রকাশ

মুখ দিয়া বাহির হইবার সাথে সাথে সব প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইত। মুখে উত্তর বাহির হইবার সময় ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ বাহির হইত। কোন সময় পরিষ্কার, কোন সময় জড়ান। যেমন চারটি ধ্বনির জড়ানো ভাবে 'প্রণব' উচ্চারিত হয়।[১৬] এ জাগতিক জড়ান বুঝিও না। কোনও সময় তাড়াতাড়ি বাহির হইত, কোনও সময় দেরী লাগিত। কি বাহির হইবে, পূর্ব মুহূর্তেও তাহার কোনও প্রকাশ, ইঙ্গিত থাকিত না। বিচারের ভাবও আসিত না। কাহাকে বলা বা কাহারও নিকট হইতে কিছু জানা এই খেয়াল একেবারেই হইত না। কোনও সময়েই এ শরীরের এ দিকটাই না। আসেও না, হয়ও না, খুব কদাচিৎ ২/১টি কথা, ভোলানাথ কাছে থাকিলে বলা হইত।

নিজের খেয়ালে হইত, যা কিছু দেখা, শোনা বা বলা এ সবই 'আমি'। এ 'আমি' নয় কিন্তু। জ্বালা গলা 'আমি' নয - যা বিবেক বৈবাগ্যে জ্বালাইয়া দেয়, ভক্তিতে গলাইয়া দেয়। কখনও শরীরের ভাবে খেয়াল হইত - ইহাও আমি, উহাও আমি। কিন্তু বাহিরের ভাষায় 'তিনি' প্রকাশ থাকিত। অর্থাৎ একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই একথা মুখ দিয়া ফুটিত, বলিবার খেয়াল হইত। আর আপনভাবে 'আমি ছাড়া কিছুই নাই' এই ভাবটা বদ্ধমূল থাকিত। এই যে আমি আর তুমি, বাহির আর ভিতর - সেটা এ শরীবেব কাছে নির্দ্বন্দ্ব - এক হইয়া

[১৬] ওংকার ধ্বনি - অ, উ, ম এবং অর্ধ ম।

প্রকাশ। আমি আর তুমি যে একই - ঐ স্থিতি। একটা সময় পূর্বে আসিয়াছিল - **ইহাও আমি, উহাও আমি, আবার ইহাও তুমি, উহাও তুমি। তুমি মানে তিনি, পরে আর এ আলাদা ভাব রহিল না।**

এ ভাবে প্রায় ২/৩ মাস চলিয়া গেল। পরে তিনিই আমি, আমিই তিনি, সেই একই প্রকাশ আসিল।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী মায়ের কপালে জ্যোতি (অক্টোবর ১৯২৬)

সাধকের একটি অবস্থা

সাধকের একটি অবস্থা আসে, যে সময় তাহারা যাহা দেখে তাহাই বলে। তাহাদের গোপন করিবার ভাবই থাকে না। সাধকের ভাব গ্রন্থিটি[১৭] জাগতিক সংস্কারের বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়া বা বাহির হইয়া আসার অবস্থা খুলিয়া যাইলে তাহার লক্ষণ বড়ই সুন্দর হয়। সর্বক্ষণ ভাব বিহ্বলতা, যুগপৎ রুক্ষতা ও কোমলতা এবং নানা অলৌকিকতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। রুক্ষই হউক আর কোমলই হউক যে ভাবে সাধারণের প্রাণ গলিযা যায় সেই আসল ভাব। ইহার যে কোন একটি কৃপা প্রার্থীদের লোভনীয় সামগ্রী। এই অবস্থায় সাধকের ধীরে ধীরে ভবিষ্যত ও বর্তমানের সম্পূর্ণ থলিটি ছিঁড়িয়া যায়। তাই সাময়িক রুক্ষ ও কোমলতার চূড়ান্ত দেখা যায়। কিন্তু ব্যবহারে ভেজাল থাকিলে যুগপৎ ভাবের প্রকাশ হয় না।

শোকাতুর মানুষের যেমন বে-খেয়ালের ভিতরও পরণের কাপড়টির প্রতি খেয়াল থাকেই, বাহ্য প্রস্রাবও স্বাভাবিক চলে, সেইরূপ সাধকের শারীরিক ব্যবহারের নানা খোলা ভাব প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদিও ভিতরেও এক স্থির ধারা থাকিয়া যায়, তবে সকল ভাব অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়।

আরব দেশীয় মহাপুরুষ

একদিন দ্বিপ্রহরে মাটিতে এ শরীরটা যেমন ঢলিয়া পড়ে তেমন পড়িয়া ছিল। দেখা গেল একটি মন্দিরের নিকট বাহিরে একটি সাধু, মুসলমান ফকিরের বেশে দাঁড়াইয়া এ শরীরের দিকে চাহিয়া আছে। ইহা দেখিতে দেখিতে উঠিয়া বসা হইল। ভিতরে জিজ্ঞাসা আসিল - ইনি কে? সাথে সাথে উত্তর - আরব

[১৭] মনের যে সকল গোপনীয় প্রবণতা গাঁঠ রূপে সংস্কারের মধ্যে স্থিত।

দেশীয় এক মহাপুরুষ। দেখিয়াও - সে কে, প্রকাশ। সন্ধ্যায ভোলানাথকে বলা হইল - আজ আরব দেশেব এক সাধু দেখা হইযাছে। ভোলানাথ বলিয়া উঠিল - আরব দেশের মহাপুরুষ দেখিলে? আমরা হিন্দু, তুমি যে এইসব কি দেখ বুঝি না। ও ত মুসলমানের। ইহা বলিতে বলিতে একটু যেন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল।

প্রণামে প্রতিক্রিয়া

এই সমযে যখন কেহ এ শরীরকে নমস্কার কবিতে আসিত তখন আপনা হইতেই পা সরিয়া যাইত। আল্‌গা ভাবে কেহ নমস্কার করিলেও শবীবের ডানহাত উর্দ্ধদিকে উঠিয়া পডিত। বরাভয় দানের মত ও মুখ দিয়া স্পষ্টরূপে আশীর্বাদেব মত শব্দটি আপনা হইতে বাহির হইত।

বাজিতপুবে নবাব এস্টটের এক কর্মচাবী এ শরীবকে মা বলিযা ডাকিত। কিন্তু তাহার সহিত এ শরীরের কথাবার্তা হইত না। সে আমাদেব বাসায আসা যাওয়া করিত ও ভোলানাথের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহার স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়াতে তাহার পিতা তাহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বলে। তাহার একদিন কেমন এক খেয়াল হইল যে এই শরীর যখন ক্রিয়ায় বসে, সে পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিবে। কিন্তু তখন এ শরীর ছুঁইয়া কেহ নমস্কার করিত না। কিন্তু ভোলানাথের নিকট তাহার অত্যন্ত কাকুতি মিনতিতে ভোলানাথ স্বীকার হইয়া এ শরীরকে বলাতে বলা হইল - তোমার যখন ইচ্ছা, তাহার যদি একান্ত আগ্রহ হয় তবে তাহাই হইবে। একদিন এ শরীব ক্রিয়া শেষ করিয়া উঠিতেই সে আসিয়া পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে কাঁপিতে কাঁপিতে ঢলিয়া পড়িল। ভোলানাথ 'এ কি হইল' 'এ কি হইল' বলিয়া চমকিযা উঠিলেন এবং প্রতিকার কবিবার জন্য এ শরীরকে বাব বার বলিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইল। তখনও তাহার শবীরে একটা কাঁপুনি ছিল। সে বলিল - যখন পড়িয়া রহিয়াছিল সে খুব আনন্দে বিভোব ছিল এবং তাহাব দরুন সে যাহা মনে মনে প্রার্থনা কবিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল তাহা কিছুই বলিতে পারে নাই। ভোলানাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলিল যে তাহার যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ না হয় ও তাহার একটি সু-সন্তান হয - ইহাই তাহার প্রার্থনা ছিল। কিছুদিন পরে জানা গেল তাহার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে।

ক্ষেত্রপালের ওঝাগিরি

ভোলানাথ আমার এইরূপ অবস্থাদি দেখিয়া ক্ষেত্রপাল নামক একজনাকে আনিয়া বলিল যে - তুমি দেখ ত, তাহার এ সব কি হইতেছে? সে ওঝাগিরি জানিত। একদিন রাত্রে সবজান্তার মত ধূপদীপ জ্বালাইয়া, ভোলানাথ ও আমি যে ঘরে থাকিতাম সে ঘরে পূজার আয়োজন করিল। আমি আমার ভাবে ঘরের ভিতর এক কোনায় বসিয়া আছি আর ভোলানাথ অপরদিকে আছে। প্রায় ঘন্টাখানেক চলিয়া গেলে ক্ষেত্রপাল পূজা হইতে উঠিয়া ভোলানাথকে বলিল - কৈ, কিছু ত বুঝি না। এ বলিয়া তামাক সাজিল। পরে বাহিরে গেল।

বাহির হইতে আসিয়া ভোলানাথের হাতে হুঁকা দিতে গেল। এমন সময় সে কাঁপিতে কাঁপিতে উপুড় হইয়া যেমন নমস্কার করে সে ভাবে মাটিতে অবশ হইয়া 'মা' 'মা' শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ মাটিতে পড়িয়া থাকায় ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন - এ কি হইল? শীঘ্র ইহাকে ভাল কর। আমি বসিয়া হাসিতেছিলাম। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া তীব্রভাবে বলিতে লাগিল - তাড়াতাড়ি ইহাকে প্রকৃতিস্থ কর। পরে আমি যেস্থানে বসিয়াছিলাম সেখানে আমার মুখ হইতে কয়েকটি শব্দের মত কি বাহির হইল। ক্ষেত্রপাল উঠিযা বসিল। খানিক পরে বলিল - আমি যখন পূজা শেষ করিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম তখন হইতেই আমার শরীরের অবস্থা কেমন পরিবর্তন হইয়াছিল। ভিতরে আসিবার পরে কি হইয়াছে আমি আর কিছুই জানি না। এখানে আমার 'ওঝাগিরি' খাটিবে না। সে চলিয়া গেলে ভোলানাথ ও মামাতো ভাই তাহার এই দশা দেখিয়া খুব হাসিয়াছিল।

চরকায় সুতা কাটা

কয়েকমাস যাইতেছে, সে সময় চরকায় সুতাকাটার খুব ধুম ঘরে ঘরে। মহাত্মা গান্ধীর থেকে এইটির বিশেষ প্রচলন। ভোলানাথ বলিল - সকলে চরকা নিতেছে। আমি একটি আনিব নাকি? এখন ত তুমি অনেক সময় পাও। বলিলাম - আচ্ছা। চরকা আসিল। চরকা শিখাইবার একটি লোক ছিল, তাহাকে ছয় আনা দিতে হয়। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে নিয়া আসিব কিনা। বলিলাম যদি সূতা কাটিতে না পারি তবে তাহাকে ডাকিব। চেষ্টা করিযা সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম। সূতা কাটিবার সময় চরকায় গুণ গুণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতাম যে,

কণ্ঠে সে বীজটি তাহার স্বাভাবিক ধাবায় চলিতেছে। এইরূপে কিছু সূতা কাটা হইল। ভোলানাথ অন্যান্যেব সঙ্গে মিলাইয়া দেখিল সূতা খুব ভাল ও সরু হইয়াছে। তাহা দিযা এক জোড়া কাপড় তৈযাবী করা হইল।

ইহার মধ্যে জানকীবাবুর ভগিনী আসিল, দেখিলাম সে চরকার সূতা দিয়া গামছা বানাইয়াছে। এ শরীবও বানাইবে বলিলে সে জানাইল যে উহার সরঞ্জাম তাহার সঙ্গে আনে নাই। তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম কি কি লাগিবে তাহা শুনিয়া সেই সব বানাইযা নিলাম। নিজেই গামছা তৈয়ার করিয়া লইলাম। পরে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূতা, চরকা কোথায় চলিয়া গেল, খেয়ালও নাই।

কয়েকটি ঘটনা

ইহার কিছুদিন পরে উষাদিদির মেয়ের জ্বর হয। দুপুর বেলা আমি যখন ক্রিয়াতে বসিয়াছি, উষাদি মেয়েটিকে কোলে কবিয়া সেখানে আসিল এবং বলিল - দেখ দিদি! ওর কেমন জ্বর হইয়াছে। মেযেটিকে আমাব কাছে নিলাম এবং সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলাম ও বলিলাম যে ইচ্ছা হইলে আজ হইতে তিন দিন প্রত্যহ এ সমযে যেন তাহাকে এ শরীরের কাছে নিযা আসে, সেই দিন হইতেই তাহার জ্বর একটু একটু কমিতে লাগিল। পবদিন যখন মেয়েটিকে এ শরীরের কাছে আনিতে চায়, তখন তাহার স্বামী বলিল - এ সব আমি পছন্দ কবি না। মেয়েকে আমি দিব না। উষাদি বড় দুঃখিত হইযা এ শবীরকে জানাইল। কিছু বলা আসিল না। তারপর মেয়ের জর বাড়িল। ২/৩ দিন পর্যন্ত জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। উষাদি আসিয়া অতি বিনীত হইয়া বলিল - দিদি! আমার ত কোন অপরাধ নাই। তুমি কৃপাদৃষ্টি করিয়া শিশুটিকে ভাল কর। এ শবীর চুপ করিয়া রহিল। পবে শুনিলাম, ক্রমশঃ মেয়েটি ভাল হইতে লাগিল।

ভোলানাথের ভাই-ভগিনীদের ভিতর চিঠিপত্র, দেখাশুনা বা খববা-খবরের বিশেষ চলাচল ছিল না। তাই এ শরীব সকলের সহিত চিঠিপত্র লিখিয়া তাহাদের ভিতর মেলামেশা রাখিয়া দিত। কিন্তু যখন হইতে শবীরের অবস্থাগুলি আরম্ভ হইল তখন চিঠি লেখা, চিঠি পড়ানোব বা অনুসন্ধান নেওয়ার ভাব বা অবসর একেবাবেই হইত না। কাহারও খববাদি নিবার কথাও খেয়ালে আসিত না। ইতিমধ্যে ভোলানাথের ছোট ভাই যামিনী পত্রেব দ্বারা জানাইল যে কোনও এক মোকদ্দমায় তাহার জেল হইবার আশঙ্কা আছে। যেই দিন মোকদ্দমার তারিখ সেইদিন ভোলানাথ এ শরীরের সন্ধ্যার আসনের নিকট গিয়া বলিল - তুমি যা

বল সবই ত ঠিক হয়। বল দেখি, যামিনী এখন কোথায়? বলিলাম - সে এখন বন্ধ আছে। ভোলানাথ খুব ব্যতিব্যস্ত হইল। কিছুদিন পরে যামিনী লিখিল - মোকদ্দমা মিটমাট হইয়াছে। তখন ভোলানাথ বলিল - তোমার এইসব কি? দেখ দেখি, যামিনী ত বন্ধ নাই। শেষে যামিনী বাজিতপুরে আসিলে জানা গেল যেইদিন এ শরীর ঐ কথা বলিয়াছিল, সেই সময় বাস্তবিকই সে হাজতে ছিল।

একদিন খবর আসিল যে ভোলানাথের বড় ভগ্নিপতি সীতানাথ কুশারী মহাশয় তাহার নিজ বাড়ি দৌগাছিতে খুব অসুস্থ। ভোলানাথকে দেখিতে চায়। সেইদিনও ভোলানাথ আসিয়া এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করে - বল দেখি তাহার কি অবস্থা? বলিলাম - অসুখ বেশি, তবে তুমি গিয়া দেখা করিলে সারিয়া যাইবে। ভোলানাথ দৌগাছি গেলে ক্রমে ক্রমে কুশারী মহাশয় আরোগ্যলাভ করিলেন। তাহার পর হইতে কুশারী মহাশয়ের সহিত এ শরীরের দেখা হইলে তিনি পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিতে আসিতেন। একবার তাঁহার বাড়িতে এই শরীরকে নিয়া সম্মুখে বসাইয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া ছিলেন। তিনি বয়সে পিতার সামান্য বড় ছিলেন। এ শরীরের বিবাহের ঘটক ছিলেন বলিয়া গৌরববোধ করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভোলানাথের বাড়ি

কয়েকদিন হইতে ভোলানাথের শরীর বিশেষ ভাল চলিতেছে না। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলিল - তোমার ত সব কথাই ফলবতী হয়। বল দেখি - আমার একটি বাড়ি হইবে কিনা। আমারও আর চাকুরি করিতে ইচ্ছা হয় না।

বলিলাম - তোমার ত বাড়ি আছে

ভোলানাথ বলিল - কোথায়?

বলিলাম - গোকুল ঠাকুর যে বাড়িতে ছিল, সে বাড়ি তোমার।

সে বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম - সময়ে সেই বাড়ি পাইবে। নিশ্চিন্ত থাক।

পরে যখন বাজিতপুর হইতে ঢাকা আসিলাম, কথায় কথায় একজন বলিল - রমনা কালীবাড়ির নিকট যে ভগ্নমন্দির যুক্ত জায়গাটি রহিয়াছে, উহাতে শেষদিকে গোকুল ঠাকুর নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পর হইতে বাড়িটি এইভাবে ছাড়া পড়িয়া আছে। বাড়িটির পরিত্যক্ত অবস্থা।

ভোলানাথের দীক্ষা

দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ মাস আসিয়া পড়িল। ভোলানাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে ১৫ই অগ্রহায়ণ[১] আমি তাহার দীক্ষার কথা বলিয়াছি - আমি দেখিব সেইদিন কি করিয়া দীক্ষা হয়। আমি ইহা পরে শুনিয়াছি।

১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে[২] ভোলানাথ স্বপ্ন দেখিল যে তাঁহার মা, বাবা ও ইষ্টদেবী আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। ১৪ই তারিখে

[১] ১লা ডিসেম্বর, ১৯২২, শুক্রবার.
[২] ৩০শে নভেম্বর, ১৯২২, বৃহস্পতিবার।

ভোলানাথ আমাকে এই সব কথা বলে। ১৫ই অগ্রহায়ণের দিনে ভোলানাথ খুব ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি না সারিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাছারি চলিয়া গেল। এ শরীর নিত্য আসনে বসিবার মত বসিলে খুব জোরে জোরে স্তব স্তোত্রাদি হইতে লাগিল। হঠাৎ কি জানি কেন খেয়াল হইল - কাছারি হইতে ভোলানাথকে ডাকিয়া আনার জন্য চাকরকে বলা হইল। দুইবার ডাকাতেও যখন আসিল না, তখন খবর দেওয়া হইল - যদি তুমি না আস, তবে এ শরীব নিজেই আসিবে। ইহা শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে বাড়ি আসিলেন। আসা মাত্রই বলা হইল - তুমি স্নান করিয়া আস। স্নান করিয়া আসিলে একটি মন্ত্র আপনা আপনি প্রকাশ হইল। জপের ক্রিয়াদি বুঝাইয়া তাহাকে বলাটাও কেমন করিয়া হইয়া গেল। যেমন আসন, মুদ্রা, যোগের ক্রিয়াদি আপনা হইতেই হইয়া যাইত, ভোলানাথের সম্বন্ধেও এইসব আপনা হইতেই এইরূপ হইয়া গেল। তোমরা বল না যে - গুরুর উপদেশ, জ্ঞানের প্রকাশ। মহাবাক্য - সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ[৩] - সে দিকটা ধর না। সব কথাগুলি সেই ভাবের প্রকাশ কারণ নিজেতেই নিজ কিনা। নিজেই গুরু নিজেই শিষ্যা। আগাগোড়া শরীরটা এইভাবে খেলিয়া আসিতেছে, দেখিতেছিস ত - যখন যেখানে, তদ্রূপ হইয়া। এই সব কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ, যেখানে যেমন।

সাধনার খেলার বিভিন্ন দিক

ইতিপূর্বে কয়েকদিন যাবৎ এ শরীর বসিলেই, দিনে কি রাত্রে, মাটিতে অসাড়ভাবে শরীরটা পড়িয়া থাকিত, আবার যখন স্থির হইয়া বসিত মুখে নানা স্তব স্তোত্রাদি বাহির হইত। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াদির দ্বারা হাতের দুইটি বুড়ো আঙ্গুল কখনও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া আসন অবস্থায় শরীরটা কতটা শূন্যে উঠিয়া মাটি স্পর্শ না করিয়া দোলনার মত দুলিত। আবার কখনও কখনও বুঝিতাম যে একেবারে নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য হইয়া শরীরটা শূন্যে আছে। ইহা দ্বারা জানিবে যে যোগীরা যোগবলে অনেক অদ্ভুত কার্য করিতে পারে। শ্বাসের সহিত যুক্ত রাখিয়াই মাত্র শরীরটা শূন্যে আলগা থাকে।

কোন সময়ে আলগা হইয়া বসিয়া কেবল পায়ের দুইটি বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করিযা দুই হাঁটুব মধ্যখানে হাত জোড় করিয়া বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া

[৩] দ্রষ্টব্য ঃ পবিশিষ্ট ৪ ও ভোলানাথের সংক্ষিপ্ত জীবনি - পরিশিষ্ট ৫।

যাইত। পূর্ব হইতে এ পর্যন্ত, কত রকম যে আসন হইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছি ৮৪ লক্ষ আসন আছে, ইহা সত্য। ইহা ছাড়াও আছে। সবই ত অনন্ত।

উভয় চক্ষু-তারার দৃষ্টি এক লক্ষ্যে ভ্রূমধ্যে নাসিকাগ্রে বা নিম্ন দিকে নিবদ্ধ থাকিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যাইত। কখনও ঊর্ধবাহু হইয়া একলক্ষ্যে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলাদি দ্বারা মুদ্রার মত নানা প্রকার ক্রিয়াদি হইত। শরীর ও মুখ স্থির রাখিয়া এক দৃষ্টিই মোটামুটি পাঁচ রকম হইত। তাহা ছাড়াও আরও নানা রকম হইত। ঊর্ধদৃষ্টি, অধোদৃষ্টি, সমদৃষ্টি আর দুই চোখে দুই দিকে টেরাদৃষ্টি। এক এক রকম দৃষ্টিতে বহু সময় কাটিয়া যাইত। দৃষ্টি ও আসন একেবারে স্থির ও অটল থাকিত। আবার যে স্থানে দৃষ্টি স্থির হইত ধীবে ধীরে তাহা চক্ষুগোলকে ফিরিয়া আসিত। অর্থাৎ দৃষ্টির মূল যেখানে, সেখানে ফিরিয়া আসা। যেখান হইতে আসা, সেখানেই আসা। যেখান হইতে যাওযা, সেখানেই যাওযা - নিজেকে পাওযার ক্রম[৪]-চক্রাকারের নিযমের মত এ ধারাটা এইরূপ থাকিত - কখনও শূন্যে সমান লাইনে আসিত, কখনও ঊর্ধ এবং অধঃ বা পাশ কাটিয়া চক্ষুগোলকে আসিত। সে এক অদ্ভুত। কোনও সময় বস্তুর উপর দিয়া অর্থাৎ যেমন ঘরের ছাদ, দেওয়াল, মেঝে, কিন্তু ইহা বাদে স্পষ্ট শূন্যের মধ্যে যে ক্রিয়া - ছাদ, দেওযাল, মেঝে ইত্যাদির কোন কিছুব ছোঁয়াও নাই, শুধু শূন্যে বিবিধ প্রকারের ক্রিয়া - ইহাও অনন্ত। শূন্যেতে যেমন নিজমূর্তি দর্শন, কি অন্যান্য মূর্তি দর্শন, সেখানেই নিজেতে দৃষ্টি ও অন্তর্ধান - ইহাও তো কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, সেইটি যেমন হইত।

চিত্র ঃ সাধন লীলার সময় শ্রীশ্রী মা

পৌষ মাসের প্রথম কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন দুপুর বেলা আসনে বসিয়া আছি, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যাস্তের কিছু বাকি। এই দুই - একে অপরকে বলিতেছে। প্রথমতঃ কেমন একভাবে সংস্কৃত ভাষায় কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইল। পরে বাংলায় অন্যভাবে মুখের ভিতর হইতে ঐ কথা প্রকাশ পাইল। তখন জিজ্ঞাসা করিবার খেয়াল আসিল - তবে দ্বিতীয় কে? আপনা হইতেই উত্তর হইল - স্বয়ং আপনিই। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বালিলে যেমন সমগ্রের নিঃসংশয় প্রকাশ, তেমনই। দুই এক - এক-ই, ভিতরে বাহিরে এক হইযা কে এক মহান প্রকাশের পরিচায়ক ঐ। ঐ সময় সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের

[৪] 'দৃষ্টিব' মূল - না তো চক্ষু, না মন, স্বযং আত্মাই। চক্ষু ও মন কেবলমাত্র সংযোগকাবী।

অণু পরমাণুতে সেই যে ব্যক্ত অব্যক্তে, নিত্য সত্য শাশ্বত, তোরা যা বলিস না তাই তন্মূহুর্তের মধ্যে প্রকাশ। ভাষায় প্রকাশ হয় না, নিছক। সেই প্রকাশটা কি রকম যে তাহা তো ভাষায় আসেই না। ইহাতে বুঝিবে যে এক লক্ষ্যে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী সাধনা করিতে করিতে সাধক যখন সাধনার সমাধানে উপস্থিত হয়, তখন তাহারও এক প্রত্যক্ষ প্রকাশ যা নিত্য - ইহাও হইতে পারে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরিচয়টাও ত উহার ভিতরে।

এ শরীরটার গতির ভিতরে কি রকম এক স্থির, ধীর, গম্ভীর, নিশ্চল অর্থাৎ অচঞ্চল ভাব আসিয়া সমস্তটা কেমন হইয়া গেল। আর এই শরীরের মুখ দিয়া তখন বাহির হইতেছিল আজ হইতে সাধারণভাবে সকলেব সাথে কথা বলা হইবে না। বিশেষ দরকার হইলে কেবল ভোলানাথের কাছে কথা বাহির হইবে। কর্মাদির জন্য যতটুকু, ততটুকুই। আজ রাত্রে বিছানায় সামান্য গড়ানোটুকুও হইবে না। তিনদিন উপবাস থাকা হইবে।

আরও কথা হইযাছিল যে এই শবীরের নমস্কার নিবার কেহ নাই। উপস্থিত বহিঃপ্রকাশে কেবল ভোলানাথকে নমস্কাব করা, যেমন হইয়া আসিতেছিল। যেমন বীজ, মন্ত্র স্তোত্র, ক্রিয়াদি ভিতর হইতেই পূর্বে পূর্বে বাহির হইতেছিল সেইভাবেই উপরোক্ত কথাগুলি বাহির হইয়াছিল এবং আরও কিছু প্রকাশ হইয়াছিল।

এখানে মাকে প্রণামের কথা জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন - যেখান হইতে সৃষ্টি অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকাশ হইতেছে - অবতার, মহাপুরুষ, যোগী, সাধক, দেব, মানব, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, ক্ষুদ্র পিপীলিকাটি পর্যন্ত - যা মূল প্রকাশ, ক্রিয়া অক্রিয়া, কৃপা অকৃপা, এখানে প্রণম্য কে? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা - এটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশটা আর কি।

আর সৃষ্টি হইতেছে, সেটা কার, কে? সে-ই। লীলা খেলাটা কি? সে-ই। আলাদা আলাদা যে দেখিতেছে সে-ই। না দেখাটাও সেই-ই। পাওয়া না পাওয়া, আনন্দ নিরানন্দ - সে-ই। আবার এইরূপেও তিনি, ঐরূপেও তিনি। আবার একমাত্র স্বযংই, যা-তা।

ইহাতে কে কাকে প্রণাম করিবে? এই বিকাশের পর আর তো প্রণম্য থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার পর যখন আবার হইল গাছের ঝরা ফল কুড়াইয়া খাওযা হইবে, ঋষিদের ভাবে থাকা হইবে, তিন গ্রাস বা তিন দানার বেশি না খাওয়া, ইহা কি করিয়া আসিতে পারে? পূর্বের এ ভাবটা নিজেই নিজেতে একটু আড়াল

দিয়া চলা। ঐ আড়াল দেওয়া এবং আড়ালটাও স্বয়ং-ই। সমগ্র শক্তির প্রকাশ তো।

তখন আবার ঋষিদের এই দিকটা, বৈষ্ণবের ঐ দিকটা বা শৈবের শাক্তের দিকটা, সবই যেখানে প্রকাশ সেখানে যে কোনও ধরা লইযা স্বাধীনভাবে খেলা স্বাভাবিক হইতেই পারে, যদি কোনও একটা লাইন - শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বা আর যে কোনও, শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধর, কি সেইখানেই থাকিয়া যাও, তবে গণ্ডিবদ্ধ ভাব রহিয়া গেল। চরম পরম বিকাশ প্রকাশ প্রয়োজন। চলিবার সময় তো লাইন ধরিয়া চলিতেই হইবে।

প্রঃ - সাধনা যদি অনন্তই হইল, তবে তো লক্ষ্যে কখনও পৌঁছান হইবে না?

মা - অনন্তে অন্ত, আর অন্তে অনন্ত তো। যে কোন স্থান হইতেই প্রকাশ হইতে পারে - সবখানেই সব কিনা। সমগ্র পাওয়া আয়ত্তাধীন না হইলে হইল না।

এক একটা দিকেও খেলিতে পারে সে ঐ স্থিতিতে। একটা আড়ষ্ট ভাবও দেখা যাইতে পারে উপলক্ষ্য হইয়া। উপলক্ষ্যটাও নিজেই - উপলক্ষ্য আর আসিবে কোথা হইতে? খেলা কিনা, বড় সুন্দর। হাসি খেলা যেমন, আড়ষ্টটাও তেমন, তাহার মধ্যেই যাইবে আর কোথায়? এই আড়ষ্ট জাগতিক আড়ষ্ট নয় - আবরণ নিঃসংশয়, নির্দ্বন্দ্ব। আবার তাঁহাকেই - তিনি প্রণামও। কিন্তু এমন জায়গা আছে, যেমন কালাকে কালা বলিলে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে সহ্য করিতে পারে না, তেমন তাহাকে বলিলেও সহ্য করিতে পারে না - আড়ষ্ট হইয়া যায়। যাহা উপস্থিত বলা হইল, তাহা কিন্তু জাগতিক নয়, এ জাগতিকও কিন্তু কতকটা দেখায়। যেমন কাহাকে বলিল, তুমি ভগবান! হয়তো শরীর ত্যাগ হইয়া যায়, এ ব্যবস্থার মত অবস্থা দেখা গেল। সব নিযাই খেলা হইতে পারে, সবই তখন তাহার অধীন - নিজের অধীনে নিজে, একেতেই সেই দুই এর পূর্ণাঙ্গীন প্রকাশ, দুযেতে সেই একই - এক দুয়ের আব প্রশ্নই বা কোথায়?

দেখিলাম আপনা হইতেই সে রাত্রিতে শোওযা আব হইল না, তিন দিন একেবারে নিরম্বু উপবাসে কাটিল। শরীর পূর্ণ সুস্থ। সেই সময় হইতেই আপনা আপনিই কথা বন্ধ হইল। এ কি রকম জানিস, স্থিতি পাওয়া। আবার আনন্দ নিরানন্দের উপর আনন্দে ভরপুর। কেবল তাহাই নয় স্থিত হওয়া। তাহার পর

সেই স্থিতিতে অখণ্ড স্থিত হওয়া। স্থিত হইলেই হইল না। তাহাতেই যে সব, তাহা আয়ত্তাধীন। তাহা লইয়া নিজে স্বাধীনভাবে খেলা আর কি। খেলা - যেখানে খেলা অখেলার প্রশ্ন নাই, যা তাই। তাইত চাই।

এ শরীর সাধক সাজিয়াছিল। সাধনার খেলার পরিসমাপ্তিতে যখন নিজে কে? তার পরিচয়টা প্রকাশ, তখন এই প্রকাশে জিজ্ঞাসা আসিল কে? ক্রিয়া, কর্ম, কর্তা, তিন যেখানে অভেদরূপে পূর্ণ প্রকাশ। ধর না, মেঘমুক্ত সূর্য আর কি।

অন্যান্য বাক্য প্রকাশে ঐ স্থিতি। সহজভাবেই প্রকাশ, উপস্থিত এইভাবে কথা হইবে না। তখন শান্ত, গম্ভীর, মৌন। এটা বাক-সংযমের মৌন ধারণ নয়। শুধু ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা মুখ দিয়া বাহির হওয়া না। ভগবৎ কথা আলোচনাও সাধারণ ভাবে না। সেবার প্রয়োজনে ভোলানাথেব সহিত অস্ফুট যতটুকু ততটুকুই কথা হইত ত। পরে অন্তর্জগতের কথা, বহির্জগতের কথা, যাহা আলাদা আলাদা তোমাদের কাছে - তাহার গন্ডিটা ক্রমে ক্রমে কুন্ডলীভঙ্গে সহজ ব্যবহারে শরীর চলিত। নিত্য ক্রিয়াদি আর রহিল না। কেবল মৌন আর কোন কোন দিন কুণ্ডলী' দিয়া কথা।

প্রশ্ন ঃ - ঐ প্রকাশের পর কুণ্ডলী, মৌন ইত্যাদি এই ক্রমটা আবার কিরূপ?

মা - ক্রমরূপে ধারা প্রকাশের জন্য। নিজেই নিজ ধারারূপে প্রকাশ করিয়া ধারার ক্রমের পরিপূর্ণতা প্রকাশ হইল। উপমা যদিও সর্বাঙ্গীন হয় না। ধর না, যুবরাজের রাজত্ব লাভের জন্য ক্রম শিক্ষা ক্রিয়াদি আবশ্যক। রাজ্য প্রাপ্তিতে রাজার কাজ কর্ম - সে ত রাজার ক্রম ক্রিয়া নয।

প্রশ্ন ঃ - ধারারও ত কত রকম ধারা আছে। সম্প্রদায়েরও ত কত রকম সম্প্রদায় আছে। তবে ধারা বলিতে কি বুঝিব?

মা - আরে! এ সব যে খাস তালুকের খাস মহালের ক্রিয়া। সব ধারা সব যে ধরা। আবাব শব ধরাটাও ত ইহাতে কি? মহামূল অখণ্ড বাজত্বে যে। আরে! তোমরা যাঁহাকে 'যিনি' বলিয়া মনে কর, এ যে তাঁহার রূপ (মা নিজের শরীরকে নির্দেশ করিলেন)। তুমিই ত - সর্বরূপেতে, তাই আলাদা আলাদা কর কেন? আরে বাবা! দুইভাবে কিন্তু দ্বন্দ্ব দুঃখে, মনে রাখিও। ভাব না কেন - জগতের গুরু যিনি, আমার গুরুও তিনি। আমার ইষ্ট যিনি, জগতের ইষ্টও তিনি। আমার গুরু ইষ্টতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরু, ইষ্ট। অনন্ত আকারে, অনন্ত

প্রকারে, অনন্ত ভাবেতে একমাত্র তিনি-ই। কোন ধারা বাদ যায় না যে ধারায় ঐ ধাবা জানিও।

অবস্থা শোন - এটা কোন সাধকের শিক্ষা লাভ করিতে করিতে ক্রমোন্নতিতে যেখানে আবরণ নষ্ট, পরম স্থিতি এই প্রকাশে আর ঐ উল্লিখিত ধারাব প্রশ্ন আসে না। এই প্রকাশে সেই অখণ্ড প্রকাশ বাহির ভিতর এক হইযা স্থিতি, যা লক্ষণ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ গ্রন্থাদিতে আছে - শুদ্ধ, চিৎ, ব্রহ্ম। এই ছোট্ট মেয়েটা এখানে ত তোমাদের এলোমেলো। এই দিকটা হইবে বলিয়াই খেয়ালে নিজেতেই নিজে ঢাকিয়া আবার ধারা। আরে, তাঁহাতেই সব কিনা, এইটাই মনে কর। তাহা হইলে ঐ ধারা আবার কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন আসিবে না। বুঝিবে, তবে ত মজিবে। তিনি মৌজী কিনা, তাঁহার মৌজ আর কি। অন্তে অনন্ত, অনন্তে অন্ত - ঐ যে যা-তা।

প্রশ্ন ঃ - তাঁহার মৌজ। মা! তুমি 'তাঁর-তাঁর' বল কেন? আমরা ত তাঁহাকে চিনি না। যাঁহাকে চিনি তাঁহাব কাছে -

মা - তাঁহাকেই ত চিনিবার জন্য। মানে আপনাকে জানা। 'তাঁর-তাঁর' করা তোমাদের জন্যেই জানিও।

ক্রমে তিন বৎসর অন্তে হস্ত-কুন্ডলী বন্ধ হইয়া পায়ের কুন্ডলী আরম্ভ হইল। পরে সর্বব্যাপক - সকলের মধ্যে চলন বলন সহজ।

প্রশ্ন ঃ - পরে কেন তবে আবার বাহ্য ভাবাদির প্রকাশ?

মা - বাঃ! তোমাদের মত শোওয়া, বসা, চলা, ফেরা, হাসি খেলার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর না? হ্যাঁ, একটা সময় গিয়াছে - এ জাতীযটাও ছিল না। তবে জানিও এইটা যেমন, ঐটাও ঠিক তেমনই, এ শবীবেব কাছে। তবে ঐ ভাবাদি কিন্তু অজ্ঞানের জীবত্বের মধ্যে আবেশ ভাবাদি নয ভাবের প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটাই জানিও ঐ খেলায় - যখন যাহা হইযা যায। বাবা । তুমিই ত আমি, আবাব আমিও তুমিই। আবার দেখ - 'আমি তুমি'র প্রশ্নই নাই। যে যা বল তাই, কোন গোলমাল নাই। কর্মেরও বাঁধন নাই, অকর্মেবও বাঁধন নাই। নিষ্কাম কর্ম, কর্ম-ত্যাগ, এর কোন বাঁধন যেখানে নাই, নাইটাও নাই কিন্তু। তোমাদের এলোমেলো মেয়েটা আর কি!

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের শেষে মা আবার পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন

- এই সময় এই শরীরের একটা মহান সর্বাত্মক ভাব। নিজেব খেয়ালেই আবার খেলা এবং তাহার পর অন্য ধারায় খেলাটা আরম্ভ হইল। এ কথা বন্ধ - সাধারণ মৌনী থাকা নয়, বা বাক্ সংযম করা তাহাও নয়। কথা বন্ধ আপনিই হইয়া গেল, কাহারো সহিত কথা বলিবার ভাবই রহিল না। ঐ কেমন একটা প্রকাশের পর আপনা হইতেই বহির্জগতের বাক্যের সঙ্গে গভীরভাবে কথা বন্ধ রহিয়া গেল, ভিতরে যন্ত্রের মত নিরন্তর আপনা আপনি সে-ই চলিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত। সাধারণতঃ যাহারা মৌন অবলম্বন করিবে, তাহাদের মন তাঁহাতেই থাকা। তাঁহাকে ছাড়া ক্ষণেকের জন্যও যদি থাকা হয়, তবে মৌন ভঙ্গ হইয়া যায়।

তিন দিনের পর যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন দেখা যাইত, প্রথম গ্রাস নিবার সময় কিছু অন্ন ব্যঞ্জনাদি মিলাইয়া রাখা হইত এবং যেমন নিবেদন করা সেইরূপ হইত। পরে খাওয়া শেষে তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পূজোর ফুল বা দ্রব্যসামগ্রী প্রথা অনুযায়ী জলে বিসর্জন দেওয়ার ন্যায়। কয়েকদিন এইরূপ চলিয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ কাহার জন্য?

মা বলিলেন - ঐ স্থিতিতে কাহাব জন্য তোমরাই বাহির করিয়া লও। প্রথম তোমরা যখন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষা পাও, তখন যেমন অজানিতভাবে গুরুর আদেশমত সাধনা করিয়া যাও এবং সাধনা করিতে করিতে ক্রমোন্নতি। গুরু শিষ্য যেখানে প্রত্যক্ষ, ভিন্ন এবং অভিন্নরূপে স্বয়ং প্রকাশ, তাহার যতটুকু ক্রিয়া ততটুকু ত চাই। এখন স্থান বুঝিয়া বাহির কর।

মা আবার পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন - পৌষ মাসের ১৩-১৪ তারিখের মধ্যেই ঐ রকমটা হয়।[৫] সেই হইতে প্রায় ৩ বৎসর কথা বন্ধ ছিল। সে সময় নিজের ভাবে থাকা হইত। তখন ভবিষ্যতের জাগতিক অনেক ঘটনার প্রকাশ, মন্ত্রাদির মত এই শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইত। কখনও কখনও ঐ সব বিষয়ে নিজেই প্রশ্ন করিতাম, নিজেই শুনিতাম।

বাসার বাহিরে যাওয়া আসা বিশেষ করা হইত না। আর কেহ স্পর্শ করিলে বিজলী গায়ে লাগিলে যেমন ধাক্কা লাগে, সেইরূপ শরীরে বোধ হইত। শরীর অবশ হইয়া বসিয়া পড়িত। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া পরে স্তোত্রের মত

[৫] ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২২, বৃহস্পতিবাব।

মন্ত্রাদি বাহির হইলে নেশার ভাবে উঠিয়া পড়া হইত। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত শরীরে ঐ ভাবটা চলিত। সে সময় সকল মনুষ্য বা বস্তু ইত্যাদির ভিতর দিয়া ভাব অভাব যাহাই থাকুক না কেন, ২৪টি ঘন্টার একটা নিত্য আনন্দ শরীরের ভাবে প্রকাশ থাকিত। হঠাৎ শরীরের কোন স্থানে ব্যথা পাইলে সে-ও যেন ঐ একই আনন্দ। বিচার আসিত, এইরূপ নির্লিপ্ত অবস্থায় সাধকের সঞ্চিত কর্মগুলি ক্ষয় হইয়া যায়। কর্ম সৃষ্টি হয় না। আবার কোন লৌকিক আনন্দ দেখা দিলে বিচারে আসিত ইহাও ত ভোগের সৃষ্টি করে। এই প্রকারে যে যত জাগতিক দিকে ভোগ করে, তাহার তত কর্ম বন্ধন বাড়িয়া যায়। সর্বক্ষণই এইরূপ বিচার চলিত ও এক খেয়ালে মহা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সময় বিশেষ আসনাদি, মূর্তি দর্শন ইত্যাদি একেবারে অন্তর্হিত হইযা গিয়াছিল। ভিতবে বাহিরে এক সত্তার আনন্দে আর কোন বিষয়েরই স্মৃতি - বিস্মৃতির দিক না।

ভোলানাথ এইসব অবস্থা ভালরূপে লক্ষ্য করিত, জিজ্ঞাসা করিত। এইসব অবস্থার শেষ পরিণতি কি? এ শরীবেব কিন্তু ভূত - ভূবিষ্যৎ সব কিছু দর্পণে মুখচ্ছবির মত স্পষ্ট দেখিয়াও তাহার নিকট প্রকাশ কবিবার খেয়ালটা হইত না।

একদিন কালীকচ্ছের মহেন্দ্র নন্দী বাজিতপুরে আসিয়াছিলেন, এ শরীরের সম্বন্ধে নানা লোকের নানা কথা - মাথা খারাপ, ভূতের দৃষ্টি, দেবতার দৃষ্টি, হিষ্টিরিয়া এইসব কথা উঠিয়াছিল। ভোলানাথ আমাকে মহেন্দ্র নন্দীকে দেখাইল। তিনি ডাক্তার ও সাধু বলিয়া পরিচিত। তাহাব সম্মুখে গিযা হাত দুই দূরে বসিলাম। নিঃশব্দে অবগুন্ঠন খুলিয়া বাহিরেব লোকেব নিকট বসা এই প্রথম। তিনি স্থির দৃষ্টিতে এ শরীরের দিকে চাহিযা রহিলেন। পরে ভোলানাথকে বলিলেন। ইহার ভাবগুলি খুব উচ্চ। আপনি অসুখ বা অন্য কোনরূপ বলিযা চিন্তা করিবেন না। ইহার ভাবে কদাচ বাধা দিবেন না। (ইহা দীক্ষাব খেলাটাব কিছু পরের ঘটনা।)

মৌন হইবার পূর্বে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসই নানারূপে নানা ভাবে ঐ জপ, পূজা, যোগক্রিয়া, আসন ইত্যাদি হইতেছিল। যখন যে কোন ক্রিয়াদি একবার প্রকাশ হইয়া, পরিবর্তন হইয়া পূর্ব ক্রিয়া বা নিয়ম হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত তখনও কোন অভাব বোধ হইত না। অর্থাৎ ঐ জপ বা ঐ পূজা বা ঐ আসন ইত্যাদি কর্ম আর হইতেছে না, ইহাতে কোন সংশয়েব ভাব জাগিত না। ইহার কারণ

এই যে নিঃসংশয়ে স্ব-প্রকাশ কিনা। কিন্তু যখন সাধারণভাবে সাধকের সাধন চলে, তাহা দেহের কোন দেবতার ধ্যান, পূজা, জপ ইত্যাদি যে কোন রকমে ক্রিয়াদি পূর্ণাঙ্গরূপে সমাপন হয় তখন সম্বন্ধীয় সংস্কার কাটিয়া চিত্ত নির্মল হয়[৬] বলিয়া সেই সেই বহু প্রকাশ হইতে পারে।

১) যদি মন্ত্র চৈতন্য অর্থাৎ মন্ত্রের দেবতা, রূপ, গুণ বা তত্ত্ব ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হয়, জ্ঞানের উন্মেষ হয় তবে ভিন্নভাবে বাহ্য ক্রিয়াদির বিষয়ে সাধকের আর আকর্ষণের রূপটি খণ্ডভাবে থাকিতেই পারে না।

২) যোগীরা যোগক্রিয়া করিতে করিতে যখন তাহারা একযোগে যোগযুক্ত যে আছে তাহা প্রকাশিত হয় তখন তাহাদের যোগসহ মীমাংসা নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যায়।

৩) যাহারা জপ পূজা করে, উপাসনায় উৎকর্ষে যখন আপন আপন উপাস্য দেবশক্তির উন্মাদনায় আত্মহারা হয়, তখন কোন সময়ে তাহাদের বাহ্য অনুষ্ঠান দূরে সরিয়া পড়ে।

৪) আর যাহারা জ্ঞান বিচারে তাঁহার অনুসন্ধানে তৎপর হয়, তাহারা যতই অগ্রসর হয়, বুদ্ধি বিচারের পরপারে যাইয়া আমি তুমির একত্ব উপলব্ধি করে।

কথা বন্ধ হইবার সাথে সাথে শারীরিক ক্রিয়াদিও ক্রমে ক্রমে সব বন্ধ হইয়া আসিল। গৃহ কর্মাদির পরও বেশ সময় পাওয়া যাইত। সে সময সর্বক্ষণ আপনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের খেয়ালে থাকা হইত। তখন প্রথম উদ্ভূত মন্ত্রটি খেয়ালে থাকুক আর নাই থাকুক ভিতরে ভিতবে কণ্ঠে আলজিহ্বা ও গলায় লাগিয়া লাগিয়া টক্ টক্ করিয়া ঘড়ির আওয়াজের মত পরিষ্কার উচ্চারিত হইত। যখন এইরূপ হইতে লাগিল তখন শরীরটার এক খেয়াল হইল। ইহা কি? নিজ হইতেই বলা হইল ও কানে শোনা হইল ঐ বীজটির ধ্বনি। সেইটি বেশ আপন কাজ করিয়া যাইত। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বহুবার করিয়া যাইত। কখনও শ্বাসের পরিবর্তনের কোন ক্রিয়া হইত না। পরে যখন আপনিই এ জাতীয়টা কখনও অপ্রকাশ হইয়া গেল তখনও দেখা যাইত কি, এই জপটা যে হইতে ছিল সেও যা, এখন না-হওয়াও সেই একই গতি। বাহ্য ক্রিয়া অন্ত-ক্রিয়ার গতি একই ত।

[৬] মনের সূক্ষ্মতম স্তব।

কিন্তু হঠাৎ তোমরা কেহ মহা ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া আসিতেছ, জগতের এক্‌সিডেন্ট জাতীয় কিছু লইয়া তখন আপনিই হঠাৎ করিযা ক্ষণিক ঐ জপটি কণ্ঠে হইতে থাকিত। এ শরীরের কোন ব্যস্ততা দিবা রাত্রের মধ্যে কোনও সময়ই না, জানিও। ধর না, যেন ঐ অক্ষররূপে আড়াল দিয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া গেল, স্থিতি খণ্ডিত না হইয়া। পরে তাহাও বাস্। এইরূপে চলিয়াছিল।

একদিন উষাদিদির বাসায় গিয়া দেখি সে কি এক বই পড়িতেছে। ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলাম - কি বই? সে বলিল - মহাভারত। তুমি পড়িবে? সে এক খণ্ড হাতে দিল। তাহা লইয়া চলিয়া আসিলাম। পুস্তকাদি পড়া অভ্যাস ছিল না। সেই দিকে খেযালও যাইত না।

একবার ভোলানাথ একখানি বই দিয়াছিল, প্রথম ভোলানাথের বাড়ি যাওযাব পরে। থামিয়া থামিয়া উহার কয়েক পাতা পড়া হইয়াছিল। এই কারণে এবং সরল ভাষাও বোধগম্য প্রকাশ নয় দেখিয়া ভোলানাথ আর বিশেষ কোন পুস্তক কিনিয়াও দেয় নাই, পড়ার কথাও বলে নাই। সেইদিন উষাদিদির নিকট হইতে মহাভারতখানি আনিয়া খুলিয়া পড়িতে বসিতে দেখি - অক্ষরে দৃষ্টি পড়িল কণ্ঠের বীজমন্ত্রটি বন্ধ হইয়া যায়। আবার দেখি - যখন বীজমন্ত্র টির দিকে খেয়াল যায় তখন অক্ষর দেখিলে 'ঐগুলি কি' বোধ হয না বা পড়া যায় না। অক্ষরে আবার চোখ পড়িলে শ্বাসও বন্ধ হইয়া আসিত। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতাম। পবে আবার অক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়িলে দেখা যাইত অক্ষরের চারিদিকে একটি জ্যোতি। তাহার পর অক্ষরটির পাশে আব একটি হালকা জ্যোতিচ্ছটা অক্ষর। পরে অক্ষরটিও সুন্দর শুভ্র জ্যোতির্ময়। মূর্তি দেখিলেও কখনও কখনও এইরূপ হইত - জ্যোতির্ময় প্রকাশ। এমনও হইত এক অক্ষরের দৃষ্টি পড়িলে অপর অক্ষর বে-খেয়াল হইযা গায়েব হইয়া যাইত। কাজেই লাইন ধরিয়া আর পড়িয়া উঠিতে পারা যাইত না, বীজমন্ত্রটি আবাব আপনা হইতে চলিতে থাকিত। তাই পুস্তকখানি ফেরৎ দিলাম।

বাস্তবিক যদি একবার স্বাভাবিক জপ আরম্ভ হয় তাহা হইলে আর অন্য কিছু বলিবার, পড়িবার, শুনিবার বা দেখিবার অবসর থাকে না। লক্ষ্য পড়িলে দেখা যাইত, খাইতে বসিয়া, চিবাইতে চিবাইতে নাম চলিতেছে। হাতে কোন কাজ কর্ম করিতেছি, তখন চোখের দৃষ্টি অক্ষরেব দিকে গেলেও নাম বন্ধ হইত

না। খেয়াল থাক আর না থাক টক্ টক্ করিয়া নাম চলিত। ক্রমশঃ দেখা গেল, পড়িয়া থাকার অবস্থা (অর্থাৎ সমাধির অবস্থা) বাড়িতে লাগিল। সেই কারণে সকল সময় ঐ বীজটি আর হয় না। কোন্ সময় যে বন্ধ হইয়া যাইত খেয়ালও থাকিত না। পুনরায় খেয়াল করিতে গেলেও ঠিক ঠিক কখনও হইত না। পালাইয়া পালাইয়া যাইত। হঠাৎ আবার কোনও সময় আপনা হইতেই চলিতে থাকিত। ইহা দ্বারা বুঝিবে যদি এক সত্য লক্ষ্য করিয়া কেহ অগ্রসর হয় তবে পথের মধ্যে যাহার যাহার সংস্কার অনুযায়ী নানাবিধ ভাবের খেলা আসিয়া পড়িলেও, প্রথমে লক্ষ্যটি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া দেখাইতে চলিতে থাকে।

কি যেন এক অভিনব ভাব প্রবলবেগে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সে ভাবটি স্থির হইয়া গেল। খেয়াল হইতে লাগিল ঐ বীজের খেয়ালটি যেন মিলিয়া মিলিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে বুঝিবে সাধারণ ভাবে যাহারা সাধন আরম্ভ করে তাহাদেরই যে পর্যন্ত নিজের দেহাত্মবুদ্ধি ও নাম, রূপ, গুণ, ভাব, অভাবের গণ্ডিবদ্ধ সংস্কার ইত্যাদির দিক আছে, ততক্ষণ এই নাম ও রূপ আলাদা আলাদা রূপে। যে সংস্কার যখন দূরীভূত হইতে থাকিবে, তখন অজপা যোগে সেই মহাযোগে যাইতেই হইবে। অনেকটা আগুনে পতঙ্গ পড়িবার মত।

আরও একটা দিক শোন - পূর্বে কিন্তু কদাচিৎ শরীরের কোনরূপ ব্যস্ততা দেখা দিলে তখন ঐ বীজটি হঠাৎ কণ্ঠে উঠিয়া পড়িত, ক্ষণিক আপন কাজ করিয়া আপনা হইতেই আবার বন্ধ হইয়া যাইত এবং ব্যস্ততা শান্ত হইয়া যাইত।

কোনও সময় আবার ইহাও দেখা যাইত, তোমাদের দৃষ্টিতে সাময়িক জগতের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বা তাহার আশঙ্কা হইলে একটি চক্র আসিয়া সামনে ঘুরিতে থাকিত। যে অখণ্ড ভাবধারাটা আছে, তাহার উপর কোন বাধা বিঘ্ন আসিবার আশঙ্কা হইলে তাহা ঐটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত। ঐ একটি ভাবের কাছে অন্য কোন ভাব দাঁড়াইতে পারিত না। তখন পূজা প্রভৃতি দেখা বা বাহিরের কোন তামাসা ইত্যাদি এই সবই আলাদাভাবে দেখা বা খাইয়া, পড়িয়া, শুইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোধ করা ইত্যাদি অন্য কোন বিষয়ই সেই ভাবের নিকট আলাদা ভাবে আর স্থান পাইত না। জগতের শোক, দুঃখ, ভয, উহার ভিতর স্থান পায় না। একটি বিরাট, উদার, শান্ত ভাব অবিচ্ছিন্নরূপে এমনভাবে চলিতে থাকিত যেন নিজেতেই নিজে জমিয়া আছে। শরীরটা দেখিতাম কলের পুতুলের মত গৃহের কর্মাদি নিখুঁতভাবে করিত। অতিথি সেবাও, কোন কথা বলি না

বলিয়া কোন অসুবিধা হইত না। দেখিতাম বসিয়া আছি, হঠাৎ শরীরটা উঠিয়া গেল। কোথায় যাইবে বা কি কাজ করিবে কিছুই ভাবিল না। কিন্তু হাত যথাস্থানে যাইয়া কাজ করিতে লাগিল। পরে দেখা গেল বাহিরেব দিক দিয়া সে সময় সে কাজের দরকার ছিল। খেয়ালে আসিল মন আর কোথায়? মনটা কি ভগবান হইতে আলাদা কিছু মানা - ইহাই ত মন। কি এক আনন্দের প্রকাশে নিজেতেই নিজে, আনন্দ স্বরূপ স্বয়ংই। শরীরটা যাবতীয় কাজ কর্ম নিয়া হাসি কান্নার ভিতর এক ভাবেই খেলিতে থাকিত। নিজের আলাদা বুদ্ধি বিচার বা চেষ্টা করিয়া কোন কাজ করা সে সবের এখানে আর স্থান কোথায়?

শিশু যেমন আনন্দে নৃত্য করিবার সময কিছুই দেখে না। কেমন করিয়া নাচিবে বা কোথায় পা ফেলিবে, ততটুকু সময়ের জন্য সে একেবারে আপন খেয়ালে তন্ময় থাকে। এই শরীরটাও যেন সর্বক্ষণ এক ভাবে খেলিত। এ উপমাও এখানে চলে-না যেন। মানুষে দেখিতে বুদ্ধি বিচার কবিয়া কাজ কর্ম করিতেছে। কিন্তু এ শরীর যে কি করে আর কি ভাবে চলে তাহা কেমন করিয়া বুঝান যায়। বুঝাইবার ভাবও আর আসিতেও পারে না।

সাড়ে ৫ মাস ক্রিয়াদির পর সকল কার্যাদি শেষ করিয়া এ শরীবের আহাবাদি কবিতে করিতে প্রায়ই ভোর হইয়া যাইত। ইহার ভিতর কোনরূপ শারীরিক অসুখ বা ক্লান্তি ছিল না। তিন দিনের উপবাস শেষ হইবাব সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন হইতে দ্বিপ্রহরে আহারের ব্যবস্থা আপনাভাবেই হইয়া গেল।

দৃষ্টিতে আরোগ্য

ইহার ভিতর একদিন ক্ষেত্রপাল[৭] তাহাব অসুস্থ ছেলেটিকে নিয়া আসিল। ছেলেমানুষ কোন কোন সময় কাহাকেও না বলিয়া হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইযা যাইত এবং জঙ্গলে, ছাড়া বাড়িতে বা খালি ঘরে যাইয়া পডিযা থাকিত। ক্ষেত্রবাবু অনেকরকম তাবিজ কবজ, চিকিৎসা, পূজাদি করাইয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল পান নাই। শেষে হতাশ হইয়া তাহাকে এখানে আনিয়াছেন। ছেলেটি আসিয়া দূব হইতে এ শরীরকে নমস্কার করিল এবং তাহার উপব অতি সামান্য সময়ের জন্য এ শরীরের দৃষ্টি পড়িল। সে পরে ভাল হইয়া গিযাছিল।

[৭] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত ওঝা ক্ষেত্রপাল হইতে ইনি ভিন্ন।

মায়ের নামে শিব পূজা

এ শরীরের পিতা অবস্থাদি শুনিয়া একদিন দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া এ শরীরের নমস্কারের খেয়াল একেবারেই আসিল না। ইহাতে তিনি অবাক হইলেন। ভোলানাথ এ শরীরের সব অবস্থাদি তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে পর তিনি বলিলেন - ইহার এইরূপ ভাবাদি পূর্বে জানিলে, ইহাকে সংস্কৃত পড়াইতাম।

ইহার ভিতর শিবরাত্রি আসিয়া পড়িল। তিনি ৪/৫টি শিবপূজা করিলেন। এ শরীরের নামেও একটি শিব ছিল। বাবা যখন এ শরীরের নামে শিবপূজা আরম্ভ করেন যদিও আমাকে জানান নাই যে আমার নামে শিব পূজা করিতেছেন, তথাপি সেই সময় এ শরীরের মুখ হইতে নানা প্রকার সংস্কৃত মন্ত্র শ্লোকাদি বাহির হইতেছিল। তিনি এ সব শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন।

অসীমের আভাসে সীমার বন্ধন ক্ষয়

আমরা যে ঘরে থাকিতাম তাহারই এক কোণে একটি পর্দার আড়ালে লক্ষীর আসন পাতিয়াছিলাম। প্রথম হইতে সেইখানে বসিয়াই ক্রিয়াদি করিতাম। যখন কণ্ঠে জপ ভিন্ন অন্য অন্য ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, তখনো আমি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সেখানে বসিতাম। কিছুক্ষণ বসিলে চোখ বুজিয়া যাইত। সেই আসনস্থিত অবস্থায়ই মহা আনন্দ ও ঐ স্থিতি। কেমন একটা ভাবে সামনের দিকে মাথাটি মাটিতে পড়িয়া থাকিত - অচল, অটল। ভূমধ্য হইতে একটি স্পর্শ অনুভব হইত আবার তথায় আকাশের মতও দেখা যাইত, উহাতে নানা রকমের রংয়ের আভা একটির পর একটি গাঢ়ভাবে প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ হালকা হইয়া মিলাইয়া যাইত। একটি চক্ষু বন্ধ ভাবেই প্রকাশ।

উক্ত অবস্থার ভিতরই পাড়ার মাত্র চারটি বাড়িতে এ শরীর যাওয়া আসা করিত অন্য কাহাকেও ছোঁওয়াও হইত না।

দূরবর্তী অন্য আর একটি বাড়িতে একটি মেয়ের বিবাহ হইবে। ভোলানাথ সে বাড়িতে যাইবার জন্য বলিল। তাহাকে বলিলাম যে অমুক তারিখের পর সেখানে যাইতে পারি। কিন্তু বিবাহের দিন তাহার পূর্বেই ছিল। ভোলানাথ বলিল তাহা হইলে তোমার যাওয়া হইবে না দেখা যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হইয়া গেল যে বিবাহের দিন পিছাইয়া গেল।

শুভ বিবাহের পরদিন লোকাচারানুযায়ী সকলের সঙ্গে মিলিয়া মেয়েদের কপালে সিন্দুর দিলাম। তাহাতে বিদ্যুতের ধাক্কার মত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। ঢল ঢল ভাবের সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হই। ইহার পূর্বে রাতদিন এমন ছিল বেশিক্ষণ কাহাকেও ছুঁইযা থাকিতে পারিতাম না। শরীর যেন আপনা হইতে সরিয়া আসিত। ইহার অনেকদিন পরে দেখিলাম মাটি স্পর্শ করা এবং অন্য কোন লোকজন স্পর্শ করা, এক সমানই বোধ হইত। অসীমকে পাইতে হইলে প্রথমে সীমার ভিতর আপনাকে বদ্ধ রাখিয়া চলিতে হয়। অনন্তের ও অসীমের আভাস আসিলে আস্তে আস্তে আপনা হইতে সীমার বন্ধন খুলিয়া যায়।

কুন্ডলী দিয়া কথা বলার সূত্রপাত

একদিন ভোলানাথের ভাই যামিনী আসিবে খবর আসিল। আমি কথা বলি না। ভোলানাথ বলিলেন - যামিনী বহুদিন পর আসিতেছে, তুমি কথা বল না। এ কেমন হইল? যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া নমস্কার কবিতে চাহিলে আমি সবিয়া গেলাম। সে মহা দুঃখিত হইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বাহিরে চলিয়া গেল। পরে ঘরে ফিরিয়া দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা কবিল আমার সঙ্গেও কথা বলিলেন না।

এ শরীর দাঁড়াইয়াছিল। মুখ হইতে মন্ত্র বাহির হইল, শরীরটা আসন করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সেই আসনে একমুখী অবস্থায় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা অনামিকার মধ্য-পর্ব স্পর্শ করিযা বাম দিক হইতে ডান দিকে একশ্বাসে এক টানাভাবে মাটির উপর প্রথম একটি বৃত্তাকাব রেখা পাতিলাম। সেই রেখার উপব আর একটি রেখা, তাহাব উপব আব একটি রেখা দিয়া আসনটি বেষ্টন করিলাম। সেই সময় শরীরের ঊর্ধ্ব ভাগ নড়িলেও আসন স্থিব ছিল। পরে ভিতর হইতে আসিল - ইহাকে 'কুন্ডলী' বলে। পূর্বে কুন্ডলীর নামও শুনি নাই, কুন্ডলী করিতে করিতেই মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। পরে অতি ধীরে ধীরে মুখ হইতে নির্গত হইল - কি কথা শুনিবেন, কি কথা বলিবেন, বলুন।

এই প্রথম কুন্ডলী দিয়া কথা বলা আরম্ভ হইল। কথা আপনা হইতে শেষ হইযা যাইলে মন্ত্রাদি উচ্চারণ কবিতে করিতে কুন্ডলীটি তিনবার হাত দিয়া মুছিযা পরে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতাম।

ইহার পর হইতে কোন কোন সময় যখন অপরের সহিত কথা কহিবার হইত, তখন আপনা হইতে এইরূপ হইয়া যাইত। প্রশ্নাদি করিলেও, কথা বলিবার ভাব সকল সময় হইত না। ক্বচিৎ কখনো আপনা হইতেও ঐভাবে কথা বাহির হইত। কিন্তু ইহার কোন দিন, সময় বা স্থান অস্থান ছিল না। ১৫/২০ দিন পরেও হইত, আবার ২/৩ মাসেও হইত না। কথা বলিতেছি শুনিলেই অনেকে ছুটিয়া আসিত। আসিতে আসিতেই হযত কথা বন্ধ হইয়া যাইত। যাহারা শুনিতে পাইত তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত। যাহারা শুনিতে পাইত না, তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় তিন বৎসর অর্থাৎ যতদিন কথা বন্ধ ছিল ততদিন চলিয়াছিল।

তিন বৎসরের মধ্যেই ঢাকা আসিয়াছিলাম, সকলের সহিত কথা বলিবার ভাব খুলিবার পূর্বে হইল কি, সাহবাগে একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আপনা হইতে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া হাতে কুন্ডলী দেওয়ার মত ডান পায়ে কুন্ডলী দিয়া কয়েকটি কথা অপরের সহিত বলিলাম। কথা শেষ হইলে পাযের কুন্ডলী মুছিয়া ফেলিলাম। এই জাতীয় আবার কুন্ডলীব বহিঃপ্রকাশ নয়, অথচ কুন্ডলী দিয়াই কথা বলা হইল। সাময়িক ভাবেই এইভাব ছিল।

ভোলানাথের অসুস্থতা

বাজিতপুরের কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন - কয়েকদিন হইতে ভোলানাথের শরীর ভাল নয়। প্রত্যহ রাত্রিতে কাছাড়ি হইতে ফিরেন। একদিন বিকালে আসিয়া বলিল আজ শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছি। আমি রান্না শেষ কবিয়া খাইতে ডাকিতাম। খাইতে বসিয়া বিশেষ কিছুই খাইল না। আসিয়া শুইয়া পড়িল। আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ঘরে আসিলে বলিল — আমি পায়খানায় যাইব এই বলিয়া চৌকী হইতে নামিতেই দাঁড়ান অবস্থায়ই মাটিতে পড়িয়া গেল শ্বাস প্রশ্বাস নাই। শরীর অসাড়। আমি তখন কথা বলি না। কাহাকে ডাকাও হয় না।

ইহার ভিতরে আমার মুখ হইতে সংস্কৃত মন্ত্র শ্লোক ইত্যাদি কতগুলি উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় আমি যাইয়া ডান হাতে মাথায় ও সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলাম এবং হাঁটু গাড়িয়া তাহার মাথা আমার বাঁ হাতের উপর রাখিলাম। সে সময় দেখিলাম ভোলানাথের স্থূল শরীরেব ভার একটি ছোট্ট শিশুর মতন। তখনো তাহার শ্বাস প্রশ্বাস নাই, শরীর কাষ্ঠবৎ। মন্ত্রাদি বলিতে বলিতে হঠাৎ মুখ হইতে একটি বড় শব্দ বাহির হইয়া গেল।

আমাদেব বাসার পরে এক বাসায় ঠাকুরভাই,[৮] জানকীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া খেলা কবিতেছিলেন। তাহারা এ আওয়াজ শুনিয়া দৌড়াইযা আসিল। আশ্চর্য এই যে, ভোলানাথের বাড়ির পব যে বাড়ি, সেই বাড়ির কেহ শব্দ শুনিয়া আসিল না, অথচ তাহার পরে অন্য এক জায়গায বসিযা জানকীবাবু ও মামাতো ভাই ও আরও কেহ কেহ বসিয়া খেলা কবিতেছিল। এই খেলাব মধ্যে তাহারা দুইজন মাত্র এই আওযাজ শুনিতে পাইল। ঐ শব্দের ভিতব এমনই ভাব ছিল, যাহাদের ডাকা, কেবল তাহারাই আসিল। তাহারা দেখিযা নিজেদের ভিতর বলাবলি করিতে লাগিল - সংজ্ঞা ত নাই, শেষ সময। ডাক্তাব ডাকিয়া কি হইবে? এইসব পরামর্শ চলিতেছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথ খুব ধীরে একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। একটু সুস্থ বোধ করিলে ধরিয়া পায়খানায় বসান হইল। আলকাতরার মত কালো বাহ্য হইল, অনেকেই এ শেষ অবস্থা ভাবিয়া চিন্তিত হইল। ভোলানাথকে সে রাত্রে আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলাম না, বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিলাম। সেবা যত্নে তাহার পরদিন হইতে ধীরে ধীবে ভাল হইয়া উঠিল।

ঊষাদির "মাতৃ" সম্ভাষণ

ঊষাদি ঘবের কাজকর্ম ফেলিয়া এ শরীরের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু এখানে কোন কথা বাহিব হইত না। একদিন সে আসিলে কুন্ডলী দিয়া আসন করিযা তাহাব সহিত এ সম্বন্ধীয় অনেক ভাল কথা হইল। তাহাতে সে খুব আনন্দ পাইল। আর একদিন তাহাব সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল তোমাকে দেখিলেই দেবী বলিয়া মনে হয়। দিদি না বলিয়া 'মা' বলিতে ইচ্ছা হয়। বলিলাম - বেশ ত, তাহাই হউক। আমি দেখিতেছি কি জান, একা তুমি কেন, জগতের লোক এ শরীরকে মা ডাকিবে।

পরে দেখি কি, সে আর এ শবীরের নিকট আসে না। বহু সময় কাটিয়া গেলে আমি নিজেই একদিন তাহার ঘরে গেলাম। পূর্ব হইতেই এ শরীরের হাবভাব ইঙ্গিতাদি সে অনেকটা আন্দাজে বুঝিতে পাবিত। তাই দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল - তোমার ওখানে যাই না বলিযা বোধ হয় খোঁজ কবিতে আসিয়াছ। কি করিব তোমার নিকট গেলে খুব আনন্দ পাই। সর্বদা যাইতেও ইচ্ছা হয, তবে দেখি কি, তোমার সঙ্গ পাইলে, তোমার উপদেশপূর্ণ কথা শুনিলে উদাসভাবে

[৮] মা'র মামাতো ভাই।

আমি যেন কেমন হইয়া যাই। আমি ছেলেপিলে লইয়া আছি, আমার এই রকম উদাসভাব হইলে ত চলিবে না। আমি সংসারী লোক, তাই জোর করিয়া তোমার নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করিয়াছি। ইঙ্গিতাদির দ্বারা তাহাকে বুঝাইলাম - তোমার কোন ভয় নাই। সব ঠিক থাকিবে। তুমি যাইও। তাহার পর হইতে সে আবার যাইতে আরম্ভ করিল।

বিদ্রূপের পরিণাম

একদিন এক বৃদ্ধা আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে একটু ঠাট্টার ছলে বলিতে লাগিল - একে ত ব্রাহ্মণ, এখন ত দেবতার উপর দেবতা। এ কথা কানে যাইতেই একটি প্রখর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, সে আমার দিকে চাহিয়াই জড়বৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তন্মুহূর্তে আমার হাসি আসিয়া পড়িতেই সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল আমার কোন অপরাধ নিবেন না। তখন হইতে সে এ শরীরের সহিত খুব মাখামাখি করিত।

এ শরীরের মৌনাবস্থার সময় দেখা যাইত যে যাহারা কোনও ছল চাতুরী বা অন্যায় করিত, তাহাদের উপর প্রখর দৃষ্টি পড়িলে তাহারা শোধরাইয়া যাইত। আবার যাহারা সরল, সত্যনিষ্ঠ ছিল, তাহাদের উপর ভাব-মধুর দৃষ্টি পড়িত। ইহাতে তাহারা খুব উৎসাহিত হইত। ক্ষণিকের জন্যই কখনও কখনও উক্ত ভাবাদি হইত। এই যে দুইভাবের দৃষ্টি, ইহা আপনা আপনিই চোখের ভঙ্গি ইত্যাদিতে গড়িয়া উঠিত। বাহির ভিতর, ভাব অভাবের, যোগ বিয়োগের কোনই সংশ্রব নাই, সব সময়েই একই শান্ত।

এক সাধুর পরিবর্তন

এ শরীরের কথা বন্ধের কয়েক মাস পরে এক সাধু তথাকার উকিল পাড়ায় আসিযাছিলেন। ভোলানাথ তাহাকে এ শরীরের কথা বলাতে সে দেখিতে চাহিল। আমি শুনিযা বলিলাম দেখ কি হয়। তাহার যদি একান্ত ইচ্ছা হয় তবে আসিতে পারে। পরে জানা গেল যে সে সাধুর সঙ্গ করা উচিত নয়।

একদিন সন্ধ্যায় সে আসিল। ভোলানাথ তাহাকে চৌকির উপর বসাইল। আমি নিত্য যেখানে বসি সেখানে আপনভাবে স্থির হইয়া বসিয়া আছি। ভোলানাথ বলিল - সাধু তোমার সঙ্গে কথা বলিতে চায়। ইশারায় সম্মতি জানাইলাম।

কখন কখন ভোলানাথের সঙ্গেও এরূপভাবে কথা বুঝাইতাম। আমি উত্তরমুখী হইতে পূর্বমুখী হইয়া বসিলাম। সাধু নিজের কত কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখানে কুন্ডলীও হয় না, তাহার কথার জবাবও বাহির হয় না। কিছু সময় এইভাবে কাটিয়া গেলে সে আবার বলিল - আমার কমলা ও বগলা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তখন দেখি এ শরীরের ভিতর হইতে সংস্কৃত মন্ত্রাদি বাহির হইয়া মাটিতে কুন্ডলী দিয়া বসিলাম আর সাধুর দিকে তীব্র দৃষ্টির সহিত আমার মুখ হইতে জোরে বাহির হইল - তুই কী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস? ওরে! তুই কী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস? তুই ভন্ডামী, চুরি, বাজে তাবিজ দিয়া পয়সা নিস। এই প্রকার আরো তাহার অনেক গুহ্য গোপনীয় কথা শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। এই সব শুনিয়া আশে পাশের লোক ২/৪ জন আসিয়া পড়িল। সাধু ত অবাক। সে ভীত হইয়া ঘরের দরজা একটু বন্ধ করিযা চৌকি হইতে মাটিতে নামিয়া হাত জোড় করিয়া, অতি আস্তে আস্তে, ভোলানাথকে বলিল - চুপ, চুপ। আর আমার দিকে কাতরভাবে চাহিযা বলিল - আমার অপবাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন। কি করিয়া সিদ্ধিলাভ হইবে তাহা আমায় বলুন। আমার কিছুই হয় নাই।

ইতিমধ্যে জোরে কথা বলার ভাবটা কমিয়া আসিতেছিল। বলিলাম। তবে তুমি বল আর কখনও এইসব করিবে না। সে তাহা স্বীকার করিল। পরে তাহাকে, কিরূপ পূজা করিবে, কিভাবে কর্মাদি করিলে সিদ্ধিলাভ হয় বলিলাম। যে যে পদ্ধতি তাহাকে বলিলাম, এ শরীর কখনও সেইরূপ অনুষ্ঠানাদি করে নাই, আর কাহাকেও করিতে দেখে নাই। আপনা হইতে ঐ সব মুখ দিযা বাহির হইয়া গেল। সে বেশ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আশুর উপনয়ন ও ভোলানাথের মানসিক কালী পূজা

ইহার মধ্যে আশুর পৈতা হইল। এ শবীর একা ও বাক্ বন্ধ। সব কাজই যেন কলেব পুতুলের মত ভাল মতে, শিষ্টাচার সহ হইযা গেল। এ শরীবেব সব গোছান কাজকর্ম দেখিয়া অনেকে অবাক হইত এবং খুব বিশুদ্ধভাবে চলিত বলিয়া ভোলানাথ ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিত - শুচিবাই হইয়াছে।

আশুর পৈতার সঙ্গে ভোলনাথের দুই মানসিক কালীপূজা হইল। এই উপলক্ষ্যে কাজ কর্মাদি সব এক হাতে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করা হইয়াছিল। ১০/১২ দিন পূর্ব হইতে একখানি ঘর আপন হাতে লেপিয়া, চাল, বেড়া ইত্যাদি পরিষ্কার

করিয়া, ভোগের জিনিস ইত্যাদিতে গোবর জলের ছিটা দিয়া এবং পূজার সব জিনিসাদি এমনকি ভোগের মসলাদি পর্যন্ত ভাল করিয়া ঝাড়িয়া, বাছিয়া ধুইয়া লেপা জায়গায় দিনে দিনে রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ ঘরে রাখিযা দিযাছিলাম। স্নান করিয়া অভূক্ত অবস্থায় এ সকল করা হইয়াছিল। যেদিন পূজা হইল সেদিন পূজা না হওয়া পর্যন্ত, লেপা ধোওয়া জায়গা ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। ধোওয়া জিনিস ছাড়া ছোঁওয়াও হয় নাই। পূজার এইরূপ পবিত্র ও সুন্দর আয়োজনাদি দেখিয়া পুরোহিতের বড় আনন্দ হইয়াছিল।

বিদ্যাকূটে মা

ইহার ভিতর একবার বিদ্যাকূট যাই। শরীরের এ অবস্থা শুনিয়া গ্রামের অনেকে দেখা করিতে আসিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল - ভগবানকে কি করিয়া পাওয়া যায়। বলিলাম - ব্যাকুল হইলে পাওয়া যায়। আর একজন প্রশ্ন করিল - কি করিয়া স্থির হওয়া যায়। বলিলাম - স্থিরতার জন্য অস্থির হওযা আবশ্যক। এক পন্ডিত মহাশয় ধর্মালোচনা কবিযা এবং অন্যান্য অনেকে তাহাদেব প্রশ্নের উত্তরাদি পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল।

এ শরীরের বোন সুরবালা ও হেমি ঐখানে ছিল। সুরবালার শরীর অনেকদিন হইতে অসুস্থ। বিদ্যাকূটে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল। শরীরের মা তাহাকে বলিল - তোর দিদিকে ভাল করিয়া প্রণাম কর। আর বল, যেন ব্যারাম সারিয়া যায়। কিন্তু সে কিছুতেই এইকথা বলিতে পারিল না।

একদিন আসনে বসিয়াছি, সুরবালাকে মা জোর করিয়া আনিয়া এ শরীরকে প্রণাম করিতে বলিল, সে নমস্কার করিতে আসিয়া, উপুড় হইয়া যে পড়িল আর উঠে না। ইহা দেখিয়া হেমি মাকে ডাকিয়া বলিল, দিদি উঠিতেছে না। মা ধরিয়া দেখে সুরবালা সংজ্ঞাহীনের মত হইয়া আছে। মা বলিলে এ শরীর তাহাকে ধরিয়া তুলিল। সুরবালা বলিল - আমি এতক্ষণ কোথায় যে ছিলাম মুখে তাহা ব্যক্ত কবিতে পারিনা। তখন মা ভাবিলেন তাহার অসুখ সারিবে না। এ শরীরও তাহাই ইঙ্গিত করিল।

সুরবালা আর বেশি দিন নাই, ইহা ত জানিতাম, সেই খেয়ালে এ শরীরের একটা কান্না কান্না ভাব ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পাইল। পরে বিচারে আসিল - এইসব ত তাঁহার খেলা। শরীরবোধ জনিত দুঃখ মাত্র। দেখিলাম কান্নার ভাবটা

যেন বাতাসে মাথার চুল উড়াইবাব মত বাহিবেই প্রকাশ পাইতেছিল। ক্ষণিক জাগতিক হিসাবে মানুষের মনের ভিতর বন্ধনের ভাবগ্রন্থিতে সংস্কারগুলি আটকান থাকে এবং সময়োচিত শরীর নিয়াও খেলা করে। ঘাম বাহিব হইলে যেইরূপ শরীর ক্ষণিক ঠান্ডা বোধ হয়, তদ্রুপ অশ্রুপাত, হাসি ইত্যাদির দ্বারা ভাবগ্রন্থি শিথিল হইলে ভগবানের জন্য প্রকৃত কান্না বা প্রকৃত হাসি বাহির হয়। জড়তার দরুণ এ সব গ্রন্থির কাজ সাধারণের উপর থামিয়া থামিয়া হয়। তাই তাহাদের কান্না বা হাসি বেশিক্ষণ চলিতে পারে না এবং বন্ধনভাবও সহজে কাটে না।

সাধনার একমুখী অবস্থায় হাসি বা কান্নার কোন কারণ আসা মাত্রই প্রবল বেগে সাধককে অভিভূত করিয়া আবশ্যকীয সময় চলিয়া ভাবগ্রন্থি খুলিয়া দেয়। যাহাদের উচ্চাবস্থা তাহাদের সকল গ্রন্থি খোলা থাকে। হাসিকান্না একই ভাবে তাহাদের শরীর দিয়া অস্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পাইতে পাবে এবং কখনো কখনো রৌদ্র ও বৃষ্টির মত যুগপৎ খেলিয়া যায়। এ শবীরে সকলের জন্যই হাসি বা কান্নার ধারা একই সমান।

একদিন মায়েব খুব জ্বর হয। বাক্‌বন্ধ অবস্থায ১২/১৩ দিন যাবৎ তাহাদের সংসাবের সব কাজকর্ম এ শরীরকেই কবিতে হয়। মার অবস্থা খারাপ দেখিয়া এ শরীরের পিতা একদিন বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন, এ শবীরটা তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া মার নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মা সেইদিন হইতে ভাল হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভোলানাথের সাহবাগে বদলী

একদিন ঢাকা বড় কাছারি হইতে হঠাৎ খবর আসিল ভোলানাথকে বাজিতপুর হইতে সরিতে হইবে। ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া এ শরীরকে নিয়া ঢাকা গেল। তথায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া আমাকে অন্যত্র পাঠাইবার স্থির করিতেছে এমন সময় এ শরীর বলিল - আরো তিন দিন অপেক্ষা কর - দেখ কি হয়। এ তিন দিনের ভিতরই ভোলানাথের সাহবাগে চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল। আমাদের তখন ২৮শে চৈত্র ১৩৩০, বৃহস্পতিবার,[১] ঢাকা গিয়া কিছুদিন পরই ৩রা বৈশাখ ১৩৩১,[২] বুধবার সেই বাগানে চলিয়া যাওয়া হইল।

সাহবাগে যাইবার কিছুদিন পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম - এখানে সিদ্ধেশ্বরী আছে দেখিতেছি। সে নামের কোন গাছ আছে কি? ভোলানাথ সাহবাগের নিকটবর্তী বুড়াবুড়ী তলায় কয়েকটি বড় বড় গাছ দেখাইল। বলিলাম - এইসব নয়।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরতি দেখিতে নিকটস্থ বমনা কালীবাড়ি যাইতাম। কালীবাড়ি হইতে একরাত্রি ফিরিবার সময় ভোলানাথের পুরান বন্ধু বাউল চন্দ্র বসাক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহার সহিত কথায় কথায় সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির খবরাদি জানা গেল। ভোলানাথ তাহাকে বলিয়াছিল সে যেন এক সময় আমাদিগকে তথায় লইয়া যায়।

একদিন আষাঢ় মাসে আমি, ভোলানাথ ও বাউল সহ সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। যাইয়া দেখি মন্দিরের গেটে ঝড়ে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ হেলিয়া রহিয়াছে। এ শরীর বলিয়া উঠিল - এ স্থান ও এ গাছই সাহবাগে থাকাকালীন দেখিয়াছিলাম কিন্তু এখানে নিশ্চয় পূর্বে আরো গাছ ছিল। তখন বাউল কহিল - হ্যাঁ, প্রবাদ

[১] ১০ই এপ্রিল ১৯২৪।

[২] ১৬ই এপ্রিল ১৯২৪।

আছে, বট, অশ্বত্থ ও চন্দন এ তিন বৃক্ষ একত্র হইয়া একটি গাছে পরিণত হইয়াছিল এবং উহা তিন্তিড়ী বৃক্ষ নামে পরিচিত হইত। আমি জানিলাম উহাই সেই সিদ্ধেশ্বরী গাছ। বাউল বলিল - সেই বৃক্ষে জ্যোতি দর্শন হইত এবং ইহাতেই সিদ্ধেশ্বরী কালীর জ্যোতির্ময়ী রূপে অধিষ্ঠান দেখাইত। ঐ বৃক্ষ হইতে সময়ে অসময়ে জ্যোতি মন্দিরে যাইত, আবাব মন্দিব হইতে গাছে আসিত ইত্যাদি। ঐ যে জ্যোতি - জ্যোতির্ময়ী কালী রূপে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী নামে আছেন।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী

সাহবাগে মৌনাবস্থায় দিন কাটিতেছে। একদিন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের পরিবার ছেলেপিলে নিয়া তথায় বেড়াইতে গিযাছে। আমাকে দেখিযা তাহারা বলিতেছে - কি সুন্দর চেহারা কিন্তু এটি বোধ হয বোবা, তাহা না হইলে কথাবার্তা বলে না কেন? তাহারা কি খাইতেছিল। এ শবীর গিয়া তাহাদিগকে একটু নুন দির্ল। তখন তাহারা বলিল - আমরা ত বলি নাই কেমন কবিয়া বুঝিল যে নূন দরকার, আবার দেখি হাসিতেছে। আহা! কানেও বোধহয় শুনিতে পায় না। পরে তাহারা চলিয়া গেল এবং বাড়িতে গিয়া এ সম্বন্ধে গল্প করিল।

তাহাদের ভিতর বয়স্করা পরে অনুসন্ধান করিয়া এ শরীরের অবস্থাদি জানিয়া তাহাদের বাড়ির একটি আট বছরের পীড়িত ছেলেকে লইয়া সাহবাগে আসিল। তাহার অচলাবস্থা। তাহাদের অন্য আর একদিন আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। সেইদিন ছেলেটি আসিলে, এ শরীর তাহাকে দেখিবামাত্র কোলে আনিযা বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ছেলেটি চুপ কবিয়া বহিল। পবে সকলে চলিয়া গেল। শুনিলাম, তাহার অসুখ সারিয়া গিয়াছে। সে একদিন সাহবাগে আসিয়াছিল, দেখিলাম খুব ছুটাছুটি করিতেছে।

আহারের পরিবর্তন

আষাঢ মাসে এই শবীরের খাওয়ার এক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। একদিন খাইতে বসিয়া দেখি কি, তিনবারে তিন গ্রাস যাহা হাতে উঠিয়াছিল, মাত্র ততটুকুই খাওয়া হইল। তাহার পর হইতে এইরূপই চলিতে লাগিল। কয়েক মাস পর্যন্ত এই ভাবেই চলিয়াছিল। দিনে একবার, রাত্রিতে একবাব মাত্র খাওয়ার নিয়ম ছিল। খাওয়ার সময় ভিন্ন অন্য সময় জলও খাওয়া হইত না। সংসারের কাজকর্ম সবই করা হইত। অন্নের বদলে যেদিন ফলাদি খাওয়া হইত সেদিনও তিনবার মাত্র মুখে দেওয়া হইত। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার বেশি মুখে যাইত না।

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে সাত দিন

সেই ভাদ্রমাসে আবার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি যাইবার জন্য ব্যবস্থা হইল। ঢাকায় অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, সন্ধ্যার পূর্বে ভোলানাথের সহিত গিয়া সেখানে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীকে ভোগ নিবেদন করা হইল।[৩] এইরকম ত আগে নিবেদন করা হয় নাই কিন্তু ভোলানাথ বলিল - ভিতর হইতে তোমার যে ভাব আসে, সেইরূপ নিবেদন কর। তাহাই করিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। তাহার পরদিন তথায় রহিলাম। দিনে এ শরীরের পিতা সিদ্ধেশ্বরী থাকিতেন, ভোলানাথ সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি কাটাইত। ২/৩ দিন গেলে বাউলও রাত্রিতে আসিয়া থাকিত।

এ শরীর সে সময় কালীর আসনের সংলগ্ন একটি খালি কুটুরীতে একাই থাকিত। ভোরে স্নানাদি করিয়া সেই কুটুরীতে প্রবেশ করিত এবং সারা দিন রাত্রি বিনা শয্যায় একবস্ত্রে শরীরটা আপনভাবে মাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখনো বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। ক্বচিৎ কখনো মন্দিরের ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইত। কেবল রাত্রে একবার বাহিরে আসিয়া কালীকে ফলাদি নিবেদন করিযা অতি সামান্য কিছু গ্রহণ করিবার পর, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার কুটুরীতে ফিরিত।

এইরূপে সাতদিন কাটিবার পর রাত্রি শেষে নিবেদিত ফলাদি গ্রহণ করিয়া ভোলানাথকে বলিলাম - চল আমরা বাহিরে যাই এবং বর্তমান আসনে, যেখানে মহাদেব স্থাপিত[৪] হইয়াছে সেখানে গেলাম। মন্দিরের দুয়ারে বাউল সমস্ত রাত্রি বসিয়া আছে, কিন্তু ভোলানাথের সহিত আসিবার সময় কোন সাড়া পাইলাম না।

পূর্বোক্ত স্থানটি জাগতিক ভাবে এই আমার প্রথম দেখা। উহা একটি ছাড়া জায়গার মত, উহার নিকটেই একটি উইয়ের ঢিবি[৫] এবং একদিকে ঐ স্থানের অর্থাৎ নীচের দিকে একটু দূরে বর্ষার জলে ভরা। তখন মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; ভোলানাথ সহ তথায় ভিজিতে ভিজিতে গিয়া এ শরীরটা তিনবার ঘুরিয়া যেখানে একটু উঁচু স্থান তাহার মাঝখানে (যেখানে বর্তমান শিব স্থাপিত আছে) চ্যাপটা করিয়া ডান হাত রাখিয়া মাটির উপর চাপ দিযা বসিল। দেখি সমস্ত হাতটি যেন

[৩] ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪, সোমবার।

[4] ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী পূর্ণস্থানে ভোলানাথজীর দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠানেব সময় মা ইহার নাম দিয়াছিলেন "মহাদেব"। দ্রষ্টব্য ঃ চতুর্থ অধ্যায়ে 'পরিচয় দান'।

[5] আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় ভোলানাথজীকে মা সাহবাগ থেকে পাঠান উই ঢিবি ভাঙবাব জন্য। অনুমান করা যায় যে এই স্থানে ভোলানাথজী পূর্ব জন্মে সাধনা করিয়াছিলেন, দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট ৫।

মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া কাঁধ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বলিয়া উঠিল - এ কি! সবই যে ভিতরে চলিয়া যাইতেছে। এ বলিতে বলিতে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল। হাত তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোয়ারার মত লালচে রঙ্গের উষ্ণ জল খুব বেগে উঠিয়াছিল। প্রায় আধ ঘন্টা কাটিয়া গেলে ভোলানাথ চল চল করিয়া তাড়াতাড়ি কালীবাড়িতে নিয়া আসিল।

যখন হাত ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল তখন কি একটি জিনিষ হাতে ঠেকিয়াছিল, উহা তাহার মধ্য হইতে হাতে করিয়া উঠিয়াছিলাম এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সংলগ্ন পুকুরে ভোলানাথ তাহা ফেলিয়া দিল। পরেব দিন সাহবাগে চলিযা আসা হইল।

তিন দিন পর কয়েকটি দ্রব্যেব ক্রিয়াব দ্বারা ঐ হস্তচিহ্নিত স্থানটি বুঝাইয়া আসিবার জন্য বাউলকে বলা হইয়াছিল এবং স্থানটি যাহাতে ঠিক বাখা হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে বলা হইল। পরে খড়ের ঘব হইলে চারিদিকে ভিত্তি উঁচু করাতে সে স্থানটি একটি চতুষ্কোণ কুন্ডের মত দেখাইত।[6] পরে টিনের ঘর হইবার পর উহা বুজাইয়া, পূর্বোক্ত কুন্ডে এ শবীর হাঁটু গাড়িয়া বসিলে যতটুকু হয় ততটুকু একটি স্তম্ভ করা হইল। পবে সে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে।

চিত্র ঃ সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ণ স্থানে বেদীর দুই পাশে বসা শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী। বেদীর উপর থামটির উচ্চতা শ্রীশ্রী মা'র বসার অবস্থায় উচ্চতার সমান

কুশারী মহাশয়ের সহিত কৌতুক লীলা

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন - যতক্ষণ 'আমার' ও 'তোমার' এই ভাব, ততক্ষণই ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবহারটাও চলিয়া গেল। আপনাব বাছিয়া বাছিয়া কথা, ভদ্রতা প্রকাশ করা, এইসব ভাব, ব্যবহার একেবারে নির্মূল দেখিয়া এ শরীরের জাগতিক সম্বন্ধীয় আত্মীয় কুটুম্বরা দুঃখ করিত - আপনি যেন সকলের হইয়া গেলেন। আমরা আপনাকে আর পূর্বের মত পাই না। এখন যেন সকলে আপনাকে নিয়া গেল।

ভোলানাথের ভগ্নীপতি[7] ঢাকা আসিয়াছেন। কথায কথায বলিলেন - সব সময় দেখি যে আপনি কোথায় কী একভাবে যেন থাকেন। আপনার কথাবার্তা আমরা পাই না, মাত্র শরীরটা দেখি। বলুন ত আপনি কোথায় থাকেন?

[৬] *মার্চ ১৯২৬, বাসন্তী পূজার উপলক্ষ্যে।*

[7] ভোলানাথজীর তৃতীয় ভগ্নীপতি - কালিপ্রসন্ন কুশাবী।

এ শরীর হাসিয়া বলিল - কেন, এক জায়গাতেই ত আছি। সবই ত এক। কোথায় আর যাওয়া আসা?

তিনি বলিলেন - আমরা এত বড় কথা বুঝি না। আপনি কেবল আমাদের হইয়া আগের বউটির মত ব্যবহার ও আলাপাদি করুন ত।

এ শরীর বলিল - কেন, আপনার কাছে বসিয়াই ত এ শরীর বউ ব্যবহারে চলিতেছে।

তিনি বলিলেন - আমরা আপনার আদর যত্ন সবই পাই, কিন্তু তবুও যেন মনে হয় আপনাকে পাই না। আমাদের থেকে আপনি যেন সকল ভাবেই আলাদা। এ কারণে আপনাকে আমরা পাওয়া সত্ত্বেও অভাব বোধ করি।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন - আপনার যে এইরূপ অবস্থা, ইহা কি করিযা হয়?

বলা হইল - দেখুন, যদি একটি মঠের চূড়া সহ সম্পূর্ণটা দেখিতে হয়, তবে নীচে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দূর হইতে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতে হয়, তবেই মঠটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। পরে মঠে যাইয়া বিগ্রহাদি দর্শন এবং যদি কাহারও ঠিক ঠিক বিগ্রহ স্পর্শ হয়, তবে পরশমণি স্পর্শের মত সেও তাহারই মত হইয়া যায়।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন - আচ্ছা! আপনার যে অবস্থাটি দেখা যায়, সেই অবস্থাটি কি রকম, বলুন ত?

এ শরীর বলিল - আমাকে একটি কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন? এই যে সামনে ফুলটি দেখিতেছেন ইহা আপনাব কাছে কেমন সুন্দর লাগে? আর ইহার উপর আপনার কেমন ভাব?

তিনি চুপ করিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, তাঁহার স্নেহ এ শরীরের উপর বাড়িয়াই গেল। যে কয়দিন তিনি ঢাকা ছিলেন এ সব আলোচনাই হইত।

পূর্বে তিনি একবার ঢাকা আসিয়াছিলেন, তখন এ শরীরের কথা বন্ধ ছিল। কেবল কুন্ডলী দিয়া কথা হইত। সে সময় তিনি এই শরীরের সঙ্গে খুব ঠাট্টা তামাসা করিয়াছিলেন। প্রথম ভোলানাথকে দেখিযা বলিয়াছিলেন - কোথায়, দেবতা কোথায? এ শরীরের কাছে আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন - আপনি যে তিন গ্রাস খাইয়া থাকেন, এক এক

পোয়া চাউল দিয়া এক এক গ্রাস নাকি? এ শরীব কিছুক্ষণ পব কুন্ডলী দিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও এই শরীরের অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় কথা হইল।

ইহার মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন - অনেক বেলা হইয়াছে, খেয়ালও নাই। আচ্ছা! আপনার যদি শক্তি থাকে আমাকে ভস্ম করুন ত। এই বলিতে বলিতে খুব হাসিলেন এবং রওনা হইলেন। এ শরীরও উঠিল। তিনি সেইবার শহরে অন্যত্র ছিলেন। এ শরীরের ও ভোলানাথের সেই সময় শহরে যাইবার কথা ছিল। তিনজনেই এক সঙ্গে বাহির হইলাম।

আমরা সাহবাগে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই বাগানে যে দুইটি কবব আছে, সেইখানে এক মুসলমান মালি ধূপ ও সিন্নি দেয়। উপরে যেদিনকার কথা বলা হইতেছে, সেই দিনও বৃহস্পতিবাব ছিল। আমবা বাহিব হইবার সময় সেই মুসলমানটি আসিয়া আমার নিকট হইতে কয়েকটি ধূপকাঠি নিয়া গেল। কুশারী মহাশয়ও কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া হাতে লইয়া সুন্দব গল্প করিতে করিতে চলিলেন। বেশ অনেকটা দূর আমরা বড় রাস্তার উপর দিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলাম।

খুব রৌদ্র। তিনি তাঁহার ছাতাখানা নিয়া এ শরীবের মাথাযও ধরিলেন। এক ছাতায় দুইজন চলিতেছি। ভোলানাথ রাস্তার অপর দিকে। ইহাব মধ্যে হঠাৎ তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। আরে! আগুন কোথা হইতে মাথায় পডিতেছে? আমাকে ভস্ম করিতেছেন নাকি? সত্যিই আপনার শক্তির পবিচয় খুব হইয়াছে আর আমাকে ভস্ম করিবেন না। ইহা বলিতে বলিতে ছাতাখানাব দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে ছাতাটি খানিকটা পুডিয়া আগুন মাথায পড়িয়াছে। আগুন কিরূপে লাগিল ইহাব অনুসন্ধানে তাহাদের মনে হইল - ভস্ম কবিবার কথা নিয়া ঠাট্টা করিতে করিতে তিনি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া হাতে কবিয়া নিতেছিলেন, সেইগুলিতে হয়ত ছাতার কাপড় পুড়িয়া আগুন তাহার মাথায় পডিয়াছিল।

রমনা কালীবাড়িতে

ভোলানাথের সঙ্গে প্রায় রমনা কালীবাড়িতে সন্ধ্যা আরতির সময় যাইতাম।[৮] আমি মন্দিরে বসিতাম। কখনো বা পড়িয়া থাকিতাম। উঠিয়া আসিতে ১০/১১টা

[৮] বমনা কালীমন্দির প্রায ৫০০ বছব পুরানো এবং "কাঠঘব" নামে পরিচিত ছিল - প্রধান দেবী

বাজিত। একদিন শুনিলাম যে প্রত্যহ রাত্রি ১০টার সময় কালীবাড়ির দরজা বন্ধ হইবে। সেইদিন হইতে রোজ কালীবাড়ি গেলেও কোনদিন সকালে চলিয়া আসিতাম বা তথায় অন্য কোনও খোলা ঘরে বসা হইত।

পূর্বে একদিন কালীবাড়িতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া আছি, দেখি ৪/৫ জন সন্ন্যাসী (যাহাদের রমনা কালীবাড়িতে ও বর্তমান রমনা আশ্রমে সমাধি আছে) তাহাদের সহিত মন্দিরে দেখা হইল। ইহারা সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করেন। অমাবস্যার রাত্রিতে কালীবাড়ি আসিয়া কয়েক ঘন্টা থাকিয়া চলিয়া যাইতাম। একদিন কালীবাড়ির ঠাকুর বলিল - আপনার পূজা হইয়া গেলে যাইবেন। এক অমাবস্যায় দেখি বাজেন্দ্র চ্যাটার্জী ও রাধাচরণের[৯] সঙ্গে দেখা হইল।

চিত্র ঃ রমনা কালীমন্দির ও পিছনে ভগ্ন মন্দিরটির হস্ত-অঙ্কিত চিত্র

অতিথিরূপে

রমনায় যে রাজেন্দ্র চ্যাটার্জীদের সহিত দেখা হয় সর্বদা রমনা কালীবাড়ি আসিয়া সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ পর্যন্ত জপাদি করিত। একদিন প্রাতে শহরে যাইতেছি, ভোলানাথ বলিল - ঐ দিকে রাজেন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ি। এ শরীর বলিল - তবে ঐ বাড়িতে চল। ঐখানে গিয়া দেখি কি, সে পূজা করিতেছে, তাহাতে নিত্য অন্ন ভোগাদির সামান্য রকম ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এ শরীর ঘরের বাহিরে আসিয়া কুন্ডলী দিয়া বসিল। তাহারা পূজা শেষ করিয়া আসিলে বলিল - তোমাদের বাড়ি আসার খেয়াল হইল। ছোট্ট ছেলের মত মুখ হইতে বাহির হইল - আমি তোমার ঐ নিবেদিত প্রসাদ নিব। তাহারা ভাবিল ভাল কথা, সধবা ভোজন হইবে। সে বলিল আচ্ছা, কিন্তু একটু পরে।

যেখানে যাইবার কথা ছিল সেখানে হইতে ঘুরিয়া আবার সে বাড়ি আসিলাম। দেখি বাজার হইতে আরো জিনিষপত্র আনাইয়া রান্না করিতেছে। তাহার স্ত্রী

ছিলেন "ভদ্রকালী" - পীতবর্ণ, সুন্দর, মধুর ভাব। স্বামী গোপাল গিরি নির্মাণ করেন। প্রায় ৩০০ বছর আগে স্বামী হরচন্দ্রগীরি মন্দিরের চূড়া ১২০ ফুট উঁচু নির্মাণ কবেন দুই তলাব উপরে - যেটি বহুদূর হইতে দেখা যাইত এবং ঢাকাব একটি বিশিষ্ট চিহ্ন গণিত হইত।
২৭শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কয়েকদিন আগে পাকিস্তানী সেনা দ্বারা ইহা ধূলিস্যাৎ করিয়া দেয়; ঘটনাচক্রে এই রমনা ময়দানেই তাহাদের আত্মসমর্পন করিতে হয।

[৯] রাধাচরণ বিশ্বাস, সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ।

বলিল নিত্য ভোগে সাধারণ ব্যবস্থা। ইহাতে কি আর খাওয়া হয়? তাই আরো কয়েক পদ রান্না করিতেছি। খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে চলিয়া আসিলাম। বাক্য বন্ধ অবস্থায় অন্যের বাড়িতে খাওয়া - এই প্রথম।

পরে সে একদিন সন্ধ্যায় সাহবাগে আসে। এ শরীরের কথা শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্রি হয়, খুব আনন্দের সহিত বলে - আমি রাজেন্দ্র চ্যাটার্জী, যদি এইসব খবর শহরে দিই, তবে বাগান লোকময় হইয়া উঠিবে। এ শরীর বলিল - কি দরকার, যাহার সময় হইবে আপনা হইতে জানিবে। সেইদিন তাহার আর কালীবাড়ি যাওয়া হইল না, বাহিরে প্রণাম কবিয়া বাড়ি চলিযা গিযাছিলেন। পবে একদিন আসিয়া বলিল - বমনা আসিয়া কালীবাড়িতে না বসা, আমার ঐ দিনই প্রথম হইযাছিল।

সমাধিস্থ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে রমনা আশ্রম

শারদীয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন রমনা, ঢাকেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিযা রাত্রে সিদ্ধেশ্বরী থাকিয়া পরদিন প্রাতে সাহবাগে আসিলাম। ঢাকেশ্বরী যাওয়ার সময় রাধাচরণ সঙ্গে ছিল। সিদ্ধেশ্ববীতে বাউল ছিল। অষ্টমীর দিন রমনা কালীবাড়ির নিকটস্থ ছাড়া বাড়িতে (বর্তমান আশ্রম) ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর যে ভগ্ন শিব রহিয়াছে, তাহার উপর রাজেন চ্যাটার্জীকে দিয়া অষ্টমী পূজার ব্যবস্থা হইল।[১০] সেই দিন সেখানে পূজার সময় এ শরীরের মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষার নানা শ্লোক ও মন্ত্রাদি বাহির হইয়াছিল।

আমি, রাধাচরণ ও ভোলানাথ ঐ ছাড়া বাড়িতে মাঝে মাঝে যাইতাম। কোন কোন দিন আমরা বাউলের সঙ্গেও যাইতাম। ঐ অষ্টমীর দিন পূজাব পব হইতে মাঝে মাঝে কাঁচা দুধ কলা কাহাকেও দিয়া সোমবাব তথায পাঠাইতাম এবং সময়ে সময়ে এ শরীরও সঙ্গে যাইত। সেখানে যে সব সাধু সন্ন্যাসীর সমাধি আছে, তাহাদের ইঙ্গিতে এইসব করা হইয়াছিল। আজ যে ঐখানে আশ্রম সেও তাহাদের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যেই হইয়াছে জানিবে। যেমন তোমাদের কোন বক্তব্য বিষয়াদির ভিতর যেটি গ্রহণ করি তাহা কাহাকে দিয়াও সম্পন্ন করাই, ঠিক সেইরূপ জানিবে। যাহারা এই আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীদের সংস্রবে ছিল, তাহারাই আবার উপস্থিত উপলক্ষ্যে কর্মাদি করিয়াছে, করিতেছে, করে এবং করিবে জানিবে।

[১০] ৬ই অক্টোবব, ১৯২৪।

বিশেষ প্রশ্নে আরও বলা - ঐখানে এই শরীরটারও যতটা সময় থাকা দেখিতেছ ইহাও ঐ মহাত্মাদেরই ইচ্ছায়। এই ইচ্ছার পূর্ণতা সাধুদের আকাঙ্খিত পূর্ণতা। এই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়া যতটুকু দেখা হইয়া যায়, তোরাও করাইয়া নিচ্ছিস্ ত।[১১]

এক সোমবারে একটি নূতন হাঁড়িতে ৫/৭ টি কলা, কাঁচা দুধ আনিয়া তখনকার ভাঙ্গা ও খোলা শিব মন্দিরে এ শরীর, ভোলানাথ ও বাউল গিয়া রাখিয়া আসে। কাঁচা দুধ ও কলা এক হাঁড়িতে ছিল; হাঁড়িটির মুখে কিছু ছিল না। ৭ দিন পরে বাউল সস্ত্রীক সন্ধ্যার সময় সাহবাগে আসিলে প্রায় রাত্রির ৯/১০ টার সময় সে ভাঙ্গা শিব মন্দিরে যাইয়া দেখে, দুধ কলা হাঁড়িতে যেমন ভাবে রাখিয়া আসিয়াছিলাম ঠিক তেমনই আছে। স্থানটি বড় অপরিষ্কার অথচ হাঁড়িতে একটি পিঁপড়াও উঠে নাই। বলিলাম - এখান হইতে একটু দুধ নিলে হয়। ভোলানাথ বলিল - তাহা ঠিক হইবে না। এখানে সাপ চলাফেবা করে, ঝুরঝুরে ভাঙ্গা মন্দির দেখ না কত গর্ত, যদি দুধে বিষ পড়িয়া থাকে। এ শরীর বলিল - আগে আমি একটু লই। এই বলিয়া একটু দুধ উঠাইয়া মুখে দিয়া, খাইলাম। সকলে প্রসাদের মত একটু একটু নিল। পরে চলিয়া আসিলাম। পরের দিন সকালে গিয়া দেখে হাঁড়িটি একেবারে পরিষ্কার। কিছুতে যেন ধোয়া মোছা করিয়া সব খাইয়া ফেলিয়াছে।

একদিন অমাবস্যার রাত্রে হইয়াছে কি, নিত্যানন্দ গিরি, হরচন্দ্র গিরির সমাধির উপর যে শিব আছে তাহার পূজা করিতে গিয়াছে। কি এক খেয়াল হইল, কালীমন্দির হইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সে আসনে বসিয়া পূজা করিতেছে, এমন সময় এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইল - দেখ! আমি তোমাদের এখানে কিছুদিন থাকিব। বল ত, কোথায় থাকি? নিত্যানন্দ গিরি[১২] (এখন যেখানে আশ্রম) সেইদিকে দেখাইয়া বলিল - থাক না গো মা। ঐ বাড়ি ত পড়িয়া আছে। বলিলাম - আচ্ছা। সে আবার বলিল - মনে রাখিও। অনেকে এইসব কথা শুনিয়াছিল। কেহ কেহ বলিল ঠাকুর কারণের মুখে বলিয়াছে - এ সব খাঁটি কথা নয়।

[১১] এই স্থানে পবে রমনা আশ্রম স্থাপিত হয। অতি প্রাচীন সাধনাব একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল সেখানে বহু শতাব্দির সাধনার ফলে মাযেব প্রকাশ।

[১২] রমনা কালীমন্দিরেব প্রধান পূজারী।

লক্ষ্মীপূজা

ভোলানাথ লক্ষ্মীপূজা করিবে। ব্যবস্থা হইল যে বাজেন্দ্র চ্যাটার্জী পূজা করিবে। রমনা কালীবাড়িতে দেখা হইলে সে স্বীকার করিল। কিন্তু বাড়ি যাইযা তাহার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া খবর পাঠাইল যে সে পূজা করিবে না। ভোলানাথ আমাকে বলিল - তুমি পূজা কর। তাহাকে বলিলাম - আমি ত কখনো এইরূপ পূজা করি নাই, দেখিও নাই, কেমন করিযা লক্ষ্মী পূজা করে। তুমিই কর। ভোলানাথ বলিল - তুমি যাহাই কর তাহাতেই হইবে। তুমি যখন ইচ্ছা করিয়া কিছু কর না, তোমার ভিতর হইতে যাহা আসে, সেই রূপেই করিবে। লক্ষ্মীর বোধ হয় তাহাই ইচ্ছা।[১৩] আপন হাতে পূজার জোগাড়াদি করিয়া পূজায় বসিয়া দেখি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর আপনা হইতে কলের মত ঠিক পুরোহিতেরা যেইরূপ পূজা করে, সেই ভাবে বাহিরেব অনুষ্ঠান আরও কত কি সব হইতে লাগিল। কখন কখন ঢলিযা মাটিতে পড়িযা যায। আবাব উঠিযা পূজার কার্যাদি করে। এইরূপে পূজা শেষ হইতে অনেক সময় লাগিযাছিল।

সাধকের কর্তব্য

এ শরীরটা - সংসারে বৌ সাজিয়া যেমন সেবা কর্মাদিতে থাকিত আবার সাধক সাজিয়া ঐ অনুযায়ী ভাব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। এ শরীরের খেয়ালে আসিল তাই সাধকের খেলা আরম্ভ। ভিতরে জিজ্ঞাসা আসিল - মানুষের কি করিয়া ভগবান লাভ হয়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও আসিল - ইহার জন্য ব্যাকুলতা চাই। তাই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সর্বদা তাঁহার জন্য একটি পরাণ পোড়া আকুল চিন্তার ধারা রাখা দরকার। যেমন সোহাগিনী স্ত্রীলোক সর্বক্ষণ সর্ব ব্যাপারের ভিতরও আপনার শাঁখা, সিন্দুর ও লোহাব প্রতি দৃষ্টি রাখে, শোকেব ভিতরও যেমন লোকে পরণের কাপডটি গুছাইযা রাখে, যেমন মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে সংসারের কাজ-কর্ম চলিতে থাকে, অথবা যেমন সন্তান কোলে করিয়া জননী সংসারেব কাজকর্ম করে, এইরূপ ভাবে সংসাব যাত্রার ভিতরও ভগবানের নাম ও চিন্তার ধারা প্রতি মূহুর্তে স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়।

কোন সময় কাজের ভীড়ে ভুলিযা গেলে, মনে আসিবামাত্রই বিশেষ অনুতপ্ত হওয়া আবশ্যক যে - ঠাকুর, এতক্ষণ তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম। তাহা হইলে

[১৩] ১২ই অক্টোবব, ১৯২৪।

ভগবৎ চিন্তা দিনে দিনে বাড়িতে থাকিবে। মনে রাখিতে হয়, এক সেই চিন্তাই সত্য। লোকের সহিত প্রয়োজন ছাড়া কোন অতিরিক্ত কথা বলা না। কথা শোনা বা শোনান - দুই ভাবেই সংযমিত করা আবশ্যক। যেই আলাপে ভগবৎ ভাবের পরিসর বৃদ্ধি পায় তাহাতে বিশেষ বাধা নাই। অথবা সে সম্বন্ধে আপন কোন সংশয় দূর হইতে পারে - এমন আলোচনা বিধেয়।

তবে ইহা জানিবে যে তাঁহার ধ্যান ধারণা যতই করিবে ততই তোমার বিচার ও বিবেক শক্তি উদ্বোধিত হইয়া কোনটি ভাল, কি তোমার প্রয়োজন - এ সমুদয় দেখাইযা তোমার শুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করিবে। আর দেখিবে জাগতিক বাধা - রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দে তোমার আকর্ষণ কমিয়া আসিতেছে এবং ক্রমে একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে। শুদ্ধ চিন্তায় থাকিলে তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে কাহারো কিংবা কোন বস্তুর উপর বিরুদ্ধ ভাব কদাচ আসিবে না। ক্রমে ক্রমে দিন দিন সত্য, ত্যাগ, সংযম, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ বাড়িতে থাকিবে। আরো দেখিবে যতই ভগবৎকৃপা লাভ হইবে, ততই আলাপাদি ও নানা ভাবের উপর দৃষ্টি - বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি কমিয়া যাইবে এবং আমারই ইষ্টের বিভিন্ন পূজা বলিয়া বোধে আসিবে। যেমন যিনি আমার পিতা, তিনি কাহারও বন্ধু, কাহারও মামা। ব্যবহারেও কেহ বাবা ডাকে, কেহ মামা ডাকে, কেহ কাকা ডাকে - সেইরূপ মনে হইবে।

পূজা, প্রার্থনায়, ধ্যান, জপ, কীর্তন, যজ্ঞাদি দ্বারা দিবারাত্রির সদ্ব্যবহার করা চাই। প্রথম অবস্থায় ধর্ম-কর্মে মনোনিবেশ করিলেও যেখানে জাগতিক ভাবের কর্ম থাকে, সেখানে আধ্যাত্মিকের সহায়ক জাগতিক কর্ম না করিলে এক সময়ে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য বহির্জগৎকে ভুলিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া নির্জনে একান্তে অন্তরে অন্তবে তাঁহার অখন্ড স্মরণে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সেই সময় কেবল ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অন্য দিকে যাহাতে মন না যাইতে পারে, তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। ভগবৎ কার্যাদিতে যদি বিন্দুমাত্রও কোনরূপ বিঘ্ন বা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার উপর উপাসকের প্রথম অশ্রদ্ধা অরুচি আসা দরকার। যদি এইরূপ না আসে, তাহা হইলে বুঝিবে তাহার সে বিষয়ে বিশেষ আসক্তি রহিয়া গিয়াছে।

উপলব্ধি

এইরূপে ক্রমশঃ সাধকের ফল খন্ড খন্ড ভাবের ভিতরে বাহিরে এক অখন্ড অনন্ত সত্তার প্রকাশ হইয়া ক্রমোন্নতিতে ভাব ও কর্মাদির পূর্ণ সমাধানের আশা। পূর্ণ সমাধানেই তাহাকে বিশ্বভাবে 'ডুবানো মাণিক' বানাইয়া দেয়। এইরূপ না হওয়া পর্যন্ত যার যার উপাসনার প্রথম অবলম্বনটির মূলোচ্ছেদ হয় না। তাই দেখিবে বিচারে ও যুক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তার মীমাংসায পৌঁছিযাও পূর্ণ সমাধানের অভাবে, সাধনার যে ধারাটি আরম্ভে অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকে, উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নিবদ্ধ ভাবেব গন্ডীতেও সাধক বদ্ধ হইতে পারে। যাহাতে গন্ডীবদ্ধভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, উহা কিন্তু দ্বন্দ্ব রহিতের দিক - দ্বন্দ্বাতীত নয়।

বুদ্ধি মোটামুটি তিন রকম। প্রথম জীব-বুদ্ধি, ইহাতে ধর্ম সংশ্লিষ্ট থাকিলেও জীব সাধারণ ভাবে ইহার ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ধর্ম-বুদ্ধি, ইহাতে ধর্ম-নিষ্ঠা প্রবল থাকে। সকল কর্মে ধর্মকে প্রধান লক্ষ্য করিযা চলে। তৃতীয় প্রজ্ঞা বা যোগজ-বুদ্ধি। উপরোক্ত ধারায় চলিতে চলিতে ইহার উদয় হয। যখন উপাসনার দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তখন প্রাতঃকালীন সূর্যোদযের মত, তাহাব হৃদয়ে এক বিশুদ্ধ জ্ঞান দেখা দেয়, যাহাতে সে পরমার্থ তত্ত্বেব খাঁটি সন্ধান পায়। স্বভাবতঃ তখন একটি নির্মল বুদ্ধি, যাহার নাম যোগজ-বুদ্ধি বলিতে পারে, সে প্রাপ্ত হয়। সেই বুদ্ধি কেবল নিত্য ও সত্য ধরিয়াই খেলা করে। সেই খেলায় এ জাতীয় ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রকাশ থাকে না। প্রথমতঃ সাধারণ মানুষ যখন সাধনায় নামিবে, সেই সাধকের প্রধান লক্ষ্য রাখা ব্রহ্মচর্যের দিকে। **ব্রহ্মচর্য না হইলে কিছুই হইবে না। জীব মাত্রেরই ত সাধনার ভিত্তি - সত্য পালন ও ব্রহ্মচর্য্য।**

মূর্তিদর্শন ও তত্ত্ব

আর একদিনের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলিলেন - যখন মূর্তি দর্শন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব ভক্তিতে উপাসকের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, তখন তাহার উপাস্য মূর্তি, সকল দেবদেবীর উপর প্রকাশ পায়। তাহাব বোধ হয় যে আলাদা আলাদা যত মূর্তি আছে, প্রত্যেকেই যেন তাহাব বাঞ্ছিত মূর্তি, নানা বেশ ও নানা ভাব নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেমন কাহারো মাতাকে কেহ মাসী, পিসী, দিদি ইত্যাদি নাম, রূপ ও ভাবে দেখে ও বলে কিন্তু সে একই।

পূজা অর্চনাদির দ্বারা যখন উপাসকের উপরোক্ত জ্ঞান গভীর হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ মনুষ্যাদির উপর তাহার উপাস্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছেন, এই বোধ আসে। পরে আবার পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতেও এই ভাব দেখে। ক্রমে উদ্ভিদাদিতেও তদ্রূপ মনে হয়। ধীরে ধীরে জল, অগ্নি, মাটিতে সে ভাব আসিয়া বায়ু, ব্যোম ইত্যাদিতে যাইয়া পড়ে। তখন বিচারে আসে, জগতে যা কিছু দেখি সকলই আমার এক উপাস্যেরই রূপ। সময়ে নিজেও বাদ যায না।

এইরূপে তাহার সেই ভাবটি গাঢ় হইলে একটি ভাব জাগ্রত হয় যে, যখন যে দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন তাহার উপাস্যের মূর্তি আসিয়া তাহাকে সাময়িক বিভোর করিয়া রাখে, সে তন্ময়তা যতই স্থির হয়, ততই তাহার নিজ উপাস্য, সর্বভাবে, সর্বরূপে, সর্বত্র আছেন দেখিয়া ও চিন্তা করিতে যাইয়া, কখনও কখনও মূর্ত ভাবটি অদৃশ্য হইয়া কি এক ভাবে তাহাকে বিভোর করিয়া রাখে। এ অবস্থা আসলে চিত্তশুদ্ধি। এইরূপে খন্ড খন্ড মূর্তি সংস্কার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইযা গেলে স্বীয় ইষ্ট মূর্তিরই অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তভাব ব্যষ্টিভাবে সর্ব দৃশ্যে অনুভূত হয়। তখনও সাধক বাহিরের দৃশ্যাদি নিয়া জড়িত থাকে বলিয়া তাহাব শরীরটা সাময়িক অবশ ও উন্মাদের মত দেখাইতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সর্বক্ষণ একটা অনন্ত অখন্ড ভাবের আবেশ থাকিতে পারে। ইহা ভাব সমাধানের একটা অবস্থা মাত্র।

যেমন কেহ একটি রূপ নিয়া সাধনা আরম্ভ করিযা ক্রমশঃ বিকাশেব সাথে সাথে সর্বরূপ, সর্বগুণ, সর্বভাব সেই যে মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ, সব আমারই ইষ্ট মূর্তির। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, বিশ্বব্রহ্মান্ডে যা কিছু, সর্বরূপে ওই। ক্রমশঃ ঐ মহানভাবে স্থিত হইতে হইতে কাহারও কাহারও ইহাও হইতে পারে এক আত্মাতেও যাইয়া স্থিতি লাভ করে, কোন মূর্তির স্থানই নাই। কেহ রূপেও থাকিতে পারে, আবার ইহাও হইতে পারে যে, সে কোন রূপই নিল না। আত্ম-স্বরূপের ধ্যান গুরুর আদেশানুযায়ী, সেই যে এক আত্মা। ধ্যান যোগে যদি কাহারও স্থিতি ঘটে তাহা হইলেও প্রকাশ পাইতে পারে যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে বহুত্ব, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত - সে কে? কি? ঐ যে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া আত্মারাম। কোন ভাবেই শুধু অবশ হইলে হইল না, শুধু ডুবিলেই হইল না, স্থিতি হওয়া চাই। বলবে দ্বন্দ্বাতীত আর যদি থাকে কাহারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব - ইহা কি করিয়া হয়?

সাধকের শ্রেণী বিভাগ

সাধকের একটা অবস্থা আসে যে, সে-সময় যে যেই ভাবে তাঁহার শরণাগত হয় সে সেই ভাবে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাহাদের রোগ পীড়া সম্বন্ধীয় শারীরিক স্বার্থ অধিক, তাহা তাহাব নিজের শরীরের বা অপরের উপর নিয়া কৃপাদান করে। যাহার বিষয়েব স্বার্থ, তাহা যে কোন ভাবের ভিতর দিযাও পূর্ণ করিতে পারে। আবার যাহার আধ্যাত্মিক ভাব, তাহাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়াও উন্নত করে। সে সব কি প্রকার? যখন সাধকের সম্পূর্ণরূপে খেয়াল হয় যে নিজেতেই সব, সবেতেই সে-ই। আবার যাহা দেখা যায তাহা তাহারই নিজের শরীর। মানুষ, পশু, গাছপালা ইত্যাদি সবই এক আমিই - সে-ই। এইরূপও আসে কিন্তু। কোনও স্থলে কাহারও ভোগটা সে নিজেতেও নিয়া নেয যেমন একবার এই শরীরটা একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে আসনে বসিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে, ইহার ভিতর হঠাৎ উঠিয়া সিদ্ধেশ্বরীর নিকটস্থ পুকুরে শরীরটা আগে আগে যাইয়া দেখে একটি শিশু জলে পড়িয়া গভীর জলে চলিয়া যাইতেছে। তখন নামিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। যাহার ছেলে তাহাকে খুঁজিয়া দিল। তাহারা কালী মন্দিরে বসিয়াছিল। আবার এমনও স্থান আছে, কোনও রকম ভোগ না করাইয়া বা নিজে না নিয়াও তাহাকে রক্ষা করা যায়।

কোনও উচ্চ সাধক সাধন বল দ্বারা অপরকে আত্মশক্তি দান করিয়া আধ্যাত্মিক রাস্তায় খানিকটা অগ্রসর করাইয়া দিতে পারে। সে সময তাহার অনেক রকম শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু সাধক যদি তখন গর্বিত হইয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়া চলিতে থাকে, তবে সে সেইখানেই বদ্ধ থাকে। কাবণ তখনও ত তাহাব প্রাপ্তির আকাঙ্খা বাকি রহিয়াছে। তাহা হইলে সে নিজে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিল না। যদিও নানা প্রকার অলৌকিক বিভূতি লাভ কবে, কিন্তু সে ইচ্ছা অনিচ্ছার হাত হইতে একেবারে মুক্তি পায় নাই বলিযা তাহাব অনধিকাবের পরিচয়ও সময়ে হইয়াই থাকে। ইহা একটি অবস্থা। স্বযং আচার্য, জগৎগুরুর[১৪] পক্ষে কিন্তু এ কথা নয়।

মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন - আব একটা দিকের কথা হইল - হওয়া। যাহার জপ, ধ্যান, রূপ, গুণ, পূজা, পাঠ, কীর্তন, সৎসঙ্গ প্রভৃতির দিকে

[১৪] যিনি উচ্চতম স্থিতিতে পৌঁছাইযা সৃষ্টি, স্থিতি, লয ক্ষমতা অর্জন কবিযাছেন। ইহা তন্ত্র সাধনাব কদ্রগ্রন্থিব উন্মোচনেব স্থিতি। দ্রষ্টব্য ঃ পবিশিষ্ট ৩।

বিশেষ আকর্ষণ লইয়া যার যার ইষ্ট চিন্তায় মুগ্ধ থাকে, ধর না, তাহারা হইল তোদের - ম্যাট্রিক। যাহার যে বিষয়, উপাসনা সাধনার দিকে, তাই নিয়া কিন্তু।

যাহারা ক্রমে পূজা, পাঠ, ধ্যান ধারণা ইহাদের ভিতরেও কেবল ইষ্ট ধ্যানের চেষ্টা, দেবতা ও ভগবৎ তত্ত্বাদির আলোচনা করে এবং ভিতর হইতেও বিচার স্ফূরণ হইতে আরম্ভ হয় - যে লাইনে যাহার গতি বৃদ্ধি, পর পর যে বিষয়, সে প্রকাশের জন্য যে বিশেষ ধ্যানশীল, তাহারাই হইল তোদের - আই এ।

আবার যাহারা ক্রমশঃ ভগবৎ নানা তত্ত্বাদি, ভাব ও নিজ নিজ ইষ্ট তত্ত্বের ভাবে ভাবিত, কি আত্মা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান প্রিয় এবং অনুভব ও বিচার তৎপর হয় - যাহার যাহা প্রবল, সেই সেই তত্ত্ব বিষয়ে। তাহারা হইল তোদের - বি-এ।

আরও অগ্রসরে যাইয়া প্রাকৃত জগতের টানাটানি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মহাসত্তা অপ্রাকৃত গুণাতীত, আত্মজ্যোতি ও স্থিতি। ইহাদের ভিতরে সম্প্রদায় নিবদ্ধ যে দিক, তাহার কোনটারই ছোট বড় কোন ক্রমের প্রশ্ন নাই। আপন আপন গতি অনুযায়ী তাহার সেই সেই প্রকাশ। শুধু বুঝাইবার জন্য ত এই জাতীয় বলা। সেই যে মহান এক স্থিতি, তাহারাই তোদের - এম, এ।[১৫]

প্রাধান্য কিন্তু আপনাপন - যেখানে বিরোধ নাই সেই ত চাওয়া, পাওয়া। বলবে দ্বন্দ্বাতীত আর থাকবে দ্বন্দ্ব? যিনি সকল তত্ত্বের মর্ম অবগত হইয়া সর্বজ্ঞান অজ্ঞানের পরপারে স্থিত সেইখানে কেমন সুন্দর - যিনি গলিয়া নিরাকার, তিনিই জমিয়া সাকার। আবার যিনি জমিয়া সাকার, তিনিই গলিয়া নিরাকার। জমাজমি গলাগলি তাহাতেই আকারে, প্রকারে, নিরাকারে - সেই স্বয়ংই।

আকারে পুতুল, বাড়িঘর, নানারূপ, আর আকার শূন্য, দুইটার মধ্যে এক-ই দুই আর দুই-ই এক। আকারে প্রকারে প্রকাশটি ঐ। কেহ কিন্তু, সেই যে গলিয়া গেল তাহাতে স্থিত; কেহ আবার আকার প্রকার রূপে বা সেই প্রকাশে স্থিত। যেখানে এই যে গলিয়া গেল, কি আকারে, প্রকারে - এই দুইয়ের যে পূর্ণাঙ্গীন সমাধান, সেখানে প্রশ্ন উত্তর কি? আবার একটা কথা - প্রেমে গলিয়া যায়, জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া যায়। যেখানে গলিয়া যায় সেইখানে যা তাই। আর জ্ঞানাগ্নিতে যাহা জ্বালাইয়া দেয়, যাহা জ্বলিবার জ্বলিলে, যা তাই। দৃষ্টি ভেদের স্থানেই মাত্র এইপ্রকার স্বরূপ প্রকাশ, আর কি!

[১৫] সচ্চিদানন্দ।

একটা চমৎকার এই, যাহারা বেদান্ত বিচার দৃষ্টিতে দেখিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বিচার, বিচার করণেওয়ালা আর যাহার বিচার কবে, ততক্ষণ লেশ ও প্রারব্ধের কথা আসিবেই। গলা আর আকারের কথাটাও সেই বিচারেই দেখিবে। লেশ ও প্রারব্ধ ইত্যাদি আসিবে না, কখন? যখন তিনটিব প্রশ্ন নাই। কি যে থাকে আর কি যে থাকে না, সেই জন্যে ভাষায় স্থান কোথায়? ভাষা ভাসে কিছুর উপরে কিনা, সেখানে কিছু কোথায়?

আবার মহাশক্তি, সত্তা যাহার পরে আর নাই। যাই বল, আত্মস্বরূপে স্থিতিই বল, রামসীতা, শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ কোন তত্ত্বেরই প্রকাশের অভাব যেখানে হইতে পারে না - ঐ ঐ ঐ-ই। সে স্থিতিতে স্বাধীন ভাবে খেলা ইত্যাদি যা বল - তোদের পি, এইচ, ডি, কি বলিস্ না! কোথায় এখন খুঁজিয়া নে।[১৬]

হরিনামে মা

কোন প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন - এ ছোট্ট মেয়েটার হরিনামের কথা বলছ - তোমরা নাম রূপের মধ্যে আছ ত। এ শবীবটিকে নিযা যখন যে ভাবে থাক সেখানে দেখতে পাচ্ছ না, তৎভাবেই তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেছে - তোমরা যা জিজ্ঞাসা কবিলে। হ্যাঁ, অনেক সময এই স্বাভাবিকের মধ্যেও অস্বাভাবিক পাইতেছ যে বলিতেছ - এখানে ত যখন যেমন হইয়া যায়। যাহা হইয়া যাওয়াটাও স্বভাবতঃ হইয়া যাওযার; করণেওয়ালাটাও ত আলাদা আর কেহ নয়। নাম শোনা এবং নাম করা ওখানেও যখন যেমন প্রকাশ, এ শরীরটার পাইয়াছ ও পাইতেছ ত।

যেখানে নাম ব্রহ্ম, সেই স্বয়ং রূপে-অরূপে নিত্য আছে। নাম রস, আকর্ষণ কৃষ্ণ, আনন্দরাম, আত্মারাম এও ত তোমরা বলে থাক। এখন বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম যা বল - জল বরফ যেমন, আকার নিরাকার ধর না। আচ্ছা, তোমরা বলিতে পার, যে নামে যাহাকে ডাকা শিব দুর্গা ইত্যাদিও যে কোন নামই বল না কেন, সেই যে মহাবিষ্ণু, পরম শিব, পরব্রহ্ম - মূর্ত অমূর্তে সেই যে, আবার শক্তি সত্তারূপে, সেই স্বয়ংই, আকার নিরাকার, প্রাণের প্রাণ, মহাপ্রাণ - সেই আত্মাই ত। ইহার ভিতরে যে কোন নামে এবং রূপের ভিতরে চলিলে, সেই নাম ব্রহ্মেরই উপাসনা হয় না কি? হ্যাঁ, বলিতে পাব যে নামে যাহাকে ডাকা,

[১৬] সৎ, চিৎ, আনন্দ ঘন।

সেইরূপে সেই ভাব প্রকাশ ইহা ত স্বাভাবিক কথাই কিন্তু ইহাই চরম পরম কথা কিনা বল?

যেখানে পিতা, পুত্র, পতি কেহই কম নয়, দেখিতেছ না, একেতে সেই। হ্যাঁ, এক এক ধারা নিয়া এক এক সম্প্রদায়ও। স্বরূপ প্রকাশ চাই ত - সর্বনাম, সর্বরূপ কোথায়? যেখানে বিরোধের প্রশ্ন নাই। বিচার কর। আবার যেখানে অখন্ড ধারায় বিচার তৎপর হইয়া, কি সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাশ্বত তোমরা যা বল, স্বয়ং প্রকাশ যা আছে - সেই প্রকাশের চেষ্টা। যেখানে 'ন-ইতি' - এও তিনি নন, এই যে লক্ষ্য সেই তত্ত্বে, সেই চরম পরম নিত্য, স্বয়ং প্রকাশ যাহা আছে, সেই প্রকাশের চেষ্টা। আবার এটা ওটা যাহা কিছু, ঐ-ঐ সেই সত্য। এই যে দিকের চেষ্টা, এখন দেখ, লক্ষ্য সেই প্রকাশেরই। যোগে যাগে যে দিক ধরিয়াই হউক সেই মহাযোগেই যাহা নিত্য আছে। এখন ধর, তুমি নাম রূপের মধ্যে যে দাঁড়াইয়া আছ বা কোন মতে পথে আসিয়া - সেই স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করা ত।

সেইদিন জিজ্ঞাসা করিলে না - হরিনামে তোমার এই ভাব হয় কেন? আরে, তোমাদের সংস্কার অনুসারে গুরু যে লাইন তোমাদের দেন, তোমরা বিভিন্ন পথ দিয়া, সেই পথেরই যাত্রী ত, সেই ভাবের প্রকাশ। অর্থাৎ নাম রূপ না মানিয়া তাহা হইতে পারে না। নাম রূপ মানিয়াই তাহা আবার কোন দিক ধরিয়া বাদ দেওয়া। এখন তোমাদের প্রশ্ন হইল যে - যেখানে এই শরীরটা যখন যে ভাবের ভিতর, সেখানে সেই ভাব নিয়াই কিন্তু। আবার খেয়াল যখন যেটা সেই ভাব নিয়াও। এখন তোমরা ভাব। যেটা নিয়াই হইত, তোমাদের প্রশ্ন - মুক্ত কোথায়! প্রশ্নোত্তরে যাহাদের স্থিতি তাহাদের ত এই কথা থাকিবেই। হরি যে নামে সব হরে, শব হরে, যা হরে তাই ত হরে সেই যে হরি। হ্যাঁ! সর্বনাম তাঁহার নাম, সর্বগুণ তাঁহার গুণ, সর্বরূপ তাঁহারই রূপ, আবার নাম, রূপ, গুণের প্রশ্ন নাই। সবেতে যে সব সেই দিকে দৃষ্টি না থাকার প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, তুমি যে দিকটা বলিতেছ। তোমরা নাম রূপের অতীত হইবার জন্য এক এক ধারা নিতেছ ত, নাম রূপ মেনেই যে। সেখানে নাম রূপের মধ্যে যে সেই স্বয়ংই, কাজেই যে যে নামের যে যে ভাব, যে যে মন্ত্রের সেই সেই ধারা প্রকাশ, সেই প্রকাশ হওয়া ত স্বাভাবিক। কাজেই গুণ প্রকাশ করিবে ত - সগুণই বল, নির্গুণই বল, গুণাগুণের অতীতই বল।

যেমন সন্ন্যাস নেওয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য, তেমন কীর্তন শোনা কীর্তনময়,

প্রকাশিত হইবার জন্য। তোরা যে কীর্তন করিতেও পাবিস্ না, শুনিতেও পাবিস না। কেননা, তোরা সে সময়েও বাহিরের নানাভাবে এমন রূপে ধরা থাকিস যে কীর্তনের আনন্দ তোদের ভিতর বিশেষভাবে পৌঁছিতে পারে না। এ কাবণে কীর্তনের আগেও যেমনটা ছিলি পরেও প্রায় তেমনই থাকিস্। মাঝখানের আনন্দ তোদের বিশেষভাবে পরিবর্তন যেন আনিতে পারে না। তবে নামেব ফলস্বরূপ যতটুকু ততটুকু ত নিশ্চয় আছেই, দিবেই। এই সূত্র ধরিয়া ত জগতের চলা।

নাম নামী ত অভেদ, নামও তাঁহার এক রূপ ত, স্বয়ং ফল। এক টুকরা আগুন যতটা জ্বালাইতে পারে, ততটা জিনিষ তোরা একসঙ্গে জড় করিতে পারিস না - সেইরূপ নামের গুণ জানিস্। যেমন তোরা বলিস্ না - একবার হরিনামে যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। ইহা ত সত্য কথা।

যেইরূপ-মাটিতে বীজ পুঁতিলে চারা না হওযা পর্যন্ত স্থানেব দিকে লক্ষ বাখিতে হয়। চারা হইলে বেড়া ঘেরা দিতে হয, তদ্রুপ যখন ঈশ্বরভাব একটু আসে তখন খুব যত্নের সহিত বিশেষ নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া তাহাব বৃদ্ধির জন্য হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

কীর্তনের সপ্তভূমি

কীর্তনের ভাবের কথা এবং সেই সম্বন্ধে লক্ষণের কথা শুনিতে চাস যখন তবে শোন।

১। প্রথমতঃ যে রূপটি, ভাষাটি উপলক্ষ্য করিয়া কীর্তন শুনিয়া বা করিয়া তাহা ধারণা করিতে করিতে সাধারণ আনন্দের সহিত মাতামাতি করিযা ক্ষণিক মিশ্রিত একাগ্রতার দরুণ, তাহার এ জগতের ইচ্ছাই খেলিতেছে কিনা - এ জাগতিক ইচ্ছাটা বেশ প্রকাশ হয়। তাহাতে শরীর অবশ দেখা গেলেও ভিতরে বেশ জাগতিকভাবের হুঁসও থাকিতে পারে। ইহা শবীরের একটা জড় অবস্থা মাত্র। কাহারও অজ্ঞান হইযা পড়িবার মত হইতে পাবে, কাবণ বিষয-বাসনা শূন্য ভাব ত আব নয়।

২। বার বার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা যাহার ভাব আরও বৃদ্ধি পায় তাহাতে যে নাম, রূপ ও ভাব নিয়া সে কীর্তন আরম্ভ করে বা শোনে, সে ইষ্টের প্রতি ঐকান্তিকতায় তাহার সাময়িক বেশ আনন্দ খেলে এবং মনটিও যেন আবেশের

মত হয়। ইহা সাময়িক শরীর ও মনের যুগপৎ জড় অবস্থা।

৩। ক্রমশঃ ভাবের আতিশয্যে যাহার কীর্তনীয় রূপেতে যতটুকু তন্ময়তা আসিয়া পড়ে চিত্তশুদ্ধি হইতেছে বলিয়া ততটুকুর জন্য তাহাকে সাময়িক বালকবৎ ইত্যাদি দেখাইতে পারে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে কখনও বা ধ্যেয় মূর্তির মত সামান্য অঙ্গভঙ্গি আদি করে। আবার কখনও সকল মূর্তিতেও আকর্ষণ দেখা যায়। কখনও অস্থির ভাবে গড়াগড়ি দেয় আবার কখনও জড়বৎ পড়িয়া থাকে। এই সব ভাব অস্থায়ী বলিয়া ইহা ভগবৎ ভাবের অবস্থার আভাস মাত্র।

৪। উক্তরূপ তন্ময়তা যখন ক্রমে ক্রমে স্থায়ী হইতে আরম্ভ করে তখন সে যেদিকে তাকায় কেবল তাহার এক উপাস্যের স্ফুরণ হয়। কীর্তনাদিতে তাহার সাময়িক অস্থিরতা দেখা গেলেও, দিবারাত্রি তাহাকে উপাস্যের লক্ষ্যে স্থিরভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইতে পারে এবং সর্বদা অন্তর্জগতের লক্ষ্যের দিকে অবস্থিত বলিয়া তাহার মুখ দিয়া একটু উচ্চভাবের কথা বাহির হয় এবং তাহার সামান্য কিছু অলৌকিকতাও প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার নাম ভগবৎ ভাবের আর একটি দিকের স্ফুরণ।

৫। পর পর যখন তাহার সে ভাব জল জমাট হইয়া বরফের মত গাঢ় হইতে আরম্ভ হয় (এই জমাট কিন্তু নিরাকাবের জল বরফ হওয়াব জমাট নয়) তখন আর তাহার কেবল এই ভাবের রূপটিই থাকে না। মূর্তিসত্তার ও একভাবের কি যেন এক খেলায় মহা আনন্দে তাহার দিন রাত্রি কাটিয়া যায়। সেখানে জাতি সম্প্রদায়ের বাঁধন যেন ছুটিয়া যায়। একতার দিক হইতেছে বলিয়া - মন মানি জাত মানি না, একথা এখানে দাঁড়ায় না কিন্তু, মনে রাখিও। এ অবস্থায় তাহাকে কোন কোন সময় জড়বৎ বা অস্থির দেখা গেলেও তাহার ভাবগুলি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হইয়া পড়িতে থাকে। নিজস্ব আলাদা বলিয়া তাহার কিছুই যেন দেখা যায় না। ইহা আবার এক রকম।

৬। ক্রমে যখন সবকিছুই তাহাতে অর্পিত হইতে হইতে যুগপৎ রূপে অরূপে এক মহান ভাবে ডুবিতে থাকে, ইহাও এক প্রকাশ।

৭। পরে সে এ ভাবেরও পরপারে যাইয়া ব্যক্ত অব্যক্ত, ভাব ও রূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে। ইহাকে মহান ভাব বলে।

সর্বরূপে অরূপে স্বরূপেরই প্রকাশ

রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা কি? সেই পরম পুরুষই বা কে? পুবে শয়ন - স্বযং। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের প্রশ্নও যে জায়গায় আসে না - সে কি? কে? সেই রসময়ই বা কে? তাঁহার প্রকাশ কোথায়? তাঁহার ভিতরে এইসব প্রকাশ স্বাভাবিক। ইহার ভিতরে আরও কত রকম - মহাপ্রকাশে।

মা হাসেন আর বলেন - ধর না চিন্ময়টা কি? চিনিরই পুতুল, চিনিরই ঘর, চিনিরই বাড়ি। চিনি আসা, চিনি যাওয়া। চিনিই গড়ন, চিনিই ধরণ - যেমন চিনিরই মঠ মন্দির তোরা খাস না? আকার, আবার রস - রসরাজ সেই আর কি। আকার আকৃতি থাকিয়াও অনাকৃতি। ক্রিয়া থাকিয়াও অক্রিয়া। কাহার সঙ্গে সেখানে? সেই জন্যই বর্ণনা কি? সাকার - স্ব-আকার, অর্থাৎ স্ব-ই স্বয়ংই। চিন্ময় রাজ্য অ-প্রাকৃত = যেখানে পর পরের প্রশ্ন নাই, কেবল চৈতন্যই। অচৈতন্যের স্থান নাই। যে আলোর দ্বারা চন্দ্র, সূর্য, সমগ্র বিশ্বের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় - সেই যে মহাজ্যোতি, মহাপ্রকাশ না হইলে এই জ্যোতি কি? অপ্রাকৃত কি? তাহার প্রকাশ হয় না। যেখানে আলো অন্ধকারেব প্রশ্ন নাই, সেই যে আলো - উহা কালের অধীন, প্রকৃতির অধীন থাকিয়া হয় না। সাময়িক আভাস প্রকাশ হইতে পারে - মহাপ্রকাশে এই প্রকাশ।

এ সমগ্র ভাবগুলিই যাহা একটু শুনলি, উপাস্য উপাসকেব নাম রূপ, দাস প্রভু ভাব নিয়া আরম্ভ! চরম অবস্থা না পৌঁছানো পর্যন্ত সে বিশেষ ভাব নিয়া চলিতে থাকে। নিত্যদাস প্রভু ভাবটা কি? কে? তাহার সমাধান। গুরু ভাবেরও একটা সুন্দর প্রকাশে স্থিত। প্রভূদাস পূর্ণাঙ্গীন স্থিত প্রকাশ।

আবার মা বলিতেছেন - মহাভাব, বিবহ মিলন নিত্য নূতন নূতন ভাবের প্রকাশ। সেইটা কি? সে একটা রকম - ভাষা কই? এখানে কিন্তু বিশেষ স্থলে অঙ্গ ভঙ্গিতেও তৎস্বরূপ হইযা সেই সেই রূপের প্রকাশ করিতে পারে, আলাদা নাই বলিয়া। এই অঙ্গভঙ্গি - মন-রাজ্যের ব্যাপার নয়। আবার আলাদা হইয়াও এক, এক হইয়াও আলাদা। সর্বরূপ, সর্বভাব, সর্বগুণ - রূপে অরূপে, গুণে নির্গুণে, ভাবে অভাবে - ঐ তিনিই যুগপৎ স্বয়ংপ্রকাশ। সেখানে বিগ্রহাদি কি, কে? রাধাকৃষ্ণই বল, সীতারামই বল, শিবদূর্গা, কালীই বল, সিদ্ধিদাতা গণেশই বল ইত্যাদির মধ্যে যে যেরূপের উপাসক, সেই সেই ধাবায় প্রকাশ স্বাভাবিক। বিগ্রহাদি পূজা যেখানে, আবার পূজার যেখানে প্রশ্ন নাই - ভাবিয়া দেখ, বুঝ,

স্থান বাহির কব। এ দিকের কথা যাহা, এ যে একটু মাত্র বলা।

প্রশ্ন - এই যে হরিনামে ভাবাবেশ, এও ত ভাবেরই অধীন, ভাবেরই একটা উন্মাদনা?

মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন - ভাব কি? কার ভাব? কে অধীন? কার অধীন? ভেবে দেখেছ কি? হ্যাঁ, ভেবে পাওয়ার ত এ নয়। তোমাদের বিচার বুদ্ধিতে এইসব আসা স্বাভাবিক। আরে বাবা! ভাবের ভাবুক না হইলে এইসব ধরা কঠিন - এ যে ভাবাতীত ভাব। ঐ মহাভাব - ধরিবে কিসে? অভাবেব ভাবে, এইভাব ধরিবার রাস্তা নয় - এ যে স্বভাব - স্বযংই ভাব-স্বরূপ। ভাবের চৈতন্যময় বিগ্রহ। এ প্রেম-স্বরূপ। অমৃতই তাহার স্বরূপ, - স্বয়ংই। চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপাব। আর তোমার এই কথা হইল স্বপ্নময় রাজ্যের আলোচনা। হ্যাঁ, আশা, এ আলোচনায় যদি অলোচন গিয়ে স্ব-লোচন খোলে, ভাল কথা। আলোচনা ত অলোচনেরই ব্যাপার, অর্থাৎ অজ্ঞানের।

তাঁহার কথাই সর্বদা বল না, আগুনের মত ক্রিযা হবে। না দেখিয়া আগুন ঘাঁটিলেও তো যাহা জ্বলিবার জ্বলে, যাহা গলিবার গলে। স্ব-রসের রাজ্য যেখানে, রস-স্বরূপ, সেই তাঁর স্বরূপ। রস-বিলাস - নিজেকে নিয়াই নিজে। সেই যে অমৃতত্ব। আরে বাবা! হরিনাম নিয়াই দেখ না - যেখানে মরণ বারণ, সর্ব হরণ, কাল নিবারণ - যেখানে সর্বহরে সেই ত হরিনাম। ভগবানেব যে নাম যার ভাল লাগে সেই তার হরিনাম। এই দিকটায় এই বিদ্যাবুদ্ধি বিচার চলে না। সেই যে চঞ্চল অচঞ্চল মহাভাবের উন্মাদনা, সে যে কি রস, কিসে বর্ণনা হয তাব। এই দিকেই চোখ দিলে না, মন দিলে না, বুঝবে কি করে বাবা! সে যে কত গম্ভীর রস - গম্ভীর হইতেও গম্ভীর গম্ভীরতম। অমৃতত্ব আর আত্মস্থ আলাদা নয় বে বাবা!

তোমার কথা ত এই ভাবেরই অধীন, ভাবেরই উন্মাদনা? হ্যাঁ, ইহারও একটা স্থান আছেই, সেই স্থানে এই কথা ঠিকই। যে ভাব, যে উন্মাদনা, স্বরূপ নয়, অধীনতা - সেই স্থানে এই কথা। বিচার করিয়া দেখ না। যেখানে মন নিয়া, দেহ নিয়া ভাবের অধীনের উন্মাদনা সেখানে ত ঐ কথা ঠিকই। তবে সাধারণের ইহা ধরা কঠিন। হ্যাঁ, যেখানে ধরা পড়িবাব সেখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোন দিকই বাদ দেওয়ার নয়। বাদ দিলে যে নিজেই বাদ পড়িবে, ফাঁদে পড়িবে। বাদাবাদের পরেও ত। যেখানে আমি কে জানিবার চেষ্টা সেখানে সর্বরূপে অরূপে

সেই স্বরূপের প্রকাশ হওয়া চাই না? তাহা না হইলে হইল কি? বাদ গেলে ত বাদেই রহিলে। সব দিকেবই চরম পরম তত্ত্বের প্রকাশ হওয়া চাই। স্বয়ং-স্বরূপ আর কি। দিক, অদিক, বন্ধ, নিবন্ধ - স্বয়ং-ই।

যে দিকে যে যাইবে, চরম পরম যাহা - আলাদা কোথায়? এ সব একটু ভাব কি? যেখানে আত্মস্থ সেখানে দেখ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সব এক আত্মা। তোমরা বল না - সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সাকার নিরাকার - জল বরফ যেমন নিত্য সম্বন্ধ। সাকারের ভিতর দিযা পাইবে নিবাকারও, ববফে জল ধরাই পড়িবে। নিরাকাবেব ভিতর দিয়া যাইবে - জলই ত বরফ রূপে। আচ্ছা, যেখানে এক আত্মা - অসঙ্গ, নিঃসঙ্গ, সেখানে আবার কেন আলাদা ভাবিবে? উহা লাগিবে কি? অতএব তোমার বেদান্তের দিক যাহা বলিতেছ, বাদ হয কোথায? ঐ-ত। যে লাইনে যে যাইবে, চরম পরম যাহা মূলতঃ আর আলাদা কোথায়? রাস্তাতেই ত যত আলাদা আলাদা ব্যাপার। যেহেতু আলাদা আলাদা সংস্কার। এদিকে আত্মরাম স্বরূপ রস যাহা - নিত্য কিনা। কেবল চিন্ময়ই যেখানে সেখানে ভাবিয়া দেখ। যেখানে পূর্ণস্থিতি সেখানে কোন দিকই বাদ হয় কি?

দীক্ষাদানের যোগ্যতা

এক সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী আসিযা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন - আমাকে কেহ বলে দীক্ষা দিতে। আমার ত সেই স্থিতি নয়। ইচ্ছাও হইতেছে না। কি করিব? মায়েব কথা - কর্তব্য হইল এই - যেখানে গুরুব আদেশ, সেখানে আদেশ পালন যতটুকু। যেখানে চরম পবম পূর্ণ লক্ষ্যই একমাত্র - সেই যে সাধক, তিনি কখনই গুরুপদ নেবেন না। সেই স্থিতিতে গেলে স্বযং গুরুস্থিতি প্রাপ্ত, ইহা ত স্বাভাবিক লভ্য।

নিজের সাধন পরম স্থিতি লক্ষ্যভ্রষ্ট কবিয়া বা গৌণ করিয়া যদি লোক-কল্যাণ বাসনা প্রধান করিয়া চলিতে চায়, সেখানে সেই শক্তি কোথায়? যেখানে স্ব-শক্তি অর্জন, সেখানেই কল্যাণ, তাহা না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। যেখানে জাগতিক প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, আর শিষ্য-পিপাসু - আব চাই অর্থ, সেখানে সব ব্যর্থ। শুধু কি ব্যর্থই, অমৃতের দিকে আর গতি কোথায়?

সাধকের বিভিন্ন দিক

সাধকের কোন সময়ে কাহারও গুরুভাবের একটা অবস্থা আসিতে পারে। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা মানুষের উপকার করার ভাবটি মানুষের যেমন স্বাভাবিক, তেমন কিন্তু সাধকের জীবের প্রতি করুণার ভাবটিও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হয়। জগৎ গুরু নহে কিনা - যেহেতু সাধক সর্ব গুণাতীত নহে, সহানুভূতি স্বাভাবিক - সেই সূত্রে। মহা করুণার কথা আলাদা। কেহ কেহ আবার গুরুভাবের অবস্থায় আসিলেও সে তাহাতে উদাসীন থাকিয়া আপন লক্ষ্যানুযায়ী কর্মাদি রীতিমত সম্পাদন করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত সাধকের রাস্তায় যে সব উন্নত বা অলৌকিক অবস্থা আসে, আপনা আপনি প্রকাশ পায়, সেইগুলি সে দেখিয়া যায়। সব সময়ই এক ভগবৎ সত্ত্বায় নিজেকে হারাইবার জন্য আপনাকে তৈয়ার করে 'আমি' 'আমি' করিয়াই হউক নয়ত 'তুমি' 'তুমি' করিয়াই হউক।

ইহার ভিতর আর একটি বিষয় আছে। কেহ হয়ত যে কোন রাস্তায় গিয়া ঘাট থাক বা না থাক, রাস্তা দেখুক বা না দেখুক, গঙ্গায় কোনরূপে ডুব দিয়া আসিল। আবার কেহ রাস্তাঘাট সব দেখিয়া শুনিয়া প্রসিদ্ধ ঘাটে গিয়া রীতিমত স্নান করিয়া আসিল। এই দুয়ের ভিতর প্রভেদ রহিয়াছে। কেননা প্রথম ব্যাক্তির স্নানের পরও যদি বিশেষ ঘাটের সংস্কার থাকিয়া যায়, অর্থাৎ ঘাটের মহত্বের গুণের অভাব, তাহার সংস্কার মুক্ত হইবার প্রয়োজন হইবে। কারণ তাহার বিশেষ ঘাটে ডুব দেওয়া হইল না। তাহা ছাড়া রাস্তা ঘাটও অজানা রহিল কিনা। দ্বিতীয় ব্যাক্তির ইহার প্রয়োজন হইবে না। আসল ডুব হইয়া গেলে সেখানে আর কোন প্রশ্ন নাই।

সাধকের সর্বশক্তি ও সর্ব প্রকাশটা হইতে গেলে তাহাকে সকল বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা দরকার, যে কোন রূপেই হউক। তাই দেখ, গঙ্গার স্রোত সব জায়গায় থাকিলেও হরিদ্বার ব্রহ্মকুন্ডে এত ভীড়। যে স্থানেই হউক, সব স্থানেই সব ত আছে। এই ভাব প্রকাশ হইলে আর কথা থাকে না। এক রাজা সম্রাট হইয়া যেখানে যত রাজা আছে সকলের খবর রাখে। যে সর্বজ্ঞ, সে সকলকে শিক্ষা দিলেও তাহার তো আর আলাদা কোথাও নাই, বাধাও নাই, নাইও নাই। তাহার আর বন্ধনের প্রশ্ন কোথায়? সাধকের এক অবস্থা আসে, যখন তাহার ভিতর উদয় হয়, সে সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং তাহাতে সব, সবেতে সেই। আবার যেখানে সাধক সব কিছু হইয়াও সেই একমাত্র। তাহার ভিতর তখন থাকে না

যে খন্ড খন্ড করিয়া ইহাও আমি, উহাও আমি বা আমিই সব। বাদ কিন্তু কিছুই যায় না।

খন্ড খন্ড ভাবে নিজেকে প্রতীয়মান হওয়া পর্যন্ত বুঝিতে হইবে, সে তখনও খন্ড ভাবে আবদ্ধ। সর্বজ্ঞ পূর্ণাঙ্গীন নয়। শুধু জ্ঞানলাভ করিলেই হইল না, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে যাইতে হইবে। যে সাধক, সাধনা করিতে করিতে, উন্নত হইয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে 'সে-ই' বলা যাইতে পারে কি? কেননা ভগবান তো অদ্বিতীয় অভিন্নও ত বটে। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির পারে যেখানে, সেখানে ত আর কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহাকে কি করিয়া বুঝাইলে যে বুঝান যাইতে পারে, তাহা ভাষায়ও প্রকাশ হয় না।

আবার কোন দৃষ্টিতে ভগবানের অবতার যে বলা হয, তাহাও কেহ কেহ বলে এক দিকের কথা। ইহাও সত্য। আবার এক দিকের কথা বলিয়াও কিন্তু কোন কথাই নাই। সবখানে, সব সময়ই যে সেই পূর্ণই স্বয়ং-প্রকাশ।

যাহাকে রূপ-অরূপ, ক্রিয়া-অক্রিয়া, ক্রম-অক্রম, আসা-যাওযা, নামা-ওঠা, কোন বিষয় ধবিযা ভাষায় বোঝান যায় না। অবতার গতাগতির দৃষ্টিতে তাঁহার ব্যবহার দেখায় মাত্র। এইসব করিলেও তিনি সেই। যখন এক ভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই তখন তাঁহাকে আলাদা কোন সংজ্ঞা দিলে তিনি খন্ড হইয়া পড়েন - ইহা এক দৃষ্টির কথা বুঝায় নাকি? খন্ডেই খন্ডের কথা বলে। তিনি ত অখন্ড, খন্ড বলিলেও খন্ডিত হন না।

কিন্তু আবার যেমন ফল থাকিলে তাহার বীজটিও সঙ্গে, পাতা বলিলে তাহার আকাবও সঙ্গে থাকে, ঠিক তেমনই - তাঁহাকে খন্ড হইয়া পড়েন বলিলেও সেইরূপে তিনি সর্বত্র সকলের সঙ্গে, সর্বক্ষণ ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিযা মিশিয়া আছেন। আবার যে তিনিই একমাত্র আছেন। দুইয়েতে সেই এক-ই। যেমন তোমরা বল একে একে একই। মিলিয়া মিশিবার প্রশ্নই বা কোথায়? ক্ষণই বা কোথায়? সেখানে আর কেউ বা কে? কাহার সঙ্গে মিলিবে? খন্ডভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধক তাঁহাকে সেইরূপ দর্শন করে। কল্যাণ-অকল্যাণ, কর্ম-অকর্ম লক্ষণ কি তাহাতে আছে? তোদের এই যতক্ষণ, বিচার ত ততক্ষণই। আবার সবই যে তাঁহাতে।

তবে আর একটি কথা এই যে - সব সময় তিনিই তাঁহাতে অবতরণ করিতেছেন। তিনিই সাধক রূপে পূর্ণ হইতেছেন, আবার বিশেষরূপে তিনিই

অবতরণ করিতেছেন - বাস্তবিক সত্য। করুণা, কল্যাণ ইত্যাদি যাহা তাহাও তাঁহাতে, ইহা সত্য জানিস।

আবার তিনি কিছু করেন না। তাঁহাতে কিছু নাই। যুগপৎ সব কিছু আছেও, নাইও। আবার নাই ও না, আছেও না। যা বল তাই - ঐ-ই। একাধারে তিনিই সব - যে কোন আকার প্রকারই মান, আবার নিরাকারই মান। দিন-রাত্রি, সন্ধ্যা-সকাল, জোৎস্না-অন্ধকার, যাহা কিছু হউক না কেন - শূন্য আকাশ, যাহা কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহারও কোন পরিবর্তন নাই। তাঁহাতে শুকাইবার বা সরাইবার কোন স্থান নাই। গতাগতিও নাই। আসেও না - যায়ও না।

ইহাও সত্য যে জগতের যখন দরকার হয় তখন তিনি যে ভাবে বুঝাইলে বুঝিবে সেই ধরণেব জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন, প্রকাশ হন দেখা যায়। কারণ যে যেমন, তাহার তেমন বিষয় না হইলে সে ধরিতে পাবে না ত। জগৎটাই বা কি? গতাগতিটাই বা কি? ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই সব পাওয়া। নিজেকে পাইলেই সব পাওয়া। তাই সময়ানুযায়ী তাঁহার দর্শন। আবার ইহাও কেহ বলে যে তাঁহার অনন্ত লীলা। তিনি ইচ্ছাময়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় জীব উদ্ধারের জন্য করুণায় প্রকাশিত হন - ইহাও সত্য। আবার এ কথাও বলে - ইচ্ছা অনিচ্ছার ভিতর আছ বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ ভাব উদয় হয়। ইহাও ঠিক - **যেমন ভাব তেমন লাভ**। এই শরীরের কথা ইহাও - ইচ্ছা অনিচ্ছা আবার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই নাই - এ সব কিন্তু তাঁহারই পূর্ণতায়।

অবতারদের এই যে লৌকিক কর্মের মত দেখায় বলিলে, জীব উদ্ধার করা, ভগবান অবতার রূপেতে যখন প্রকাশ হন বল, তাহার ভিতর ভগবত্তার খেলা যুগপৎ দেখা যায়। তাঁহার অলৌকিক গুণ, নানা ভাবে স্বাভাবিক প্রকাশ পায়। তাঁহাব সকল কর্মই তাঁহাতে পূর্ণ থাকে। তাঁহাব মাযার ক্ষমতার খেলাযও পূর্ণ। প্রকাশ ত সেই পূর্ণই। নিজেই স্বয়ং বিভূতিস্বরূপ। ইহাব সাথে আর বিভূতি প্রাপ্ত না। সব সময়ই জীব-যোগে আপন ভাবে খেলিয়া থাকেন। ধরা না দিলে কেহ ধরিতে পারে না। সাধকের যে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদিব মধ্যে যে যে পথ, অর্থাৎ যত মত তত পথ, সেই অনুযায়ী যে কি সুন্দর, অক্ষুন্ন সবই আছে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল - এই যে গাছটি দেখা যাইতেছে ইহা কি ভগবান? তখন বলা হইল - গাছ কি কখনও ভগবান হইতে পারে? যখন গাছ-পাতার

বুদ্ধিতে দেখিবে, তখন আর ভগবান দেখা হয় না। আবার এক ভগবান যখন দেখিবে, তখন আর গাছ পাতা দেখিবে না। তবে আবার একটা ভাব প্রবল হইলে দেখিবে এই গাছ পাতাও তাঁহারই এক রূপ। সেই ভাব ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে।

গুরুকেও মানুষ বুদ্ধিতে দেখিলে অন্যায় হয় জানিবে। যেমন বিগ্রহ, শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ ইত্যাদিতে শিলাবুদ্ধি রাখিলে অন্যায় হয। ইষ্ট, গুরু, মন্ত্র এক করিয়া দেখিবে। এক তিনিই স্বয়ং ইষ্ট, গুরু ও মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হন। তিনেই এক একেই তিন। যেমন বলা হয - আমার গুরু যিনি, জগতের গুরুও তিনি। জগতের গুরু যিনি আমার গুরুও তিনিই। যিনি ইষ্ট তিনিই এইরূপে গুরু। গুরুতে ইষ্ট, ইষ্টতে গুরু। যখন উন্নতি লাভ হয় তখন আর 'তে' নাই - তিনি-ই একমাত্র স্বয়ংই। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে সেই ইষ্ট গুরু। ইষ্ট গুরু যিনি, তিনিই সেই বিশ্বব্রহ্মান্ডে মনে করিতে হয়। ক্রমে প্রকাশ - একমাত্র ঐ-ই।

ইষ্ট কে? যেখানে অনিষ্ট নাই, যেখানে অনিষ্ট হয় না, তিনিই একমাত্র ইষ্ট। গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া যেমনটি হইলে আপনাকে পাওয়া। আপন একমাত্র সে-ই, ভগবান ইষ্ট - যার যার ধ্যেয়। আত্মস্থই বল আর সগুণ, সাকার, রূপমাত্রেরই বল - যা নিত্য স্বয়ং-প্রকাশ। তিনি আবার কি করিয়া প্রকাশ? সেই রাস্তায় যিনি হাত ধরিয়া লইয়া যান, তিনিই গুরু।

এই যে বলে - যাহা কিছু দেখ, এ সব তিনি নয়। তাহা কেন বলে? যে বিচারে বিচারক যোগী হইবে সে, জগৎ দৃশ্য যাহা আছে, তাহা নেতি নেতির অর্থাৎ 'এ সে নয়', 'এ সে নয়' ভাবে দেখে বলিযাই এইরূপ বলে। অর্থাৎ ঐখানে ঐ দৃষ্টিতে ঐরূপই যে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে - যে পর্যন্ত কোন বিষযেব গতাগতির পরিবর্তন আছে, তাহা কি কবিয়া সে-ই নিত্য হয়? তাই যতক্ষণ সে শুধু গতাগতিব দৃষ্টিতে দেখে, ততক্ষণ ঐ কথাই বলে। পবে বিচার করিতে করিতে বিচারকের গতি যখন সর্ব সংস্কাবেব মুলোচ্ছেদ হইয়া একাগ্রতা ও পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন একাত্ম, এক আত্মা যা - তাই, আব কোন প্রশ্ন নাই। একাগ্র মানে কি? মন বহু অগ্র নিয়া ত। যে মূহুর্তে আসল একাগ্র হইল, অর্থাৎ স্থিতি লাভ করিল. তখনই সে মূলে, আর মূল কাহাকে বলিবে? স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ত আলাদা দৃষ্টি মাত্র। যাহা আছে মূলে তাহাই ত স্থূলে, যাহা স্থূলে তাহাই ত মূলে। কি রকম সেটা শোন - তোরা গাছের গোড়াটি দেখিয়া জল দিলি, বেশ গাছটা তাজা হইল, বডসড় পাতায় ফুলে

ফলে সজ্জিত। ফলটি যখন পাকিল, বেশ সুন্দর। অমৃতত্ব বাহির কর। বীজটি যে পাকিল, যেখানে না, সেখানে অমৃতত্ব ত? অমৃতত্ব কি? সে কি দিল? বীজ দিল। ঐ গাছের মৃত্যু হইল না। তখন আর একটা পাইলে ত। কাপড় বদলান মাত্র - সেই বীজ ও বৃক্ষত্ব ত। আত্মার ধ্বংস নাই, দৃষ্টি সৃষ্টির গতিতে এই পরিবর্তন দেখিলে মাত্র।

মৃত্যু কোথায়? পূনর্জন্মই বা কোথায়? তুমি ছোট্ট শিশু ছিলে এই যে বদলাইয়া গেলে। মৃত্যু যদি বল তবে ত পূনর্জন্ম, মৃত্যু সব সময়ই হইতেছে। তোমার শিশুত্ব উপস্থিত যে বৃদ্ধত্বের দিকে। এইটি তন্ন তন্ন করিয়া আলাদা যেমনটি যেখানে - আছেই ত। এই স্থূলেও আবার নাই। এটা তোদের দৃষ্টিতে ত। কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু - আসলে সেখানে জন্ম-মৃত্যু, আসা-যাওয়ার প্রশ্ন কোথায়?

বীজ যখন পাইলে - কোথায় খুঁজিয়া দেখ গাছের কোন অংশ ইহা হইতে পারে না? আচ্ছা, এই যে তোরা কলম কাটিস্ কোন জায়গায় শিকড়টা নাই, বাহির কর। এখানে গতি স্থিতি, পরিবর্তন অপরিবর্তনে কে গো? খোঁজ।

প্রঃ - এটা সে টা কোথায় থাকে? এটাও, সেটাও - সে-ই?

মা - সে-টা বন্ধনে থাকে, একদেশ দৃষ্টিতে থাকে। যেখানে দৃষ্টি-সৃষ্টি, গতি-স্থিতি আলাদা করিয়া যাহার কাছে, তাহাকেই বলে জীব।

মন যখন মূলে, তখন কি আর এ-কূল ও-কূল - দুকূলে? সে অবস্থায় বরফ গলিয়া জলে মিশিয়া যাওয়ার মতন, তাহাতে তাহার স্থিতি হয় বলিয়া তাহার আর ভিন্ন দৃষ্টি থাকে না।

মায়া ও জ্ঞান

মায়া শব্দ - মে আয়া অর্থাৎ আমি আসিয়াছি, আমি যাই, এই ত। আসা যাওয়া একই কথা। ঘর বুদ্ধিটা আর কি। যেখানে হইতে আসা, সেইখানেই যাওয়া অর্থাৎ আসা। আসা থাকিলেই যাওয়া আছে যাওয়া থাকিলেই আসা আছে। কারণ ঐ ঘর হইতে এ ঘরে আসিয়াছে। ইহার অর্থ হইল - ঐখান হইতে চলিয়া গিয়া এইখানে আসিয়াছি। মায়ার আর একটি অর্থ - এই দেখা যায়, এই দেখা যায় না - যেখানে দৃষ্টি। এই গতাগতি মায়া রূপেতেও অনাদি - শান্ত। তোমরা বল না যেমন কোন সময় আমগাছ সৃষ্টি হইয়াছে, কি করিয়া তাহার

বীজ এতদিন রক্ষা হইয়া আসিয়াছে। বলিতে হয় প্রকৃতির খেলা এইরূপ চলিয়া থাকে। কিন্তু সাধক প্রকৃতির উপর না গেলে এক লক্ষপতিটিকে কি বুঝিতে পারে - এই ত প্রকাশ। আত্মার ধ্বংস নাই ত। তোমরা বল না, নিত্য-শুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্ত-শাশ্বত। যাহা পরিবর্তনশীল, গতাগতি তাহাকেই ধ্বংস বলে - যেখানে আসা যাওয়া, জন্ম মৃত্যু।

যাহা নয়, কিন্তু সত্য বলিয়া যে মনে হয়, এই যে ভ্রম ভ্রান্তি, মিথ্যা, অসত্য - মনের ব্যাপার। ব্যাপার মানে এপার ওপার আছে। সবের পারে নয় - যেখানে পাবাপারের প্রশ্ন নাই, নিত্য অপ্রাকৃত লীলা যেখানে। নিত্য যদি রাখ, অনিত্যের স্থান কোথায, এ প্রকৃতিব স্থান কোথায?

সত্য যেখানে নিত্য প্রকাশিত - ইহা যেখানে, সেখানে মাযাব স্থান কোথায? সেই জন্যই কোন জায়গায় কথা, তাঁহারই মাযা, যোগ দুই - অর্থাৎ সৃষ্টি যেখানে। কেবল পড়াশুনাতেই মূল জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিতে হইলে সর্বক্ষণ ঐ কর্মে লাগিয়া থাকাই আবশ্যক। আবার জ্ঞান কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ, কোন কর্মের অপেক্ষা রাখে না।

সংসারে আদেশ পালন

দেখ, সংসার ত 'সংই - সার'। সং সাজা বই ত নয। সংটাকে সার বলিযা বসিয়া থাকা হয় বলিয়াই যত দুঃখ কষ্ট। একটা কথা মনে রাখিও যে সংসারে সত্যনিষ্ঠাভাবে কর্মাদি করিলেও সকলের মনেব গতি সমান নয় বলিযা, যার যাব নিজের মনের ভাব অনুযায়ী ধাবণায় অপরেব কর্মগুলি গ্রহণ হয়। তাই যে কাজ করে, সর্ব সময় সে প্রশংসাভাজন হয না। সংসারের ন্যায়-অন্যায় না দেখিয়া অনেক সময় ছোটদের উপব মন্দ ব্যবহার হয়। ইহা পরে কেহ কেহ বোঝে, কেহ কেহ বোঝেও না। আবার কেহ কেহ বুঝিলেও স্বীকার করে না। কিন্তু যখন আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইবে, সে সময অবিচারে সত্য ভাব বজায রাখিয়া কেবল আদেশের উপর নির্ভর করিয়া সকল কাজ অম্লান বদনে করিয়া যাইবে। উপরওয়ালা কোন চোখে দেখিল এইসব কখনও ভাবিবে না। কারণ উপরওয়ালার বিচার করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। হাসি মুখে আদেশ পালন করাই তোমার করণীয়। মনে দুঃখ রাখিযা কোন কাজ করিবে না। তাহা হইলে কর্ম সূচারুরূপে শুদ্ধ হয় না। আর মনটাও মলিন হইয়া যায়। তাই কর্তব্য হইতেছে যে সর্বক্ষণ আনন্দে আদেশ পালন কবিয়া যাওয়া।

ভোলানাথের আদেশ নির্বিচারে পালন

বাহিরে কাহারো সামনে বাহির হওয়া সম্বন্ধে তখন এ শরীর আপত্তি করিত, কোথাও যাওয়া আগেও এ শরীরের খেয়াল হইত না - ভোলানাথ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। এই সব বিষয়ে তাঁহার মত অনুযায়ীই যতটুকু পারিতাম চলিতাম।[১৭] একদিন ভোলানাথের সম্পর্কিত একজন আত্মীয় আমাকে কথায় কথায় বলিল - আপনি যে ভোলানাথ যাহা বলিবে, তাহাই শুনিবেন এমন কি কথা আছে। তিনি যদি আপনাকে খারাপ কিছু করিতে বলেন, আপনি কি তাহাই করিবেন? আপনার নিজের কি বুদ্ধি বিচার নাই। এ শরীর বলিল - এ শরীরটার গতি ঐ সব ভাবিবার দিকই না। কেবল আদেশ পালন করিয়া যাওয়া, এই শরীরটার যতটুকু আসে। ঐ সময় উপস্থিত হইলে কি হইবে এখন বলা আসিতেছে না। সে শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী মার সমাধির বিভিন্ন স্তরের ছবি

[১৭] ইহা ৮/৯ মাস ধরিয়া চলিয়াছিল প্রায় ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ পর্যন্ত।

সপ্তম অধ্যায়

দর্শনার্থীর আগমন

আমরা ঢাকা আসার পর একদিন সকালে ননীবাবু[১] বাগানে বেড়াইতে আসে ও ভোলানাথের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। এই শরীরের কথা তাহার সহিত আলোচনা হইলে সে এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। এক সন্ধ্যাবেলা ননীবাবু ও প্রাণগোপালবাবু[২] আসিল আব এ শবীরের কুন্ডলী অবস্থায তাহাদেব সহিত কথাবার্তা হুইবার পর তাহারা স্থির ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া চলিযা গেল। সে সময় হইতে ৬/৭ দিন পর পর সন্ধ্যার সময় তাহারা আসিযা আপন মনে এই শরীরটার সামনে বসিযা থাকিত।

প্রাণগোপালবাবু ধর্মপ্রাণ লোক। তাহারা উভয়ে বলে এখানে আসিলে স্থির ভাবে জপ চলে। এ শরীর যখন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি যাইত তাহারাও মাঝে মাঝে যাইত। একদিন সন্ধ্যায আমি ও ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরী গেলাম, তাহারা দুইজনও ছিল। রাত্রি সেইখানেই শেষ হইল। প্রাণগোপালবাবু ফিরিবার পথে বলিল যে ধর্ম করিতে করিতে রাত ভোর করা আমার জীবনে এই প্রথম।

একদিন সকালে রান্না করিতে যাইতেছি এমন সময় ভূপেন[৩] আসিয়া জ্যোতিষের নাম কবিয়া বলিল - আমি এগ্রিকালচার অফিসে কাজ কবি। জ্যোতিষবাবু[৪] আপনার সহিত দেখা কবিতে অভিলাষী। ভোলানাথ বলিল -

[১] ননিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক।

[২] প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায ঃ ঢাকাব ডেপুটি পোষ্টমাস্টার জেনাবেল।

[৩] ভুপেন্দ্রনারায়ণ দাশগুপ্ত ঃ ঢাকাব কৃষিবিভাগের কর্মচারী।

[৪] জ্যোতিষ চন্দ্র বায (জ্যোতিষ), আই এস.ও; ভাইজী নামে খ্যাত। কযেক বছব মাযের সেবায থাকাকালীন ভাইজী বিভিন্ন সময়ে মাকে বিভিন্ন প্রশ্ন কবেন এবং মায়েব উত্তরগুলি নিজেব ডাযেরীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখিযা রাখেন। ইহাই একত্র কবিযা পবে এই পুস্তক রূপে প্রকাশিত হয।

আচ্ছা। সব শুনিলাম। সেই সময়ে কেহ দেখা করিতে আসিলে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, না হয় রান্না ঘরে চলিয়া যাইতাম। ভোলানাথ ডাকিত এবং অনেক সময় বলিত যে সকলে সৎ উপদেশ শুনিতেই ত আসে। তুমি এইরূপ কর কেন?

দুই এক দিনের ভিতর দেখিলাম যে সকাল বেলা তিনজন আসিল। ভোলানাথ ডাকিলে আসিলাম। সকলের নিকট তখন এ শরীরের ঘোমটাই থাকিত। কুন্ডলী দিয়া একবার কথা আরম্ভ হইলে তখন আর মাথার কাপড় টানাটানির কোন খেয়ালই থাকিত না। যখন যেমন থাকিত। সেইদিন আসিয়া তাহাদিগকে বসিবার জন্য তিনখানি পিঁড়ি দিলাম। তাহারা বসিল। এই শরীরেরও কুন্ডলী দিয়া বসাটা তখন হইয়া গেল। কুন্ডলী দিয়া স্থিরভাবে আসনে বসিয়া আছি, ভোলানাথও সেখানে আছে। জ্যোতিষ জিজ্ঞাসা করিল - আমাদের পারমার্থিক উন্নতির কোন আশা আছে কি? এ শরীর বলিল - ক্ষুধা তো এখনো পায় নাই। আর বিশেষ কোনও কথাবার্তা হইল না। খানিক বসিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

কুণ্ডলী মুছিয়া উঠিয়া অন্য ঘরে যাইতেছি, তাহারা ঘর হইতে প্রায় শত হাতের বেশি দূরে গিয়াছে, জ্যোতিষের উপর এ শরীরের লক্ষ্য পড়িল। পিছন দিকটা দেখা গেল, তাহার গায়ে একটি চাদর মাত্র। অথচ পরে শুনিয়াছি যে সে সময় তাহার জামা ও চাদর উভয় ছিল। এই শরীরের দৃষ্টিতে আসিল যে সূতার নালের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে তাহার সহিত পরমার্থসূত্রে এ শরীরের সংযোগ রহিয়াছে। শুধু পরমার্থ নিয়াই সকলের এ শরীরেব কাছে আসা ত। ইহার পর সে প্রায় এক বছর সাহবাগে আসিল না। কোন কোন সময় খেয়াল হইলেও তাহাকে ডাকি নাই। কারণ এ শরীর জানিত, সময়ে সব হইবে।

জ্যোতিষের সহিত ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ

জ্যোতিষ একবার 'সাধনা' নামে একখানি বই লিখিল। ঐ পুস্তক এই শরীরকে শুনাইবার জন্য ভূপেনকে একদিন পাঠাইয়া দিল এবং এ শরীর কি বলে তাহা জানিতে চাহিল। তাহাকে বলিলাম - যাহার বই তাহাকে পাঠাইয়া দিও। সে প্রায় এক বৎসর পূর্বে সাহবাগে আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে আর আসে নাই। ভূপেন যাইয়া ঐ কথা বলিলে সে একদিন আসিল। নিজে পুস্তকখানি পড়িয়া এ শরীরকে শুনাইল। এ শরীরের কথা বন্ধের তখন তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এ শরীর তখন কুণ্ডলী ছাড়া কথা বলিলেও কেমন একটা চাপা চাপা ভাব থাকিত। বেশি

কথা বা সব সময় কথা একেবারেই হইত না। সেইদিন জ্যোতিষ আসিলে আমি ও ভোলানাথ বসিয়া তাহার সহিত এই প্রথম কুণ্ডলী ছাড়া বেশ খোলা ভাবে তত্ত্ব বিষয়ক কথা বলিলাম।[৫] সেই হইতে প্রায় প্রত্যহ জ্যোতিষ সাহবাগে আসিত।

একদিন এ শবীর, ভোলানাথ, ভূপেন ও জ্যোতিষ বসিযা কথাবার্তা বলিতেছে, হঠাৎ আমার চোখে তাহার সহিত প্রথম দিনে সাক্ষাতেব ছবি আসিল। তখন হইতে দেখা যাইতে লাগিল সে যেন একখানি চাদব গাযে দিয়া পবিত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত এ শরীরের সম্মুখে বসিযা আছে। যদিও তাহার নাম মুখে আসিল না, এ শরীর বলিয়া উঠিল - আমরা এখানে তিনজন ব্রাহ্মণ আছি।

চার পাঁচ মাস পরে শশাঙ্কবাবুর[৬] ছেলে নন্দু এই শরীরকে কথায় কথায় বলে যে জ্যোতিষবাবুর পায়ে পড়িযা আমার নমস্কার কবিতে ইচ্ছা করে। এ শরীর বলিল - তোমার যখন ইচ্ছা জাগিয়াছে, সুযোগ হইয়া যাইবে। ইহাব পর সে একদিন সাহবাগে আসিলে জ্যোতিষকে সেইভাবে নমস্কাব করিল। এ শবীর জ্যোতিষকে বলিল - সেই দিন তিনজন ব্রাহ্মণেব কথা এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তোমার উপরই লক্ষ্য ছিল। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত এ শরীরের ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ।

গৃহকর্মে ভাবাবেশ

এ শরীরের তিন গ্রাস প্রাতে ও তিন গ্রাস রাত্রে, খাওয়াব ব্যবস্থাও সমানে আছে।[৭] আশু ও মাখন সাহবাগে ছিল। সকালে ছেলেদের জন্য রান্না ও তাহাদের খাওয়া হইয়া গেলে বাসনাদি পরিষ্কার করিয়া, স্নান করিয়া পুনরায় রান্না হইত। ভোগ নিবেদন হইয়া গেলে ভোলানাথ আহার করিত। ডাল চাল এক একটি করিয়া বাছা হইত, চাকর বাসন ধুইলে আবার নিজে হাতে ধোযা হইত, সকলেব জন্য পাক, খাওয়ান, পুকুর হইতে নিজে জল আনিয়া ভোগের বান্নাবান্না করা ও অন্যান্য গৃহকর্মাদি সমস্তই একা করিতাম। এ সকল কর্মাদি করিতে করিতে কতবার যে মাটিতে কত সময় পড়িয়া থাকিতাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কখন দেখা গিযাছে, তরকারী কুটিতে কুটিতে দা'এব উপর হাত পডিযা আছে। আবাব যখন

[৫] জানুয়ারী ১৯২৬।

[৬] শশাঙ্ক মুখার্জী - অবসব প্রাপ্ত ঢাকার সিভিল সার্জেন; পবে সন্ন্যাস নিযা নাম হইযাছিল স্বামী অখন্ডানন্দ গিরি।

[৭] ইহা ৮/৯ মাস ধরিয়া চলিয়াছিল প্রায ফেব্রুযারীর ১৯২৫ পর্যন্ত।

উঠিতাম তখন সে কাজ শেষ করিতাম। রান্না করিবার সময় চুলার লাকড়ি টানিয়া দিতে গিয়া হাত ঐখানেই পড়িয়া থাকিত। অনেক সময় হাতে আগুনের তাপও লাগিত, পরে উঠিয়া দেখিতে পাইতাম কিন্তু পোড়ার জ্বালা বোধের প্রকাশই কোথায়? কে করে?

কোন কোন দিন আগুন নিবিয়া রান্নার জিনিষাদি পোড়া, কাঁচা, আধা বা বেশি সিদ্ধ হইয়া থাকিত। ঢুলিতে ঢুলিতে যাইয়া আবার সে সব ঠিক করিয়া তৈয়ারী করিতে করিতে ভোলানাথের খাওয়ার অনেক দেরী হইয়া যাইত। ভোলানাথ জানিত যে এ শরীর ইচ্ছা করিয়া এইরূপ দেরী করে না, যথাসাধ্য সব কাজ সুন্দরমত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সেই সময় আর হইয়া উঠিত না। কি এক মহা নেশায় পড়িয়া থাকা। অবস্থাটি যেন ক্রমশঃ একটু বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল।

ভোলানাথ একদিন খাওযার সময় কাছে দাঁড়াইয়া, তিন গ্রাস খাওয়া হইলে অতি জোরের সহিত বলিতে লাগিল - দেখি তুমি কেমন বেশি খাইতে পার না। শীঘ্র আর এক গ্রাস খাও। এ শরীর লইতে যাইতেছে, আর হাত কাঁপিতেছে ও হাত খুলিয়া ভাত পড়িয়া যাইতেছে। ছেলে মানুষের মত আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কি এক রকম হইয়া গেল। ভোলানাথ এইসব দেখিয়া ব্যস্ত সহকারে বলিল - হইয়াছে, আর দরকার নাই। এখন উঠিয়া আস।

ভোলানাথের উৎকণ্ঠা

ভোলানাথের খাওয়া হইতে হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইত। কি করিব। এ শরীর সর্বদা ঢুলু ঢুলু ভাবে পড়িয়া থাকিত, কোন জিনিসের জন্য এক কোঠায় গিয়াছি হয়ত অবশের মত সেইখানেই পড়িয়া আছি। স্থান অস্থান নাই। উঠিলে দেখি যে জন্য আসিয়াছি, সে খেয়ালও আর নাই। সেই সময় কেহ কথা বলিলে শোনা হইত কিন্তু শুনিতে শুনিতে ধোঁয়ার মত আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইত। স্থান অস্থান ছিল না, যেখানে সেখানে নেশাখোরের মত শরীর অবশ হইয়া পড়িয়া যাইত। ঘন্টাব পর ঘন্টা চলিয়া যাইত। আবার কোন কোন দিন ২/৪ ঘন্টা পর্যন্ত এইভাবে কাটিত। কখনও আবার অল্প সময়েই উঠিয়া পড়া হইত। ভোলনাথ ভাবিতেন - এইভাবে কি করিয়া সংসারের কাজকর্ম চলে। কেহ আসিলে ভাল হয়। পরে এ শরীরও বলিল - হ্যাঁ আসিলে ভাল হয়। এ শরীরের ত সকল বিষয়েই নিশ্চিন্ত।

ইহার ভিতর একদিন ভোলানাথের ভগিনী মটরী আসিযা বলিল যে, তাহার ছেলের দেশের পড়া শেষ হইয়াছে, সে এখন এখানে থাকিতে পারে। ভোলানাথ কোন আত্মীয়ের বিশেষ খবরাখবর রাখিত না। মটবী নিজ হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিয়া গেল। যদিও তাহার শরীর অসুস্থ, তবুও এ শরীরকে কোন কাজ করিতে দিত না। একাই সব করিত। তাহাব খাওয়ার বাঁধাবাঁধি ছিল। স্নান নিষেধ ছিল। ঠাণ্ডায় নাকি ব্যারামে পড়িত। কিন্তু এখানে আসা অবধি রোজই স্নান করিয়া ভোগাদি রান্না করা, অবেলায় খাওয়া, অনিয়মে চলা - এ সব সত্বেও তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা বরং ভালই হইতে লাগিল।

এদিকে সংসারের সকল কাজের সুবিধা হইয়া গেল। যাহার কর্ম তিনি করেন, মানুষ ভাবিয়া শুধু বৃথা হয়রান হয়। লক্ষপতির উপর লক্ষ্য ও নির্ভরতা থাকিলে, তাঁহার মহতী অনন্ত শক্তি আসিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার ভাবে অনুভাবিত হইতে পারিলে দেখা যায, তাঁহাকে যাহা নিবেদন করি না কেন, তাহাই আবার আমাদের কাছে বিশিষ্ট রূপে ফিরিযা আসে।

তখন দিনে তিন গ্রাস মাত্র খাওয়া হইত।

এক সত্ত্বা ভাব

কয়েকদিন পর দেখিলাম - যখন লক্ষ্মীর আসনে, যেখানে ২/১টি দেব-দেবীর যে ছবি ছিল সেখানে বসিয়া ভোগ নিবেদন বা প্রণাম করিতে গেলে দেহাত্ম ভাবের প্রকাশটাও যেন কোথায লয় হইয়া মিলাইয়া যাইত। এক সত্ত্বা ভাবের প্রকাশটিতে শরীরের চলাচল ও কর্ম বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। দিনে দিনে দেখা যাইতে লাগিল, যখনই ঐ আসনের নিকট কিছু নিবেদন কবা হইবে বলিয়া বসা হইয়াছে, তখনই উক্ত ভাবটি আসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবশের মত মাটিতে পড়িয়া থাকা হইত। ভোগের অন্ন ব্যাঞ্জনাদিতে পিঁপড়া ধরিয়াছে, এ শরীরের সর্বাঙ্গে ও মাথার চুলের গোছায়ও জড়াইয়া বহিয়াছে, যেন তাহাদের নিজের ঘর বাড়িতে বাস করিতেছে এবং আহারাদিতেও নিশ্চিন্ত আছে। মাথা, হাত, পা, হাঁটু বেকায়দায় পড়িয়া আছে। এইরূপে অনেকদিন অনেক সময় কাটিয়া যাইত। যখন প্রকৃতিস্থ দেখাইত তখন শরীর ঠিক হইতে বহুক্ষণ লাগিত। নিবেদন করিবার ভাবে বসিতে গেলে, সমস্ত কর্মেব গতি যেন কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া কিরূপ হইয়া সুন্দব একটি ভাবে শান্তরূপে পডিযা থাকিত।

ফলাহারের খেয়াল

ইতিমধ্যে আর এক খেয়াল হইল - কেবল ফলাদি খাইয়া থাকিব। বাগানে যে ফলাদি হইত, তাহার মূল্য দিয়া খাওয়া হইত। আর দুধ আপনা হইতে মিলিলে খাওয়া - নতুবা নয়।[৮] ফল বা দুধের কোন বাহিরের ব্যবস্থা না করিবার জন্য ভোলানাথকে বলিয়া দিলাম। বাগানে সব সময় ফল থাকিবার কথা নয়, কিন্তু দেখা যাইত এ শরীরের সামান্য খাওয়া কোন না কোন ব্যবস্থা হইয়া যাইত। এই শরীরের অবস্থাদি শুনিয়া বাগানের মালিক প্যারী বাণু বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে বাগানের ফল এই শরীর যাহা খাইত, তাহার জন্য যেন কোন মূল্য নেওয়া না হয়।

জানিবে শরীর যাহার, রক্ষার ব্যবস্থা তিনিই করেন।

অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত পালন

ইতিমধ্যে অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। ভোলানাথ যখন বাজিতপুরে, প্রথম দিকে, এ শরীর তখন বিদ্যাকূটে ছিল। সে সময়ে এ শরীরের এক ভ্রাতৃবধূ অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত নিবার মনস্থ করিয়াছিল। ব্রাত্য পূর্ব দিন সংযমাদিও করিয়াছিল। শেষ রাত্রে উঠিয়া আমাকে বলে যে ঠাকুরঝি! আমি ব্রত নিতে পারিব না, বাধা হইয়াছে। আপনি আমার আয়োজনাদি নিয়া ব্রত করুন। এ শরীর বলিল - আমি ত পূর্বের দিন সংযম ব্রত করি নাই, ভোলানাথকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কি করা যায়। দেখিলাম শরীরের মায়ের খুব মত, পিতারও আদেশ ছিল। পুরোহিত বলিল প্রাতঃস্নান করিলে সংযম না করিলেও চলে। এইরূপ এই অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত নেওয়া হইয়াছিল।

ভোলানাথ বলিল টাকাপয়সার অভাব, যাহা না হইলে চলে না, সেই হিসাবে আয়োজন কর। তিনি যাহা করেন তাহাই হইবে, এ শরীরের কোন ভাবনা নাই, কথাও নাই।

ব্রতের পূর্বদিন ভাটপাড়া হইতে পুরোহিত আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত, বলে - ব্রত প্রতিষ্ঠা হইবে শুনিয়া আসিয়াছি। আপনারা ত কিছু জানান নাই। ভোলানাথ বলিল - সংক্ষেপে কাজ তাই কেবল কুল পুরোহিতকে খবর দিয়াছি। পুরোহিত

[৮] এই নিয়মে পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া চলিল, ১৯২৫ এর আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত।

বলিল - আমি যখন আসিয়া পড়িয়াছি, কাজটি পুরোপুরি করিয়া ফেলুন। কত আর খরচ হইবে? তাহাই হইল। অনেকে আসিয়া যোগদান করিল। কাজটি পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সুসম্পন্ন হইল।[৯]

সাহবাগে মা

একদিন যোগেশবাবুর[১০] ছেলে প্রফুল্লবাবু কালীবাড়ি আসিলে, তাহাকে এ শরীরের নামে কে, কি কি বলিয়াছে, এই সব যোগেশবাবু শুনিয়া সাহবাগে অন্য লোকের আসা বন্ধ করিয়া দিল। তখন সাহবাগের চার্জ তাহার উপর ছিল। একদিন যোগেশবাবু নিজে আসিয়া ভোলানাথকে ডাকিয়া অনেক কথা বলিল। ভোলানাথ উহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিল - তোমার উপলক্ষ্যে এইসব বাহিরের লোকজন আসে, নানা লোকে নানা কথা বলে। আমি এত অপমানিত হইয়া কাজ করিব না। এ শরীর বলিল - তুমি চিন্তা করিও না, এ শরীর নিজে যোগেশবাবুর নিকট যাইয়া যাহা করিতে হয় করিবে। ঘটনাচক্রে পরদিন ১০/১১ টার সময় যোগেশবাবু ও ভুদেববাবু আসিল। যোগেশবাবু নিজ হইতেই ভোলানাথকে বলিল - তিনটার সময় গাড়ি পাঠাইয়া দিব, আপনারা আমার বাসায় আসিবেন।

আমরা গেলে যোগেশবাবুর শুইবার ঘরে আমাদিগকে লইয়া গেল। এ শরীর চুপ করিয়া বসিল। সাধন-ভজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে এ শরীর কুণ্ডলী দিয়া তখনকার অবস্থা কিছু কিছু সংক্ষেপে বলিল। তখন যোগেশবাবু জিজ্ঞাসা করে - আপনি যে মৌন আছেন, কাহার উপাসনা করেন? মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল ব্রহ্মের উপাসনা। অথচ ব্রহ্ম কাহাকে বলে, উপাসনা কাহাকে বলে, বাহির হইতে কিছুই শোনা নাই।

তাহাকে জানাইলাম যে ভোলানাথ আর বাগানে চাকুরি করিতে চাহে না। আমরা চলিয়া যাই। যোগেশবাবু বলিল - না, না। আপনারা বাগানে থাকুন, যাইতে পারিবেন না। তাহার ছেলে প্রফুল্লবাবু তখন ঢাকার নবাব এস্টেট হইতে চাকুরি গিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ কি জিজ্ঞাসা করিল। মুখ দিয়া বাহির হইল - তাহার এখন সময় খারাপ। আট মাস পরে ভাল হইবে। আট মাস পরেই তাহার চাকুরি হইয়াছিল। এইসব নানা কথার পর সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম। আবার

[৯] ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৫।

[১০] ডাঃ রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ ঃ নবাব এস্টেটের প্রধান পরিচালক ও ট্রাস্টি।

নির্বিবাদে দিন কাটিতে লাগিল।

এ শরীর আপনভাবে সাহবাগে বেড়াইত।[১১] থাকার একটি ঘর ও একটি বড় নাট মন্দিরের মত ছিল। তহার দুই কোণায় দুইটি কুঠরী ছিল। আরও একখানি দালান ছিল - খানাঘর বলিত। এইসব স্থানে একলা হাঁটিতে হাঁটিতে মুখ দিয়া আপনা আপনি কত কি বাহির হইত।

একদিন ঐ খানাঘরের বারান্দা হইতে দেখি, বাজিতপুরে যে আরব দেশীয় মহাপুরুষ দেখিয়াছিলাম সে এবং তাহার পিছনে এক চেলা সামনের রাস্তায় কতদূর যাইয়া ঐখানেই মিশিয়া গেল। সাহবাগে যে দুইটি বাঁধান কবর আছে - তাহা ইহাদেরই।[১২] ইহার পরে ছেলেরা আলোচনা করিতে শুনিলাম যে আরব নামীয় এক দেশ আছে, তাহাতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি।

প্রাণগোপালবাবু সরকারী কর্ম হইতে অবসর নিয়া ঢাকা হইতে চলিয়া যাইবার কথা হইতেছে। ইতিমধ্যে তাহার পূর্ব পরিচিত অটলবাবু ও গিরিজাবাবু[১৩] ঢাকায় আসিয়া এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিল। প্রাণগোপালবাবু যাইবার পূর্বে এই শরীরের একটি ফটো লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহাকে বলিলাম অমুক সময় না হইলে এখন ফটো হইবে না। সে সময় আসিলে ফটো নেওয়া হইল এবং তিনিও ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। উহাই এ শরীরের প্রথম ফটো।[১৪]

প্রাণগোপালবাবু চলিয়া গেলে তাহার কাজে প্রমথবাবু[১৫] আসিল। সেও সস্ত্রীক সন্ধ্যার সময় আসিয়া সাহবাগে জপধ্যানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যাইত।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীর ঃ প্রথম তোলা ছবি - ১৯২৫ সালের জুন।
প্রথম সারিতে ঃ বাউল চন্দ্র বসাক, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়
এবং ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। বেদীর উপরে ঃ বাবা ভোলানাথজী ও শ্রীশ্রী মা।

[১১] সাহবাগের বিস্তাবিত বিবরণ, দ্রষ্টব্য ঃ পবিশিষ্ট - ৬।

[১২] অনুমান করা যায় বাজিতপুরে সূক্ষ্ম শরীবে মুসলমান ফকিব মাকে বমনা মন্দিরের নিকট সাহবাগে আমন্ত্রণ করিযাছিলেন, যেখানে তাঁহার মাজার আছে। এই মূর্ত্তি মা দেখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে 'আবব দেশীয় মহাপুরুষ' - চতুর্থ অধ্যাযে। এঁর মাজাবে মা নমাজ এবং কোবানেব কিছু অংশ স্বাভাবিক ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য ঃ একাদশ অধ্যায।

[১৩] গীরিজা শঙ্কব ভট্টাচার্য্য ঃ রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক।

[১৪] জুন, ১৯২৫।

[১৫] প্রমথবাবু (প্রমথনাথ বসু) ঃ ঢাকায় ডেপুটি পোষ্টমাস্টাব জেনাবেল, পরে কোলকাতায স্থানান্তবিত হইয়াছিলেন।

দীপান্বিতা পূজা

একবার ভোলানাথের বাড়ি হইতে খবর আসিল, বার্ষিক দীপান্বিতা কালীপূজা ঢাকায় করিতে হইবে। একদিন সন্ধ্যার সময় বাউল আসিলে, বলিলাম - পূজার পুরোহিত ঠিক কর। বাউল বলিল - এ পূজা মায়ের করিতে হইবে। এ শরীর বারম্বার না করিতে লাগিল। তাহা সত্ত্বেও বাউলের কথায় ভোলানাথও জিদ করিতে লাগিল। অটল সে সময় সাহবাগে ছিল, সেও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বলিলাম - কালীপূজা তো, বাহিরের অনুষ্ঠান। কখনও করি নাই। বিশেষতঃ বার্ষিক পূজা, ইহা পুরোহিত দিযাই কবান দবকাব। বাউল বলিল - আচ্ছা! আমরা স্বতন্ত্র একটি প্রতিমা আনিব, মার সেই মূর্তি পূজা কবিতেই হইবে। তাহারা ইহাও স্থির করিল যে সে পূজায় বলি দিতে হইবে। বার্ষিক পূজায বলির নিয়মও নাই।

পূজার দিন বার্ষিক কালীপূজার সকল ব্যবস্থা নিজ হাতে করিয়া দিয়া, অন্য আর এক ঘরে অন্য পূজার আয়োজনাদি করিয়া এই শরীর যাইয়া ভোলানাথের বিশেষ আদেশে পূজায বসিল।[১৬] আসন অবস্থায় মাটিতে পড়িযা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর, এ শরীরের হাত নড়িয়া গিয়া যেন কলের পুতুলের মত পূজাদি সম্পাদন করিল। একটি সবল পাঁঠা বলি দিবার জন্য স্নান করাইযা এ শরীরের কাছে আনিল। সেই পাঁঠাটিকে কোলে নিলাম, কোথা হইতে এ শরীরের খুব কান্না আসিয়া গেল। তাহার পর পাঁঠাটির সর্ব শরীরে হাত বুলাইয়া ভিতর হইতে মন্ত্র আসিতে লাগিল এবং উহাব শবীরের স্থানে স্থানে মন্ত্র পড়িয়া হাত স্পর্শ করিয়া পরে উহার কানে কানে মন্ত্র জপ হইল। খড়গ উৎসর্গ করিবার সময় দেখিলাম মাটিতে আসন অবস্থায় উপুড হইযা পডিযা আছি, খডগটি এ শরীরের গলায় অর্থাৎ ঘাড়ে ধরিয়া বাখিলাম। ঘরে অনেক লোক ছিল। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভীত অবস্থায় এ শবীরের নিকট আসিযাছিলেন। অন্য কেহ কেহ ভয় করিয়াছিল খড়গটি নিজেই গলায়ই বসাই নাকি। সে সময় পাঁঠা যেমন ডাকে, ঠিক সেই রকম তিনটি ডাক এ শরীরের গলা দিয়া বাহির হইল। পরে খড়গ উঠাইয়া, আসন হইতে আসিয়া, ভোলানাথের হাতে বলি দেওয়ার জন্য পাঁঠাটি দিলাম। ভোলানাথ বলি দিতে নিলে পাঁঠাটি একটি ডাকও দিল না বা ছটফট করিল না। কাটার পর রক্তও পড়িল না। অনেক চেষ্টায় উৎসর্গের জন্য

[১৬] ১৭ই অক্টোবর, ১৯২৬।

সামান্য রক্ত টিপিয়া বাহির করা হইয়াছিল। পূজা শেষ হইতে হইতে ভোর হইয়া গেল।

প্রমথবাবুর মৌনব্রত

প্রমথবাবুর স্ত্রী একদিন সন্ধ্যায় বলে - আপনি আদেশ করুন, আমি সোমবার মৌন থাকিব। জানাইলাম - আচ্ছা। পরদিন প্রমথবাবু বলিল - গিন্নি সোমবার মৌন থাকিবার আদেশ নিয়েছে, তিনি যে আগে চলিয়া যাইবেন, তাহা হইবে না। আমি আগে রবিবার করিয়া লই, তাহার পর তিনি সোমবার করিবেন। আমি প্রত্যেক রবিবার মৌন থাকিবার জন্য আপনার অনুমতি চাই। ইঙ্গিতে বলিলাম - বেশ। জিজ্ঞাসা করিল - কি ভাবে মৌন আরম্ভ করিব। তাহাকে একটি ক্রিয়া দেখাইয়া দিলাম। তদনুযায়ী সে রবিবার দিন মৌনব্রত নিল। সোমবার প্রাতে দেখে তাহার আর কথা বাহির হয় না। সে নিজে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বেলা হইয়াছে, অফিসে যাইতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি তাহার ছেলে প্রতুলকে ইঙ্গিতে দেখাইল - আমি কথা বলিতে পারিতেছি না, মাকে খবর দে। প্রতুল তাড়াতাড়ি সাহবাগে আসিল ও তাহার পিতার বিষয় বলিল। ভোলানাথ বলিল - চল তাহার বাসায় যাই। গিয়া দেখি প্রমথবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভোলানাথ বলিল - কি করিয়া কথা বাহির হয় তাহার ব্যবস্থা কর। পরে তাহাকে কথা খুলিবার ক্রিয়াটি দেখাইলাম এবং তাহা সে করিবা মাত্র কথা খুলিয়া গেল। ইহা পূর্বে জানিয়া না নেওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সে তাহার পর হইতে প্রথমতঃ প্রতি রবিবার পরে সপ্তাহে দুই দিন মৌন থাকিত। ইহার মধ্যে লেখাপড়া, ইসারা ইঙ্গিত কিছুই থাকিত না।

অতি ভোজন

এ শরীরের ননদ বেঙ্গী[১৭] সাহবাগে আসিল। তাহার একদিন ইচ্ছা হইল মিষ্টান্ন করিবে। প্রায় আধমন দুধ আনাইল; ২ সের দুধ এক কড়ায় বসাইয়া বাকি দুধের মিষ্টান্ন করিল। বাহিরের মাত্র ২/৪ জনকে খাইতে বলিল। ভাল ভাল তরকারীও রান্না করিল। ভোলানাথ সহ সকলের খাওয়া হইলে কেবল আমি আর সে বাকি। ইহার মধ্যে ভোলানাথকে বেঙ্গী বারবার বলিতে লাগিল - তিনি

[১৭] ভাল নাম - "মোক্ষদা সুন্দবী দেবী"। স্বামীব নাম কালীপ্রসন্ন কুশারী ঃ পুলিশ ইন্সপেক্টর। ১৯২৫ এর বড় দিনেব ছুটিতে মোক্ষদা সুন্দরী দেবী সাহবাগে আসেন।

ত সব মিলাইয়া তিন গ্রাস খান, আজ আমি মিষ্টান্ন করিযাছি তুই তাহাকে বল, সর্বদার মত তিতা মিঠা টক সব একত্র মিলাইযা তিন গ্রাস না খাইয়া, আজ যেন মিষ্টান্ন পরে একটু বেশি খায়।

ঘটনাচক্রে সন্ধ্যাব সময় আমি ও বেঙ্গী এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। বেঙ্গী বলিল - আজ মিষ্টান্ন বেশি খাইতে হইবে। ভোলানাথ বলিতে লাগিল - সে সারাদিন না খাইয়া বসিয়া আছে, তাহাব কথা আজ রাখ। বলিলাম - আচ্ছা। মিষ্টান্ন দিতেছে আর খাইতেছি, খাইতে খাইতে সব মিষ্টান্ন শেষ হইয়াছে, এ শরীর বলিতেছে - আরো দাও, আরো খাইব, বলিয়া ছেলেমানুষের মত শরীরটা করিতেছে। ইতিমধ্যে প্রমথবাবু ও বাউল তাড়াতাড়ি প্রমথবাবুব গাড়ি নিয়া বাজাব হইতে দুধ আনিতে গেল। একদিকে কড়াইতে যে ২ সেব দুধ ছিল তাহাও মিষ্টান্ন করিযা আনিয়া দিল, সব খাওয়া হইল। তবুও এ শরীর বসিয়া আছে।

পরে-বাজার হইতে ৫ সের দুধ আনাইয়া মিষ্টান্ন করা হইল। সেখানে হইতে প্রমথবাবুকে সামান্য দিয়া এ শরীব সব খাইল। 'আবো খাইব' - বলিবার ভাবটি আসিল। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ বলিল প্রায় আধ মন দুধের মিষ্টান্ন খাওয়া হইয়াছে আর খায় না। আর নাই। তবুও আবও খাইব বার বার বলায একটু মিষ্টান্ন হাঁড়ি মুছিযা আনিয়া কি এক মন্ত্রে[১৮] - বেঙ্গী মাথায় দিল। পরে বলিয়াছিল সীতা দেবী নাকি হনুমানের মাথায় এই ভাবে দিয়া তাহার খাওয়া শেষ করিয়াছিলেন। মাথায় দেওয়া মাত্রেই একটা পরিবর্তন আসিয়া ঐখানেই এ শরীর মাটিতে শুইয়া পড়িল। পরে সকলে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে শরীরটা উঠিয়া আসিল। ইহারা জিজ্ঞাসা করে - এত কি করিয়া খাইলেন? এ শরীর কিন্তু তিন গ্রাস খাইয়া যেমন থাকে, তোমাদের দৃষ্টিতে বেশি খাইযাও তেমনই আছে। মাথাব উপর যে কাপড়ে মিষ্টান্ন দিয়াছিল, সে কাপড়ে যেখানে মিষ্টান্ন লাগিয়াছিল, সে স্থান পুড়িয়া যাওয়ার মত দেখাইযাছিল।

পরীক্ষা নেওয়ার বিপদ

সাহবাগে তখন একলা চুপচাপ থাকিতাম ও পড়িযা থাকার ভাব বেশি। ভোলানাথেব খাওয়ারও দেরী হইত। ইহা দেখিযা বাউল তাহার স্ত্রীকে দিয়া পরিষ্কার মত সব মশলার গুঁড়া তৈয়ারী করাইয়া সাহবাগে দিযা আসিত। একদিন সন্ধ্যায় সেই সব গুঁড়া নিয়া বাউল আসিয়াছে। এ শরীর ও ভোলানাথ তথায়

[১৮] ওঁ শিবায় নমঃ।

আছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথ বলিয়া উঠিল - দেখ, তোমার যে অবস্থা দেখি, আচ্ছা তুমি যদি মরিচের গুঁড়া খাও, তবে না মিশাইয়া, চোখে মুখে জল না ফেলিয়া, অসুস্থ না হইয়া থাকিতে পার? এ শরীর বলিল - তোমার মনে যখন কথা আসিয়াছে, তখন তুমি নিজ হাতে মরিচের গুঁড়া খাওয়াইয়া দাও না কেন? ভোলানাথ করিল কি মরিচের গুঁড়া তাহার এক মুঠায় যতটা ধরে, সেইরূপ তিন মুঠা তিনবারে এ শরীরের মুখে পুরিয়া দিল। উহা তিনবারই ছাতুর মত বেশ করিয়া বিনা জলে খাইলাম এবং তাহাদের সম্মুখে প্রায় একঘন্টা বসিয়া রহিলাম। ইহা দেখিয়া দুজনাই অবাক।

মরিচের গুঁড়া খাওয়ার প্রসঙ্গে আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - যেইদিন রাত্রেই মরিচের গুঁড়া খাওয়া হয়, তাহার পরের দিন এ শরীরের পিসীকে ভোলানাথ ঢাকেশ্বরী দর্শন করাইতে নিয়া যায়। দুপুরে ফিরিয়া আসিয়া বলে - কাল রাত্রি হইতে আমার শরীর একটু খারাপ বুঝিতেছিলাম। এখন বোধ হয় জ্বর হইয়াছে। জ্বর ক্রমশ বাড়িয়া উঠিল। দুই তিন দিন পরে রক্ত আমাশয়ও হইল। দিনের পর দিন অসুখ বাড়িতে লাগিল। মিনিটে মিনিটে বমি আরম্ভ হইল। মাথা গরম। ক্রমে ক্রমে অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। প্রমথবাবু একজন ভাল ডাক্তারকে পাঠাইল। ঔষধে কোনও পরিবর্তন নাই। মিনিটে মিনিটে বমির ভাব। বাউল রাত্রে আসিয়া থাকে। এ শরীরেরও খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নাই। তাহার কাছে বসিয়া আছে। একদিন রাত্রে বাউলকে বলিলাম - তুমি কিছু চিড়া আনিয়া দাও। সে চিড়া আনিলে তাহা ভিজাইয়া রাখিলাম। পরদিনও একই অবস্থা। জ্বরও সেই রকমই। দ্বিপ্রহরে জ্বর বাড়িলে মাথায় বরফ দেওয়া হয়। জল ঢালা হইল। ঔষধও খায় না। বিকার অবস্থা। মাথা উঠায়, আর বিছানায় ধপ করিয়া পড়িয়া যায়। একেবারে অস্থির অবস্থা। পরে চক্ষু স্থির করিয়া বিছানায় জ্ঞানশূন্যের মত পড়িয়া গেল।

মটরী ও আশু কাঁদিতে লাগিল। এ সময় তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিয়া, আমার কি এক ভাব হইল, বাম হাতে ভোলানাথের মাথা উঠাইয়া সারা গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। মুখ দিয়া কি কি শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কতক্ষণ পর দেখি ভোলানাথ শ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মেলিল। অতি ধীরে ধীরে বলিয়া উঠল - আমার বড় কষ্ট, বাঁচাও। তাহাকে বলিলাম - এ শরীরকে আর কখনও পরীক্ষা করিতে যাইও না। বলিল - আচ্ছা। আমি এখন ভাল হইতে চাই। দুই তিন দিন পূর্বে ঔষধ খাওয়া বন্ধ হইয়াছিল। আমি তখন গত রাত্রিতে

চারটাব সময়ে যে চিড়া ভিজাইযা রাখিয়াছিলাম, আজ প্রায় রাত চাবটার সময় তাহার সরবৎ খাওয়াইলাম এবং জিহ্বায় ও মুখে একটু একটু পুদিনা বাটা দিতে লাগিলাম। দেখিলাম বমির ভাব ও অস্থিবতা কমিযা গেল। বাত্রি ভোর হইল। ভোলানাথ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইলেন। জ্বর বাড়িয়া পরে একটু একটু কমিতে কমিতে দুই-একদিনের ভিতরই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

দেওঘরে প্রাণগোপাল বাবুর কাছে বাউল ভোলানাথের অসুখের কথা লিখিলে, তিনি ভোলানাথের নিকট এক পত্র দিলেন যে - মা গুরু মারা বিদ্যা কোথায় শিখিলেন, মাকে জানাইতে বলিবেন। এ শরীর জবাব দিল - গুরুর কাছেই গুরু-মারা বিদ্যা শেখা হইয়াছে।

দেখা যাইত, তখন এ শরীরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যদি কেহ কোনরূপ ফন্দী আঁটিত, তবে সে বুঝুক না বুঝুক, উহাব একটি বিপরীত ক্রিযা তাহার উপর দির্যা হইয়া যাইত। যেমন আগুন ঘাঁটিলে তাপ লাগে, ববফেব কাছে গেলে ঠাণ্ডা লাগে। যার যেমন ভাব তাব তেমন লাভ।

বিভূতি

এই ঘটনার পাঁচ ছয় দিন পূর্ব হইতে কি বকম একভাব হইয়াছিল। তিনদিন পর্যন্ত, দিনরাত্রি সমানে এক চোখে একবারে বন্ধ আব এক হাত ঊর্দ্ধে উঠান। আবার তিন দিন পর বন্ধ চোখটা খুলিয়া গেল। খোলা চোখটা বন্ধ হইযা গেল। ঊর্দ্ধবাহু নামিয়া গেল। এইরূপে ছয়দিন ছিল। সাতদিনের দিন আবার দুই চোখের স্বাভাবিক অবস্থা হইল।

এই ভাবে সাধক কিন্তু ঊর্দ্ধবাহু হইযা সর্বদার জন্য স্থিত থাকিতে পারে। ইহাও এক রকমের অবস্থা। ঊর্দ্ধবাহু হওয়ায় দেখা গেল, অনায়াসে ঊর্দ্ধবাহু সর্বদার জন্য রাখা যায় এবং সহজ ভাবে থাকে, কোন অসুবিধা বা কষ্টের চিহ্নমাত্র থাকে না। ঊর্দ্ধবাহু হইতে যে স্থিতি - সেই স্থিতি।

পরে আবার খেয়ালে আসিল - এই জাতীয সিদ্ধাবস্থা হইলেই বা কি হইল? সর্বদার জন্য চক্ষু বুঝিয়া গেল সেই ধ্যানে, তাহাতেই বা কি হইল? সর্বদার জন্য চক্ষু খুলিয়া গেল, বাকসিদ্ধ হইল - তাহাতেই বা কি হইল? একটা অঙ্গ ঊর্দ্ধে তৎলক্ষ্যে না হয় এইরূপ হইল - তাহাতেই বা কি হইল? যোগীদের ত ইহা স্বাভাবিক, আসিবেই। চরম পরম চাই ত।

বিভূতি ধর - যা কিছু খেয়ালমাত্র যে ভাবেই হউক সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হইল। যাহা খেয়াল হওয়া, তাহাই প্রকাশ হওয়া - তাহাতেই বা কি হইল? যেখানে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সেখানে জগতে যাহা হইতেছে সব কিছু যে তাঁহাতে - যাহা প্রকাশ আছে নিত্য - ইহা কি বিভূতি? বিভূতি কাহার মধ্যে প্রকাশ? তাঁহাতে, তাঁহার খেলা যেখানে - এতো স্বভাব, নিত্য, তিনি স্বয়ং। বিভূতি বলিলে - তিনি নিত্য বিভূতি। তিনি বিভূতি সেই নিত্য - আছে রূপে, নাই রূপে সে-ই। এ যে তাঁহারই স্বভাব। স্বভাব মানে নিজে নিজেই। স্বয়ংই ভাবরূপে। যেখানে অভাবের স্থান নাই। এখানে বিভূতির স্থান কোথায়?

সাধকের বিভূতি প্রকাশ বলিতে ত - অভাব যেখানে নাই কিন্তু আছে বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। নাই রূপে যে - তাহা কিন্তু এখানে নয়। যেখানে অভাব যাহার দৃষ্টিতে, তাহারা দেখিতেছে বিভূতি। বিভূতি যদি বল, যাহা প্রকাশ সবই বিভূতি।

সাধকের যখন ক্রমোন্নতিতে বিভূতি লাভ হয়, একটা হয় - যে লাইনের শক্তি যাহার ভিতরে প্রকাশ, সে লাইনে সেই দিক দিয়া এক সিদ্ধ। সেই লাইনে-ই মাত্র তাহার অধিকার, ততটুকুই পাইবে সে। কিন্তু সব সময় তাহা প্রকাশ থাকিবে কিনা - কোন স্তরের তাহারও প্রকাশ থাকে না। ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে বলিয়া, অপ্রাপ্তি থাকে বলিযা, সেই স্থান হইতে পতন হইতে পারে। আবার কিছু প্রকাশ হইয়া আগেও চলিতে পারে। এক দিকের একটু শক্তি প্রকাশ মাত্র - অভাবের মধ্যে। সেই স্থিতিতে ভুলিলে সাধকের পতন আসবেই।

নিজের রাজত্ব বুঝিয়া লইবার দিক কিনা - ঐ যে মহাবাজ বলে, সাক্ষী বলে। মহারাজ মানে যাহার উপর রাজার প্রশ্ন নাই - স্বয়ংই। সে যে পর্যন্ত - না সেই স্থিতিতে, সেই পর্যন্ত নিজের জমিদারীতেই হউক, রাজত্বে হউক, প্রবেশ করিতে গেলে এই যে বিভূতি এইসব ত আসিবেই। যেখানে স্বয়ং যেখানে সে মহারাজ - সে লাইন দিয়া যাইয়াই সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ নিজেকে পাওয়া। পাওয়া কি? যাহা আছে তাহারই প্রকাশ। তাহাতে আর বিভুতি কোথায়? তিনি স্বয়ংই ত।

বিভূতি যদি বল, এক তিনিই। আর সাধকের বিভূতির প্রকাশ। সাধকের দিক দিয়া কিন্তু বিভূতি ঐশ্বর্য বলা চলে। কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি লয় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু মূর্ত—অমূর্ত, সাকার নিরাকার, উপাসক, নানা রকম সাধক, যোগী, মহাযোগী, অবতার, দেবতা, অবতরণ, সেখানে অবতরণের প্রশ্নও নাই -

ঐ-ত, যা তা। সেখানে ব্যাক্তি কোথায়? স্বয়ংইত। সাধকের বিভূতি ব্যক্তিতে, সংখ্যাতে ত। সেখানেও কিন্তু সে-ই - এই রূপে।

দিদিমার সহিত অন্নাহার

সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার ভাত খাইতাম ও বাকি কয়দিন ফলাদি অতি সামান্য খাইতাম।[১৯] পাতে একবার যাহা লইতাম তাহাই খাইতাম। ইহার কিছু দিনেব ভিতর শবীবেব মা আসিলে, একদিন সোম কি বৃহস্পতিবার মা ও আমি দুই থালায় খাইতে বসিব, মা তাহার থালা হইতে এ পাতে ভাত দিতে লাগিল - এ শরীর চুপ করিয়া রহিল। তখন বাক্‌বন্ধ ছিল। আমাকে চুপ দেখিয়া আরও কিছু ভাত দিয়া, নিজে খাইতে আরম্ভ করিল। এ শরীরও খাইতে আরম্ভ করিল। দেখিলাম মা তাড়াতাড়ি খাইয়া হাঁড়িতে যে ভাত ও তরকারী ছিল, তাহার কিছু এ শরীরের পাতে আনিযা দিল। এ শরীর সেই সবই এমন কি পাতে লবণ মরিচাদি পর্যন্ত খাইয়া আবার ভাত দিতে ইঙ্গিত করিলে বাকি যাহা ছিল সব দিল আর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আরো চাহিলে, তখন তাহার ভয় হইল, বলিল - এখন উঠ্। আর খায না। রাত্রে আবাব খাইবি। ভাত ও তরকারী আর নাই। আমিও উঠি না ছেলেমানুষের মত কাঁদ কাঁদ ভাবে কেবলই আবো দিবার জন্য ইঙ্গিত কবিতেছি। মা তাডাতাডি ভোলানাথকে ডাকিযা আনিল। ভোলানাথ বিশেষ বলাতে, তাহাব পবে উঠিলাম। ভোলানাথ সেই সব আদোপান্ত শুনিয়া বলিল - খাইতে বসিবাব সময বাববার দেওয়াতে এইরূপ হইয়াছে।

অমাবস্যার ভোগের সূত্রপাত

প্রমথবাবু চাকরি উপলক্ষ্যে কলিকাতা গিয়া আবার ঢাকা ফিরিয়া আসে। কলিকাতা যাইবার সময় বলিয়া যায় যে, সাহবাগে যেন নিত্য ভোগ পাঠাইবার ত্রুটি না হয়। ভোগের একদিন গোলমাল হওয়ায প্রতুল (প্রমথবাবুর ছেলে) আমাদের কাছে আসিয়া বলিল - আমাব এক প্রার্থনা আপনাদের শুনিতেই হইবে। কাল আমি ভোগেব ব্যবস্থা করিব। মা যে কেবল সোমবাব ও বৃহস্পতিবার খান, তাহা আমি শুনিব না। কাল মাকে খাইতেই হইবে। দেখিলাম সে ভোলানাথকে

[১৯] এই নিয়ম ৬-৭ মাস চালু ছিল।

মানাইয়া লইল। এ শরীর ভোলানাথকে বলিল - তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করা হইবে। পরদিন প্রতুল সব ব্যবস্থা করিল। নিজে বাজারে যাইয়া মনের মতো নানা জিনিষ নিয়া আসিল। তাহাকে ও আরো দুই তিন জন যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকেও খাইতে বলিয়া দেওয়া হইল। সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইতে হইতে বেলা চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে খেয়াল হইল আজ ত অমাবস্যা। আমরা ত প্রত্যেক অমাবস্যায় রমনাব কালীবাড়ি যাই। সেখানে পূজা ভোগাদি শেষ হইলে ভোলানাথ প্রসাদ পাইয়া থাকে। আজ কি হইবে? ইহা ভাবিতে ভাবিতে স্থির হইল যে প্রতুলের এই ভোগের দিনে যখন অমাবস্যা পড়িল, তখন এখানেই অমাবস্যার ভোগ আজ নিবেদিত হইবে। পরে এখানে প্রতি অমাবস্যায় ভোগ দেওয়া যাইবে, তবে নিরামিষ।

অখণ্ডানন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম শশাঙ্কবাবু, ইনি এই ভোগ নিয়মিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সে অমাবস্যার ভোগ আশ্রমে এখনও চলিতেছে।

সেইদিন সব রান্না শেষ হইতে রাত্রি হইল। ভোগাদি নিবেদন হইল। প্রসাদ বিতরণের সময় প্রতুল বলিল - আজ যত রাত্রিই হউক না কেন, মায়ের খাওয়া না হইলে বাসায় যাইব না। ভোলানাথও জোর করিল। এ শরীর খাইতে বসিল। ভোলানাথকে বলা হইল - খাবার থালা হইতে তুলিয়া তুমি আমার হাতে দাও। দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া বসিলাম। ভাত দিতেই দুই হাত ফাঁক হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। হাতে জোর করিয়াও রাখিতে পারি ন। সব জিনিষ এইভাবে দেওয়া শেষ হইলে মাটি হইতে তুলিয়া তুলিয়া খাইলাম। পরে হইল কি - খাওয়ার সময় সব জিনিষ থালা হইতে মাটিতে ঢালিয়া খাইতাম। খাইতে বসিলে অনেক সময় দেখিতাম - সেইখানে চুল বা অন্য রকম ময়লা পড়িয়া আছে। কিন্তু পরিষ্কার করিয়া খাইবার জন্য কোন খেয়াল আসিত না। খেয়াল হইত খাইব বলিয়া যখন বসিয়া গিয়াছি তখন খাবার জিনিষ যেভাবে পাওয়া যায়, সে ভাবেই গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ রকমে মাটিতে খাওয়া প্রায় একমাস চলিতেছে। একদিন ভোলানাথ আসিয়া বলে - তুমি কাঁসার থালা বা পিতলের থালা কিংবা পাথরের বা পাতায়ও খাইবে না তবে কি তুমি রূপার থালায় খাইবে? তাহাব এই কথাগুলিতে একটু রুক্ষতা ও রাগ জড়ানো ছিল। হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিলাম - আচ্ছা বেশ, আমি রূপার-

থালায় খাইব। কিন্তু তুমি নিজে তৈয়ার কবিয়া আনিলে বা অন্য কারো দ্বারা তুমি সংগ্রহ করিলে সে থালায় খাইব না। সাবধান, এ কথা তিনমাসের মধ্যে কাহাকেও বলিও না। ভোলানাথ তাহা স্বীকার করিল। এই তিন মাসের মধ্যে একদিন জ্যোতিষের স্ত্রী ফল, পুষ্পাদি সহ পাথবের বাটিতে এক বাটি রাবড়ী দই ও একখানা রূপার থালায় একথালা সন্দেশ নিয়া আসিল। বলিল - এ রূপার বাসনে আপনি ভোগ দিবেন ও খাইবেন। সেদিন হইতেই রূপার বাসনে কিছু সময় খাইয়া পরে সব বাসনে খাইতে লাগিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

খুকুনীর মাতৃদর্শন

একদিন দেখি, শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী[১] আসিয়াছে। খুকুনী এই প্রথম আসিল। কোন স্ত্রীলোক আসিলে পান ও সিন্দুর দিতাম। খুকুনীকেও পান দিতে গেলে তাহার বাবা বলিল সে পান খায় না - তবুও আমি দিলাম। অন্য কোঠায় খুকুনীকে নিয়ে হাসিতে হাসিতে বলিলাম - এতদিন কোথায় ছিলে? সেও হাসিল। খুকুনীর কি কথা ছিল, সেও বলিল, এ শরীরও কি কি বলিল। ইতিমধ্যে শরীরের ভাব কেমন হইয়া গেল। উহাকে বলিলাম - তুমি বস, আমি আসি। সে ভাবিল আমি অন্য কোথাও যাইব। কিন্তু শরীরটা বলিতে বলিতে এমন একটা ভাব এলাইয়া সেখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল। শোয়ার কিছু পরেই উঠিয়া আবার তাহার সঙ্গে কথা কহিলাম। পরে তাহারা চলিয়া গেল।

খুকুনীরও পূর্বের বিশেষ আধ্যাত্মিক সূত্রেই এই শরীরের কাছে আসা।[২] আমি যখন চৈত্রমাসে বাজিতপুর হইতে আসি, তখন ভোলানাথের ভাইয়ের বাসায় উঠিয়াছিলাম। সে সময় একবার টিকাটুলিতে যাই, রাস্তায় শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সম্মুখে যে জলের কলটি আছে, তাহাতে পা ধুই। তখন সে বাড়ি দেখিয়াই খেয়াল হইয়াছিল যে এ বাড়িতে একদিন আসা হইবে।

সূর্যগ্রহণে প্রকাশ্য কীর্তন

পৌষ সংক্রান্তি আসিল।[৩] সেইদিন আবার সূর্যগ্রহণও ছিল। যাহারা সাহবাগে

[১] খুকুনী ঃ ভাল নাম "আদরিণী দেবী" - ডাঃ শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়েব তৃতীয় কন্যা। শ্রীশ্রী মা উহাব নাম দিযাছিলেন "গুরুপ্রিযা"। তিনি আশ্রমবাসী ও ভক্তদেব মধ্যে "দিদি" নামে পরিচিত ছিলেন।

[২] শ্রীশ্রী মা আভাস দিয়াছিলেন যে গুরুপ্রিযা দিদি তাঁহার পূর্ব জন্মের বড বোন ছিলেন। যে অল্প বয়সে মারা যায়, দ্রষ্টব্য ঃ ১লা অধ্যায়।

[৩] ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৬, বৃহস্পতিবার।

আসা যাওয়া করিত, তাহারা সেইদিন এখানে কীর্তন করিবে বলিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাগানে বেশি লোকজন আসা বাগানের মালিক তত পছন্দ করিত না। সর্বদা যেন বেশি লোক না আসে এইরূপ নিষেধও ছিল। যাহা হউক, যোগেশবাবু সাহবাগে আসিলে ভোলানাথের কথায় সংক্রান্তির কীর্তনের কথা তাহাকে বলা হইল। সেও স্বীকৃত হইল। সকলে ঐ দিন কীর্তন ও পরে খিচুড়ি মিষ্টান্ন ভোগাদির ব্যবস্থা করিল।

প্রাতে নয়টা দশটার সময় কীর্তন আরম্ভ হইল। উপস্থিত বসিয়া মেয়েদিগকে সিঁদুর দিতেছিলাম। দেখি এ শরীরটা ক্রমে অবশ হইতেছে। সিঁদুরের কৌটা হাত হইতে পডিয়া গেল। শরীর মাটিতে ঢলিযা পডিল। কিছুক্ষণ মাটিতে গডাইয়া শরীরটা উঠিল এবং পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলিব উপর খাডা হইয়া, দুই হাত উপর দিকে তুলিযা ও মাথাটি একেবারে পিছনে পিঠের সহিত লাগাইয়া পলকবিহীন, স্থির উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। এই রকম অবস্থা নিযা চলিতে লাগিল। কোথায় বা যাওয়া হইতেছে, মাথায় গায় কাপড়াদি আছে কিনা কোন খেয়ালই নাই। সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু বাহিরে প্রকাশ হইতেছে না। এক বিরাট ভাবে পরিপূর্ণ। যেমন কুণ্ডে প্রজ্বলিত আগুন ঢাকা থাকিলে তাহার ঢাকনা খুলিয়া দিলে উর্দ্ধদিকে তাহার শিখা উছলিয়া উঠে, তেমনই এ শরীরটা এক মহান শক্তির উন্মাদনায় যেন নৃত্য করিতে লাগিল। এই নৃত্য জাগতিক ভঙ্গীর না। কেমনই যেন একটা রকম ব্যক্ত করা যায় না।

চলিতে চলিতে এ শরীর কীর্তনের ঘবে যাইযা পডিয়া গেল। মাটিতে পডিয়াই তুফান যেমন কাপড উড়াইয়া নেয় সেইরূপ ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাহারো বাধা মানে না। কেহ ধবিয়াও রাখিতে পাবে না। প্রবল ঝড়ে কেহ ডালপালা ধরিতে গেলে যেমন সেও নিজে গডাইতে থাকে, সঙ্গীদেবও তেমন অবস্থাই হইযাছিল বহুদূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ গতিতে গড়াইযা পরে শরীবটা এলান ভাবেই উঠিয়া বসিল। সেই ভাবাবস্থাতেই মুখ হইতে ধীরে ধীরে বাহিব হইল - 'হরে মুরারে-মধুকৈটভারে'। এই পদটি হইতে হইতে নেশায় ঢুলুঢুলু ভাবে শরীর বসিয়া রহিল।[৪] তখন প্রমথবাবুরও ইহা দেখিযা একটা ভাবের অবস্থা হইল। এই ভাবের অবস্থাতেই হস্ত সঞ্চালনে এই শবীরকে আবতি করিতে লাগিল। আর

[৪] ভক্তি ধর্ম গ্রন্থে আট প্রকাব "মহাভাব" এব উল্লেখ আছে। তাহাব সব কটি মা'ব শরীবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

দুই চোখে দরদর অশ্রুধারা। সে সময় তাহার উপর এ শরীরের আশীর্বাদের ভাব আপনা হইতেই হস্তদ্বারা প্রকাশ হয়। খানিক পরে গ্রহণও ছাড়িল, কীর্তনও থামিল।

শরীরটা অনেকক্ষণ একভাবে থাকিল, পরে ভোলানাথ উঠাইযা নিয়া গেল। শরীর টলিতে টলিতে রান্নাঘরে ভোগের ব্যবস্থাদি দেখিতে গেল এবং ঢুলুঢুলু অবস্থাতেই মেয়েদের সাহায্য করিতে লাগিল। তখন আবার কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যা যখন হইয়া আসিল, ভোলানাথ বলিল - লুট দিতে হইবে। তুমি শীঘ্র আস। কীর্তনে যাইতেই দেখি শরীর আবার অবশ হইয়া যাইতেছে এবং মধ্যাহ্নে যেইরূপ অবস্থাদি হইয়াছিল, খানিকটা সেই জাতীয ভাবে ও আরো অন্য রকমে সকলের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। পরে এক পায়ের উপর তাণ্ডবনৃত্যের মত কতক্ষণ হইয়া শরীরটা মাটিতে পড়িয়া আবার উঠিয়া বসিল।

পৌষ সংক্রান্তির কীর্তনের পর হইতে প্রায় সন্ধ্যার সময় ও প্রতি অমাবস্যায় কীর্তন হইত। তাহাতে এ শরীবের এক একদিন এক এক রকম ভাব হইত। অমাবস্যার কীর্তন ভোগাদি হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইত।

দৃষ্টিতে যুবকের পরিবর্তন

সেই সময় দেখা গেল একটি বয়স্ক ছেলে এ শরীরের দিকে ও মেয়েদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাসিতেছে। এ শরীরের চোখের দৃষ্টি এক পলকে তাহার উপর অনেকক্ষণ রহিল। দেখা গেল, সে হাসি বন্ধ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল। লুট ও ভোগের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইলে সকলে খাইতে গেল। কিন্তু ঐ ছেলেটি আর খায় না। তাহাকে খাইতে বলিলে সে বলে যে, মা আমার উপর রাগ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া এ শরীর বলিল - মা কাহারো উপর রাগ করে না। তুমি খাইতে যাও। সে খাইতে বসিল। আমি ও খুকুনী প্রায় দেড়শ লোকের পরিবেশন করিলাম।

পরদিন সেই ছেলেটি আসিয়া তাহার জীবনের যত দোষ ও অন্যায় আছে খুলিয়া বলিতে লাগিল। সে এম. এ. পাশ করিয়াছে। পূর্বে এক সময় যাত্রার দলে ছিল। তখন হইতে সে স্ত্রীলোকদিগকে, এমনকি তাহার আত্মীয়াদের পর্যন্ত সখী ভাবে দেখে। তাহাদিগকে নমস্কার করে না। কাহারো উপর মাতৃভাব একেবারেই আসে না। আরো বলিল - এক আপনার পায়ে মাথা নোয়াইলাম।

আমার এই ভাব কি করিযা দূর হয় কৃপা করিয়া বলুন। এই দোষের জন্য আমার ভাইয়েরা শাসন কবে কিন্তু আমি শেষে ভুলিয়া যাই। এ শবীর বলিল - কাল কীর্তনে এত স্ত্রীলোকের ভিতর তোমাকে এইরূপ ভাবে হাসিতে দেখিয়া এ শরীরের দৃষ্টি তোমার উপর প্রখর দেখাইয়াছিল। যে পর্যন্ত তোমার মাতৃভাব না জাগে, সে পর্যন্ত তুমি কোনও মেয়ে মানুষের মুখের দিকে দেখিও না। পায়ের দিকে চাহিয়া কথা বলিও। আজ হইতে এই সংকল্প কর আর রোজ আসিয়া এইখানে নিবেদিত প্রসাদ নিও। সে স্বীকার করিল। ইহার পর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়াছে। এমন সময় কয়েকটি মেয়ে আসিল। এ শরীর তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছে, দেখি কি, ছেলেটি মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে আসা যাওয়া করিত। একবার আসিয়া বাড়ি যাইবে বলিয়া চলিয়া গেল তাহার পর আর এ শরীরের সহিত দেখা হয় নাই। পরে শোনা গিয়াছিল তাহার ভাবের ভাল দিকে পরিবর্তন হইয়াছে।

ভোলানাথের কথায় নানা স্থানে যাওয়া ও রোগারোগ্য করা

ভোলানাথের কথায় নানা জায়গায় যাইতে হইত ও নানা ব্যারাম সম্বন্ধে কথা বলিতে হইত। তাহার অন্তঃকরণটি কোমল দেখিয়া তাহাকেও সকলে পাইয়া বসিত এবং কিছুতেই ছাড়িত না। এ কাবণে কখনও কখনও শবীর না কবিলেও ভোলানাথ এ শরীরের উপব পীড়াপীড়ি, কখনও বা রাগ কবিত।

ননীবাবুর বাসায় এ শরীর যাইত। তাহাদেব বাসায লাগা নিশিবাবুর[৫] বাসা ছিল। নিশিবাবুর মেয়ে লিলি পিত্রালয়ে আসে। তাহার স্বামী বিলাত গিযাছে। প্রথম একটি ছেলে, মাত্র তিন মাস বযস। লিলির খুব অসুখ। এ শরীরকে তাহাদের বাসায় লইযা গেল। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, বলিলাম - অসুখ, ডাক্তারবাবুকে দেখাও, এ শরীর কি বলিবে? তখন ভোলানাথ বলে - তুমি যাহা হয় একটা বল। হাসিতে হাসিতে বলিলাম - তুই ফল খা, আমি যাইয়া ভাত খাইব। তোর খাওয়াটা আমি খাইব। এ বলিয়া সাহবাগে চলিয়া আসিলাম। লিলি ক্রমে ক্রমে ভাল হইয়া গেল।

কিছুদিন পর তাহার তিনমাসের ছেলেটির কর্ণমূল হইল। ডাক্তাব বলিযাছে পাকিয়াছে, অস্ত্র করিতে হইবে। শিশুটি খুবই দুর্বল। এ কাবণে সকলের ভয

[৫] নিশিকান্ত মিত্র।

হইয়াছে, অস্ত্র করিতে পাছে না শরীর যায়। নিশিবাবু আসিয়া খুব কাতরে বলিতে লাগিল - তুমি যাহা বল তাহাই করিব। এ শরীর বলিল ডাক্তার যাহা বলে তাহাই কর। ভোলানাথ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন কি এক খেয়াল আসিল তাহাকে বলিলাম - আচ্ছা! লিলিকে যাইয়া বল, আজ সন্ধ্যাব সময় অন্ধকারে না দেখিয়া মাটিতে হাত দিয়া হাতে যাহা উঠে তাহা বাটিযা ঐ কর্ণমূলে লাগাইয়া দিতে। সে তাহাই করিল। উহা লাগাইবার পর ঐ রোগা শিশুটি হাসিতে ও খেলিতে লাগিল। সকলে অবাক।

উহার ভিতর একদিন শশাঙ্কবাবুর বাসায় গেলাম। সেই দিনই তাহার বাসায় প্রথম যাওয়া। যাইযা কিছুক্ষণ বসিযাছি। দেখি নিশিবাবু আসিয়া কাঁদ কাঁদ অবস্থায় বলিতেছে ঐ শিশুর কানের ভিতর দিয়া পচা গন্ধ বাহির হইতেছে। ডাক্তার বলিয়াছে অস্ত্র না করাতে মাথার ভিতর পর্যন্ত দুষিত হইয়াছে। এখন কি উপায় করি? আরো বলিল, শিশুর পিতামহ অবস্থাপন্ন লোক। যদি বিনা চিকিৎসায় কিছু বিপদ ঘটে তবে কথা শুনিতে হইবে। এই সব বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল পড়িলে তখন আবার বলিল - একবার যাইয়া শিশুটিকে দেখিতে হইবে। এখনই আবার চলিয়া আসিও। চল চল। যাইয়া দেখি শিশুটি হাসিতেছে, যেন কোন কষ্ট নাই। কর্ণমূলটি খুব বড়, দেখিতে সকলেব ভয় হয়। আমরা সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন নিশিবাবু আবার আসিয়া তাহাদের বাসায় নিয়া গেল। বলিল কর্ণমূলটি গলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আসিতে দিবে না। পূর্বদিন সাহবাগে নাচঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি গ্রামাফোনের পিন চোখে পড়ে। তাহা নিযা এ শরীর বাম হাতের উপর কতকটা ক্ষতের মত করিয়াছিল। তখন কাহাকেও বলা হয় নাই। আজ যখন নিশিবাবু আপনা হইতে নিতে আসিল তখন খেয়াল আসিল উহা গলিয়া যাইবে। পরে আমরা সেখানে থাকিতে থাকিতে ফোঁড়াটি গলিয়া গেল ও ক্রমে ক্রমে শিশুটি ভাল হইয়া উঠিল।

শশাঙ্ক বাবুর মাতৃপূজা

শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা হইবার কিছুদিন পরে একদিন অমাবস্যায় তাহাদের বাসায় নিয়া এ শরীরকে পূজা করিতে লাগিল। তখন যদি কেহ এ শরীরকে পূজা করিত অথবা পায়ের উপর ফুল দিত, তবে শরীর কেমন এলাইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়িত। নমস্কার করিলেও এ শরীরের মাথা মাটিতে নুইয়া পড়িত।

শশাঙ্কবাবুর পূজায় সময়ও শরীরের অবস্থা তাহাই হইল। কাপডাদিব সহিত একটি সোনার মুণ্ডমালা গলায় পরাইয়া দিল। পবে প্রকৃতিস্থ হইলে ভোলানাথ বলিল - মুণ্ডমালাটি উনি এত আগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এখন খুলিও না। তাহা গলায় অনেকদিন ছিল।

পূজার পর শরীরটা উঠিলে শশাঙ্কবাবুকে বলা আসিল - আজ হইতে তোমাব নিজস্ব বাহ্য পূজা বন্ধ হইয়া গেল। তাহারও আর এইরূপ পূজা করিবার ইচ্ছা জাগিত না।

এইরূপ অবস্থায় কয়েকদিন গেলে শেষে দেখা গেল, ফুল, চন্দন, বেলপাতা যে যাহা শরীরের উপর দিক না কেন, কোন পরিবর্তন দেখা যাইত না। খেয়ালে আসিত এ শরীর আর মাটিতে, ফুল চন্দন. মযলাতে কোন তফাৎ নাই। যেমন কাহাকেও ডাকিয়া আনা হইত না, আবাব আসিলেও তাডাইয়া দেওযা হইত না। কথাবার্তাও আপনা হইতে মুখে যখন যাহা বাহির হয, বলা হইত। এ শরীর বলে কি - তোদের ভাবে তোমার মুখ হইতে যাহা বাহিব কব, বা যাহা তোমরা দেখিতে, শুনিতে চাও, তাহাই অনেক সময় এ শরীরে আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যায়।

দেখ, সাধকের কোন সময় একটা ভাব হয় যে - কেহ তাহাকে প্রণাম পূজাদি বা গাত্রে ফুল চন্দনাদি দিলে, ঐশ্বরিক ভাবেব স্থিতিতে তাহার বাহিরের শরীরটা পর্যন্ত স্থির করিয়া দেয়। তাহার শরীরটা বাহিরে জড়বৎ দেখায়। সাধনেব উৎকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে 'সবই সমান' এই ভাব আসিযা পডে। তিনি যেমন অনন্ত, সাধকের অবস্থাদিও তেমন অনন্ত। এই যে অনন্ত বলা হইল, এই যে বকমটা সাধক যখন এক একটা দিক নিয়া সাধনা কবিতে করিতে চলে, তাহাদেব এই রকমটা হওয়া স্বাভাবিক। এ শরীব উপস্থিত তখন এক একটা দিক নিযা খেলিতেছে ত। তাই এই রকমেরও একটা দিক ঐ সময়ে প্রকাশ সাময়িক। এই রকমে আরো কত নানা রকমটাই ত খেলিয়াছে। এই শরীরে তখন সাধকেব খেযালটা চলিতেছে ত। নিজের খেয়ালে, এক একটা সাধনার দিক খেলা আপনা হইতেই কিন্তু। আর কত শুনিবে?

স্ব-হস্তে অন্নগ্রহণে অক্ষমতা

কযেকদিন যাবৎ রোজ ভাত খাইতেছি। একদিন রাজেন্দ্র কুশারীর[৬] বাসায এ শরীরকে খাইতে বলিল। তখন কথা বন্ধ ছিল। খাইতে বসিয়াছি দেখি কি ভাত মাখিয়া মুখে দেওয়ার জন্য হাত উঠাই আর হাত হইতে সব পড়িয়া যায়। অথচ হাতও অবশ নয়। কিন্তু মুখের কাছে গ্রাস নিতে গেলেই হাত খুলিয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও খাওয়া হইল না। সে বাসার লোকেরা খুব দুঃখিত হইয়া বলিল যে বোধ হয় আমাদের কোন ত্রুটি হইয়াছে। তাহাদের বলা হইল - এ শরীরে এইরূপ সময় সময় নানা রকম পরিবর্তন হয়। অথচ এই জাতীয় পরিবর্তনে অভাব বোধের স্থান ছিল না, সোজা যন্ত্রের মত হইয়া যাইতেছে - একই ভাব। সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

সাহবাগে একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া দেখি নিজহাতে মুখে কিছু দিতে গেলেই হাত খুলিয়া সব পড়িয়া যায়। সেই জন্য মাটি হইতে থালাটি বাম হাতে লইয়া মুখের সামনে ধরিয়া ডান হাতে উহা হইতে তিন চার দিন কিছু কিছু খাইলাম। পরে দেখি ঐ ভাবেও মুখে হাত যায় না। তখন করিলাম কি থালাতে ডাল তরকারী একসঙ্গে মিশাইযা সেই সব বাম হাতে একেবারে যতটা ধরে ততটা মুখের কাছে নিয়া ডান হাতে গ্রাস করিয়া খাইতে লাগিলাম। দুই এক দিন পরে দেখি সেইরূপেও আর খাওয়া হয় না। মুখে ভাত দিতে দিতে হাত খুলিয়া যায়। ভোলানাথ লক্ষ্য করিতেছে যে আমার খাওয়া হয় না। একদিন ভোলানাথ খাইতে বসিয়া ডাকিল। আমি তাহার নিকট দুই হাতে অঞ্জলি করিযা বসিয়া বলিলাম - আমার হাতে যা হয় একেবারে দাও। ভোলানাথ যাহা দিল আমি দুই হাত হইতে মুখ দিয়া লইয়া খাইলাম।

একদিন দেখি মুখের কাছে হাত দুইখানি কিছুতেই যায় না। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিতে গেলে পাতাগুলি যেই রূপ আপনা হইতে কুঞ্চিত হইয়া আসে, সেইরূপ মুখের কাছে হাত লইতেই সমস্ত শরীব যেন অবশ কেমন ভাব হইয়া যায়। সে সময সব এলাইয়া পড়ে। হাত মুখে উঠাইযা ভাত কেমন কবিযা খায় তাহাও যেন বে-খেয়াল হইয়া গিযাছে।

এ যেন ছেলেমানুষ - এ সব লইয়া খেলিতেছিল। ক্ষুধা, খাওয়া এ যেন নিশ্চিহ্ন-শান্তভাব। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিলে, এই শরীর ছেলেমানুষের মত

[৬] ভোলানাথের গ্রামের বাল্য বন্ধু।

কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল - এ শরীর ত ইচ্ছা করিযা কিছু করে না, হাত উঠে না, খাইতেও পারে না। ভোলানাথ বলিল - আচ্ছা। আমি খাওয়াইয়া দিই। সেইদিন হইতে হাতে খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় প্রথম প্রথম দেখা যাইত যে খাওয়াইত সে বসিত। তাহা না হইলে ঐ সময আব খাইব না, বলিয়া আপনা হইতে উঠিয়া পড়িত। পরে খেয়াল হইল যে একগাছি দুর্বা দুই আঙ্গুলে যে ভাবে উঠায় সেইভাবে সকল খাবাব দ্রব্যাদি এক সঙ্গে মিলাইযা একবার মাত্র মুখে দেওয়া হইবে। যাহারা খাওয়াইত তাহারা দুইবেলা এই নিয়মেই চলিত। একদিন পর একদিন জলও ঐ সঙ্গে একবার খাওয়াইত। প্রায সাড়ে পাঁচমাস এইরূপ কাটাইবার পর বাসন্তী পূজার সপ্তমীর দিনে জ্যোতিষের বাসা হইতে দুধ আসিল। এ শরীর কেবল তাহাই খাইল। এইরূপে তিনদিন সামান্য দুধই এ সময় খাওয়া হইল। দশমীর দিন রাত্রিতে অন্ন খাওয়া হইল।

সমস্তের মূলে সূক্ষ্ম সূত্র আছে ত। সেই সূত্র হইতে আবার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম যে সূত্র আছে তাহার দ্বারাই সমস্ত কর্ম নানারকমে নানাভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন কর্ম জগতে, তেমন পরমার্থ জগতে নানা লাইনে ধবিযা চলে। পবে পূর্বের মত কয়েকদিন খাওয়া হইল।

প্রায় চার পাঁচ বছব গত হইলে একদিন রমনা আশ্রমে সকলে নিজ হাতে খাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। এ শরীবেরও খেয়ালে আসিয়া গেল যে হাতে খাইব। খাবার নিয়া বসিলাম। দেখিলাম কেমন একটা ভাব, সারা আশ্রম ঘুরিয়া হাতে এক একবার সামান্য একটু মুখে দিই, আবাব সামনে যাহাকে পাই তাহাকে দিই। কুকুর, বিড়াল, পাখী, ইত্যাদি তাহাদেবও দিই। এইরূপে বসিয়া চলিয়া অনেক সময নিযা মধ্যাহ্নের খাওয়া শেষ কবিলাম। বাত্রে দেখিলাম সন্দেশ ও অন্যান্য খাবার দিয়াছে। আমি সব মাটিতে বেশ করিয়া লেপিয়া দিতেছি। খেয়াল হইতেছিল, মাটিতে মিলাইয়া দেওয়া আর এ শরীরকে খাওয়ানো একই কথা। এ সব ব্যাপার দেখিয়া সকলে বলিল - মা'র শরীর রাখিতে হইলে অন্যের খাওয়াইয়া দেওযা দরকার। না দিলে শরীর টিকিবে না। আবার অনেকে আবদার ধরিল - আমরা খাওয়াইয়া দিব। তাহার পর হইতে যে নিকটে থাকে বা যাহার আকাঙ্খা হয় সেই খাওয়ায়। কিন্তু আমি দেখি সবই আমাব হাত। আমার হাতেই আমি খাই। যে হাতের খাওয়া ছাড়িয়া গেল, সেই হাতের খাওয়া আর তোমরা যাকে অপর বল, সেই হাতের খাওয়া - একাকার হইল আর কি।

এ শরীরের কোন ভাবে বন্ধন প্রকাশ ছিল না। সে সময ভোলানাথের

আদেশ রক্ষার জন্য রান্না সব কিছু মিলাইয়া একটু মাত্র একবার মুখে দিতাম।

জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন - খাওয়া ঠিকমত হইতেছে না বলিয়া শরীরের কোন পরিবর্তন নাই। খাইয়াও যেমন, না খাইয়াও তেমন।

একটি বালিকার রোগ আরোগ্য

সাহবাগে দ্বিপ্রহরে একদিন কি কাজ করিতেছি, এমন সময় কুমিল্লার রায়পুর নিবাসী একটি লোক তাহার স্ত্রী ও ছেলেপিলে নিয়া গাড়ি করিয়া আসিয়া ভোলানাথকে বলিল - মায়ের কাছে আসিয়াছি, আমার মেয়ে চার বছর যাবৎ শয্যাশায়ী অবস্থা। প্রথম তাহার জ্বর হয, পরে শরীর অবশ হইয়া পক্ষাঘাতে দাঁড়াইয়াছে। বিছানায় পড়িয়া থাকে। বাহ্য প্রস্রাব আমাদের করাইতে হয়। বয়স ১২ বছর। তাহার বিবাহ দিয়াছি। এখানকার বড় ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র তিন মাস চিকিৎসা করিয়াছেন কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তিনিও এখানে নিয়া আসিতে বলিয়াছেন। তাই নিরূপায় হইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ভোলানাথ আসিয়া আমাকে এইসব জানাইল। হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল - সামনের বৃহস্পতিবার আসিতে বল।

তাহারা তদনুযায়ী আবার বৃহস্পতিবারে আসিল। মেয়েটিকে তাহার বাবা ও মা দুইজনে ধরিয়া ঘরের মেঝেতে শোয়াইয়া দিল। দেখা গেল বসিবারও সাধ্য নাই। সে মেয়ে এত দুর্বল যে কথাও বলিতে পারে না। এ শরীর দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। পরে সেখানে বসিয়া তাহাকে বলিলাম - মাটির উপর একটু গড়াগড়ি দাও ত। সে যতটুকু আপন শক্তিতে পারিল, ততটুকুই গড়াগড়ির মত একটু দিল। পরে বলিলাম - আর দরকার নাই।

তখন ভোগের জন্য সুপারী কাটিতেছিলাম, তাহার কয়েকখণ্ড মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম - এই সুপারীগুলি হাত বাড়াইয়া নাও। সে বহুকষ্টে সেইগুলি লইল। তাহারা বিদায় হইল। পরে শুনিলাম বাসায় যাইলে মেয়েটি নাকি খাওয়া দাওয়া করিয়া বিছানায় শুইয়া অন্যের সঙ্গে কড়ি খেলা করিতেছিল। তখন রাস্তায় গাড়ি ও বাজনার শব্দ শুনিয়া হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া গেল এবং দৌড়াইয়া গাড়ি দেখিয়া আসিল। তাহার পর হইতে সে ধীরে ধীরে চলাফেরা করিতে লাগিল। পরদিন তাহার পিতা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ঐ ঘটনা জানাইল। শুনিয়াছি, সে মেয়েটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল।

আশ্রমে পূর্ণিমার ভোগ

একদিন নিশিবাবুর বাড়িতে ভোগ হইলে সাহবাগে ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। সেইদিন পূর্ণিমা রাত্রি। এদিকে মটরীর এক খেয়াল হইয়াছে যে তাহার ছেলের প্রথম চাকরীর বেতন হইতে সে পূর্ণিমার ভোগ দিবে। আমরা আসিয়া দেখি মটরী সকল রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে ও কয়েকজন মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। যথা সময়ে ভোগ নিবেদন হইল ও সকলে আনন্দের সহিত প্রসাদ নিল। সেই পূর্ণিমার ভোগ আশ্রমে এখনও চলিতেছে। দেখা যাইত, সব বিষয়েই যখন যাহা হইবার আপনা হইতে হইয়া যাইত।

কাঙ্গালী ভোজন

একবার ঢাকার প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলে শশাঙ্কবাবু কাঙ্গালী ভোজন করাইলেন।[৭] সে উপলক্ষে কীর্তন হইয়াছিল। কাঙ্গালী ভোজনেব পূর্ব দিন রাত্রিতে আমরা সে স্কুলে গিয়াছিলাম। খিচুড়ি তরকারী মিষ্টি ইত্যাদি তৈয়ারের বন্দোবস্ত হইতেছে। পরদিন কাঙ্গালীরা খাইবে।

সকালবেলা কতক্ষণ কীর্তন হইল। এ শবীরের পূর্বেব মত ভাবাবস্থা। মধ্যাহ্নে ভোজন আরম্ভ হইল। খেয়াল হইল এ শরীবও পরিবেশন করিবে। খুকুনীকে সঙ্গে নিয়া গেলাম। ছেলেরা জিনিষপত্র আনিয়া দেয়, আমরা দুজনে পাতে পাতে দিতেছি। দেখিলাম একজনের গায়ে ও হাতে কুষ্ঠ রোগ। সে হাতেও খাইতে পারে না। নিকটে যাইয়া বলিলাম - আমি খাওয়াইয়া দিই। সে না না করিতে লাগিল ও একটি চামচ দিয়া নিজে খাইতে আরম্ভ করিল। একদলেব যখন খাওয়া হইল, তখন ভোলানাথ বলিল - তোমরা চলিযা আস, এখন ছেলেরা পরিবেশন করিবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, খুব জোরে বৃষ্টি আসিতেছে। এ শরীরের খেয়াল হইল ঘরের বাহিরে থাকিবে। তখন বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছে। এ শরীরকে সকলে ভিতরে যাইতে ডাকে, কিন্তু এখানে ভিতরে যাইবাব ভাবই নাই। পরে দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের খাওয়া হইলে, এ শরীরও ঘরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামিল।

[৭] ৩রা মার্চ ১৯২৬।

সন্ধ্যা হইলে শশাঙ্কবাবু খাইতে ডাকিল। বলিলাম, সকলকে ডাক। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল - আমরা খাইব না। সকলের জন্য ত নয়, কেবল কাঙ্গালীদের জন্য আয়োজন হইয়াছে। তখন কয়েকটি ছেলে বলিযা উঠিল - আমরা মায়ের হাতে খাইব। এইসব গোলমাল শুনিয়া বলিলাম - কাঙ্গাল কে? আমরা সবাই ত কাঙ্গাল। কাঙ্গালী কাহাকে বলে? সকলেই ত খাইয়া জীবন ধারণ করে ও শরীর বস্ত্রে ঢাকে। আসল ধনে যে কাঙ্গাল, সেই-ই-ত কাঙ্গালী। এই বলিতে বলিতে, কাঙ্গালীরা বাহিরে যে জায়গায় খাইয়া গিয়াছে ও এখানে কেহ কেহ খাইতেছে সেইস্থানে সকলকে নিয়া বসিলাম। অন্ধকার হইয়াছিল, বলিলাম - কাঙ্গালীর আর বেশি আলোর দরকার কি? সামান্য যা আছে ইহাতেই চলিবে। খাওয়া শেষ হইলে সাহবাগে ফিরিলাম।

চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম

ঐ স্কুলে কীর্তনে এ শরীরের অবস্থাদি লক্ষ্য করিয়া অনাথের কেমন একটি ভাব হইল। সে দুই দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া আছে। সন্ধ্যার সময় সাহবাগে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে - আমি মায়ের চরণে স্পর্শ কবিয়া প্রণাম না করা পর্যন্ত কিছুই খাইব না। ভোলানাথ আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলে বলিলাম - আচ্ছা। সেইদিন অনাথের উপলক্ষ্যে সকলে প্রণাম করিল, তাহার পর দিনও অনাথ প্রণাম করিল। সেই হইতে কথা হইল মাসে ঐ তারিখে ঐ সময়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে যে পাবিবে প্রণাম কবিবে। ইহা শুনিয়া যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলে আসিল ও ঘড়ি ধরিয়া প্রণাম করিল। এ শরীব দাঁড়াইয়াছিল, পাঁচ মিনিট হইয়া যাইতেছে আপনা হইতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

বাসন্তী পূজা ঃ লাবণ্যের ভাবাবেশ

বাজিতপুর থাকিতে ভোলানাথ একদিন বলিয়াছিল - আমার একটি আকাঙ্খা আছে যে বাসন্তী পূজা করিব। বাড়িতে দুই-দুইবার শাবদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া মৃতাশৌচ পড়াতে সেই সব জিনিষপত্র দিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়। তাহার পর হইতে আব দুর্গাপূজার কোন কথা হয় নাই। তাই একবার বাসন্তী পূজা করিতে বড় ইচ্ছা হয়। বল দেখি - এ কামনা পূর্ণ হইবে কি? তাহাকে বলিয়াছিলাম - হইবে।

সাহবাগে আসার পর ভোলানাথ সে কথা স্মরণ করাইযা দিল। সিদ্ধেশ্বরী আসনে সেই সময শশাঙ্কবাবু একটি খড়ের ঘর করাইযা দেন, সেখানে পূজা হইবে বলিয়া স্থির হইল।[৮] দুর্গামূর্তি এই শরীরের মাপে হইল এবং ঐ আসনেব স্থানে যে উইয়েব ঢিবি ছিল, তাহার মাটি ও অন্য মাটি মিলাইয়া মূর্তি তৈযারী হইল।[৯] পূজা উপলক্ষ্যে ভোলানাথের অনেক আত্মীয়, কুটুম্ব আসিয়া উপস্থিত। সাহবাগে যাহারা আসা যাওয়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া নানা জিনিষ পত্রেব আয়োজন করে। শশাঙ্কবাবু ও পূর্ণ সবকাব ভগবতীর জন্য সোনার কুলী ও সোনা বাঁধান শাঁখা তৈয়ারী কবিল। ভোলানাথেব বোন বেঙ্গী (মোক্ষদা) অনেকদিন হয় ঢাকা আসিয়াছিল। কাজেই কেহ নিতে না গেলে তাহাব এ পূজায় আসা হইবে না, এ আশঙ্কায় ভোলানাথ বলিল - চল, আমবা যাইযা তাহাকে লইযা আসি। তাহার কথায় চট্টগ্রামে যাওয়া হইল। পরে সকলে মিলিয়া ঢাকায় আসিলাম।

একদিন সন্ধ্যায় শশাঙ্কবাবুর বাড়ি গিয়াছি। দেখি তাহার ছোট ছেলে নন্দু আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, পবে ববাবর সে এই শরীরেব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিত।

খুকুনীর সহিত দেখা হইবার কিছুদিন পর তাহাকে বলিযাছিলাম - তুমি যখন স্বামীব সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না স্থির করিয়াছ তখন অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই চিঠিপত্র লিখা বন্ধ করিয়া দাও। সে তাহাই করিযাছিল। নন্দু একদিন বলিল - আমি ভাবিতাম দিদি এমন কাব দেখা পাইল যাহার কথায় সে ভাই বোনদেব খবর নেওযা বন্ধ কবিয়া দিল।[১০] পরে যখন তোমাব আদেশ জানিলাম, তখন মনে দুঃখ হইত। তোমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইত না।

বাসন্তী পূজার আর বেশিদিন বাকী নাই। দেখি জ্যোতিষের স্ত্রী একদিন একখানি মটকার লাল চওড়া পাড়ের সাড়ী আনিয়া এ শরীরকে আবদার করিয়া বলিল - আপনি ইহা ব্যবহার করিবেন। এ শরীর বাসন্তী পূজাব সময় সেইখানা পরিয়াছিল।

---

[৮] প্রথম আশ্রম - ৭ দিনেব মধ্যে জমি কিনিযা, ভীত স্থাপন কবিযা, খড়েব ছাউনি ও বাঁশেব বেতেব দেওযাল দেওযা হয। ১৯২৬ সালেব ফাল্গুন মাসে ইহা তৈবী হইযাছিল।

[৯] ভোলানাথজীব পূর্ব জন্মের সাধনার দ্বাবা এই মাটি পবিত্র হইযাছিল। বিস্তাবিত বিববণ - দ্রষ্টব্য ঃ ষষ্ঠ অধ্যায "সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে ৭ দিন"।

[১০] খুকুনী (গুরুপ্রিয়া দিদিব) ভাগ্যে ব্রহ্মচাবিণীর জীবন নির্দিষ্ট থাকায সাংসাবিক আসক্তি হইতে দূরে থাকিবার জন্য মা'র আদেশে পৈতা গ্রহণ কবিযাছিলেন ও পবে সন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইযাছিলেন।

ইহার ভিতর যে বাড়িতে এখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সেখানে একটি বড় এগ্‌জিবিশন্ হইয়াছিল। জ্যোতিষের স্ত্রী এ শরীরকে সেখানে নিয়া গিয়াছিল। এ শরীর কোথাও এইরূপ যায় নাই, এ প্রথম। সে আমাকে অনেক জিনিষ দেখাইতে লাগিল ও বলিল - কোনটা পছন্দ হয় বলুন, কিনিযা দিব। এ শরীরের কিন্তু সবই সমান, নতুন যে কিছু দেখা হইতেছে তেমন খেয়ালে আসিল না।

আমরা বাসন্তী পূজার অধিবাসের দিন সাহবাগ হইতে সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। সেখানে একটি খালি বাড়িতে সকলের জায়গা করা হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী আসনে, সেই খড়ের ঘরে মূর্তি ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্যদের বন্দোবস্তও ঠিক মতই হইয়া গিয়াছে।

সপ্তমীর দিন প্রাতে এ শরীর পুকুরে স্নান করিয়া পূজা স্থানে যাইবার সময় ভোগের জন্য কত সের চাল, ডাল ইত্যাদি রান্না হইবে বলিয়া, পূজার ঘরে গেল।

পূর্বের আসন স্থানটি হইতে ঘরের ভিটা একহাত উঁচু ছিল। উহা এক হাত চার আঙ্গুল করিয়া চতুষ্কোণ। সেই জন্য আসনটি ঐ মাপের একটি কুণ্ডের মত দেখাইত। এ শরীর পূজার সময় সারাদিন সেই কুণ্ডের ভিতর বসিয়া শুইয়া কাটাইত। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় পুরোহিতকে বলা হইল - প্রতিমার বীজাদি তোমাব উচ্চারণ করিতে হইবে না। এ শরীর এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মূর্তিগুলির দিকে চাহিয়াছিল। ভিতরে বীজাদি উচ্চারিত হইতেছিল। কেহ কেহ পরে বলিযাছিল, সে সময় হইতে মূর্তিগুলির চোখ মুখ সহ সর্বাঙ্গ সজীব দেখাইতেছিল।

পূজার পর ভোগাদি নিবেদিত হইল। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। বৈকাল বেলা বেশ একটু ঝড়ের মত হইয়া গেল। বাত্রি কাটিয়া গেল।

তাহার পর দিন সকালে ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া পূজার ঘরে আসা হইল। অষ্টমীর পূজা শেষ হইল।[১১] সকলের প্রসাদ নেওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কে আসিয়া বলিল - একদল লোক এই মাত্র আসিয়াছে। যতটা প্রসাদ আছে তাহাতে কিছুতেই কুলাইবে না। যাহারা পূজা দেখিতে আসিবে, তাহারা সকলেই প্রসাদ পাইবে, কেহ যেন ফিরিয়া না যায, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। নূতন

[১১] ২২শে মার্চ, ১৯২৬।

দলে প্রায় ৪০/৫০ জন। ইহারা সকলেই স্থানীয় প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলেব ছাত্র। তাহাদিগকে একদিন আসিয়া পূজা দেখিবাব জন্য বলা হইয়াছিল। এ শরীর বলিল - ইহাদিগকে বসাইয়া পাত্রে যাহা আছে, দিতে আবম্ভ কব। সকলে ভবিল, যদি না কুলায় লজ্জার কথা হইবে। এ কারণে আবার দুই হাঁড়ি খিচুডী চডাইল। রান্না হইলে পর তাহাদের খাওয়াইতে বসাইল। পরে দেখা গেল, পূর্বের পাত্র হইতে সকলকে পরিবেশন করা হইলেও তাহা খালি হইল না। নূতন দুই হাঁড়ি পড়িয়াই রহিল। পূর্বেই বলা হইয়াছিল, ভোগেব রান্না একবারে যাহা হয় করা আর যেন বসান না হয়। কিন্তু তাহারা সে কথা খেয়াল না করিযা কম হইবে আশঙ্কায় আবার রান্না চাপাইয়াছিল।

বৈকালে খুব ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি বাতাস, এইরূপ জোরে হইতে লাগিল যে সকলে ভয় পাইল। চারিদিকে হৈ চৈ। আসনের খড়ের ঘরখানি খুব হালকা ছিল। চারিদিকে পাতলা বেডা। সামান্য কয়টি খুঁটিব উপর চালটি খাড়া ছিল। উহা বাতাসের ধাক্কায় নড়িতে থাকিল। এই শরীর আসনের কুণ্ডে বসিয়া আছে। ভয়ানক তুফান। ১২ বছরের একটি মেয়ে ভয়ে ফিট হইয়া গেল। সকলেই ঘরের খুঁটিগুলি ধরিয়া 'মা মা' বলিয়া প্রাণভরে ডাকিতে লাগিল। এ শরীর দেখিল - বাহিরে জড় প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য আর ঘরে জীবের একনিষ্ঠ ভাব-ধ্বনি। ইহাতে কি এক অপূর্ব ভাবে এ শবীব তালে তালে নাচিতেছিল ও অস্বাভাবিক হাসি বাহির হইতেছিল। শেষে দেখা গেল, প্রতিমাব গায়ে বাতাস লাগিয়া বেশ একটু নড়িতেছে এই অবস্থায় ভোলানাথ আমাকে এইভাবে হাসিতে দেখিয়া যেন বিব্রত হইল। এ শরীরের দিকে লক্ষ্য কবিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে থাকিল - এ কি হইল! শীঘ্র বক্ষা কর।

ইতিমধ্যে জলে কাদায় মাখামাখি হইয়া একটি নীচ জাতীয় লোক আসিয়া দরজায় প্রবেশ করিল এবং এই শরীরের দিকে দীনভাবে অসহায় অবস্থায় তাকাইয়া তাকাইয়া (যাহাতে কেহ তাড়াইয়া না দেয়) সকলের সঙ্গে নাম করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তুফানের বেগ কমিয়া আসিল। প্রতিমার বা পূজার দ্রব্যাদির কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিল না। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি জলে জলময়। ছাপড়াগুলি কোথায উড়িয়া গিয়াছে। নিকটস্থ গাছের ডালপালা অনেক ভাঙিয়াছে। মথুরবাবু রাতাবাতিই সব গুছাইযা ঠিক করিয়া নিল।

এই দিকে একদল কীর্তনীয়া কোথা হইতে আসিয়া কীর্তন কবিতে লাগিল। এই শরীরের কি একরকম অবস্থা হইল। সে সময় আশু, আশুর ছোটবোন,

তাহার স্বামী ও আশুর মা, সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল। ইহার মধ্যে আশুর বোনটি (১৬/১৭ বছর বয়স) নাম লাবণ্য সে এ শরীরের ভাবাবস্থা কখনো দেখে নাই। আমাকে একটু অপ্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষে ও বিস্ময়ে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। ইহাতে তাহার শরীরের এমন পরিবর্তন হইল যে সে "হরিবোল, হরিবোল" করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এই শরীরের ঢুলু ঢুলু ভাব নিযাও কীর্তনীয়াদের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে গিয়াছে, অন্যান্য অনেক লোকও গিয়াছে। তথায় কীর্তন বন্ধ হইলে সকলে এ শরীরকে লইয়া ঘরে আসিতেছে, এমন সময় দেখি লাবণ্যের মা ও আরো ২/১ জন আসনের সম্মুখস্থ উঠানে লাবণ্যের গাযের কাদা সরাইয়া দিতেছে ও সে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, ভাবে বিভোর। প্রসন্ন বদন, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, আধো আধো স্বরে কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিল আমি কালীবাড়ি হইতে আসিযা প্রতিমা মণ্ডপে যাইতেছি, শুনিলাম নিকটে কোথায় যেন খুব সুন্দর সুরে হরিবোল ধ্বনি বাহিব হইতেছে। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া দেখি উঠানে কাদার ভিতর কে গড়াগড়ি দিতেছে আর ঐ শব্দ করিতেছে। অন্ধকার ছিল, নিকটে যাইয়া দেখি, লাবণ্য।

ইহার পূর্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। সে সময় মেয়েটি সেইখানেই পড়িয়াছিল। তাহাকে ঘরে আনিয়া কাপড়াদি বদলাইয়া পরিষ্কার করা হইল কিন্তু উহার হরিবোল ও লুটালুটির ভাব যায় না।

আশুর মা আমাকে আসিয়া বলে - উহাকে শীঘ্র ভাল করিয়া দে - এ কি হইল? দেখিলাম তাহার স্বামীও যেন একটু বিচলিত। এ শরীর বলিল - ইহা খুব ভাল অবস্থা। তাহারা বলে - এই অবস্থা থাকিলে সংসার কি করিযা চলিবে? নানা কথাব পর তাহার স্বামীকে বলিলাম, তুমি তাহাকে অন্য ঘরে নিয়া যাও। ভোলানাথকে বলিয়া দিলাম উহার স্বামী যেন তাহার কানে কানে এইরূপ বলে। সে তাহাই করিল। রাত্রিতে লাবণ্য নেশাখোরের মত অসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ৩/৪ দিনে তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা স্থির হইয়া আসিল বটে কিন্তু হরিবোল হরিবোল করিয়া মাঝে মাঝে গড়াইত।

তাহার মা তাহাকে একদিন বলে - এ জন্যই বুঝি খুড়ীমার নিকট যাইব বলা হয। লাবণ্যকে তাহার মা ও তাহাব স্বামী এইসব ভাব দুর করিবার জন্য নানা ভাবে বুঝাইল। কিন্তু তাহার আনন্দ বিগলিত সুরে হরিনাম মুখে লাগাই

ছিল। প্রাতে আমার সঙ্গে স্নান করিতে ঘাটে আসিয়াছে, সেখানে গিয়াও ঢল ঢল হাসি আর মুখে হরিবোল হরিবোল। এ শরীর বলিল তোর এইসব তোর মা ও অন্য আত্মীয়রা পছন্দ করে না। সে পাগলের মত কেবল হাসে আর বলে - খুড়ীমা 'হরিবোল হরিবোল'। হরিবোল যে কি আনন্দ তাহারা বুঝে না। তাহার মা বিশেষ ভাবে বলিতে লাগিল যে লাবণ্যকে ভাল কবিযা দাও। ক্রমশঃ তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল ও সে দেশে চলিযা গেল।

এই মেয়েটি তাহার জন্ম হইতে এ শরীবের হাতে প্রতিপালিত। শিশু সময় এ শরীরকে না হইলে, তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার নাম 'লাবণ্য' এ শরীরই বাখিযাছিল। বিবাহের পব সে এ শরীবকে দেখিলে গোপনে গোপনে বলিত - খুড়ীমা! আমার সংসার ভাল লাগে না। আপনি আমাকে আপনাব সঙ্গে রাখেন। তাহার কেমন একটা ভাবও হইত। অতিকষ্টে গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহিরেও প্রকাশ হইয়া যাইত, যেন অসাড় অবস্থায় পড়িয়া আছে।

দশমীর দিন পূজা শেষ হইল।[১২] বিসর্জনের সময় জিজ্ঞাসা করে যে ভগবতীর হাতের রুলী ও শাঁখা কি করিব? এ শবীর বলিল - সঙ্গে দাও। ভোলানাথ ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিলেন - ইহা নিয়ম নয। এ শবীব পুরোহিতকে দিবার কথা বলিল। যাহারা গয়নাগুলি দিয়াছিল, তাহারা বলিল - মা'ব হাতে দিবার জন্য আমরা তৈয়ার করিয়াছি। এইরূপ নানা তর্কযুক্তি করিয়া সেইগুলি এ শরীরের জন্য ঘরে রাখিয়া দিল।

প্রতিমা বিসর্জনের পর সকলে বলিল - আমবা আজ মায়ের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিব। এ শরীর কাহাকেও চরণ ধবিযা প্রণাম করিতে দিত না। সেদিন সকলেব সঙ্গে বৃদ্ধ সীতানাথ কুশারী মহাশয়ও জোব করিয়া প্রণাম করিলেন।

প্রণামে শরীরে প্রতিক্রিয়া

প্রথম সাহবাগে আসার পর কয়েকমাস পর্যন্ত কেহ মাটিতে পড়িযা প্রণাম করিলে এ শরীবের মাথাও মাটিতে নুইযা পডিত। পাযে হাত দিলে, তাহার পায়ে হাত যাইত। যে পাযে হাত দিযা নমস্কাব কবিত, সে দৌড়াইযাও রক্ষা পাইত না। তখন এ শরীরে কেমন এক শক্তি প্রকাশেব খেলা হইত যে এই

[১২] ২৪শে মার্চ, ১৯২৬।

শরীর সেই লোকের পায়ে হাত দিবেই দিবে। বাহিরে না দেখা অবস্থায়ও যদি কেহ এ শরীরকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নমস্কার করিত বা যদি কেহ এ শরীরকে কোন প্রকারে একটু দেখিয়া গোপনে মাটিতে পড়িয়া ইহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত, তবে এই শরীরের মাথাও মাটিতে নুইয়া যাইত।

মরণীর ফাঁড়া

বাসন্তী পূজার সময় ভোলানাথের বড় বোন[১৩] ও তাহার বাড়ির সকলে আসে। তাহারা পরেও কিছুদিন সাহবাগে ছিল। তাহার একটি ছেলে। তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্বা। এক দিন বৌটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে - যেই একটি সন্তান বড় হয়, তখন আর একটি সন্তান হইলে, পূর্বেরটি মারা যায়, এই হইতে দুইটি এরূপ মারা গিয়াছে। মরণী এখন এক বছর দশ মাসের হইয়াছে, আর একটি হইবে। এ অবস্থায় মরণীকে আপনাকে দিলাম, মরে বাঁচে যাহা হয় করিবেন। সেই হইতে মরণী সাহবাগে থাকে। বৌদির আরো একটি মেয়ে মারা যাইয়া পরে একটি ছেলে হইলে তাহার ঠাকুরমা বলিল উহাকে আশ্রমে নিয়া নামকরণ করিব ও প্রসাদ মুখে দেওয়াইব। তাহাই করিয়াছিল। সে ছেলেটি এখনো বাঁচিয়া আছে।

চিত্র ঃ সাহবাগে শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীর সঙ্গে বালিকা মরণী ঃ ১৯২৬ মার্চ মাস, বাসন্তী পূজার পরে।

জ্যোতিষ ও নিরঞ্জনের প্রার্থনা

বাসন্তী পূজার পর একদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না রাত্রে জ্যোতিষ ও নিরঞ্জন[১৪] আমার নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। আমি যতদিন ঢাকা ছিলাম, ততদিন প্রথম কয়েকদিন ছাড়া, জ্যোতিষকে আমার নিকট সাহবাগে কি আশ্রমে বসিতে দেখি নাই। নিরঞ্জন একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল - মা। আমরা শীঘ্র মরিয়া যেন আপনার আশ্রমে ব্রহ্মচারী হইতে পারি - আমাদেব এই প্রার্থনা, আশীর্বাদ করুন। আমি জ্যোতিষের দিকে চাহিয়া বলিলাম - কেন এ শরীবে কি হইতে পারিবে না? ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারী অর্থ সঠিক কি? ভাব ও কর্মই ত আসল। তখন কেহ কিছু বলিল না। পরে জ্যোতিষ যে এতবড় অসুখ হইতে বাঁচিয়া উঠিল - ইহাই তাহার পূনর্জন্ম জানিবে।

[১৩] সীতানাথ কুশারীর স্ত্রী।

[১৪] নিরঞ্জন রায় ঃ ঢাকার এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ইনকাম ট্যাক্স)।

শ্রীশ্রীমায়ের হস্তলিপির জন্য প্রার্থনা

শ্রীশ্রীমায়ের একটুখানি হস্তলিপির জন্য অনেক প্রার্থনা কবা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলেন - "আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পাবি না, যদি সময় হয় পাইবি।"

সৌভাগ্য বশত - ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় যে লিপি কবেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(শ্রীশ্রীমায়ের হস্তাক্ষর)

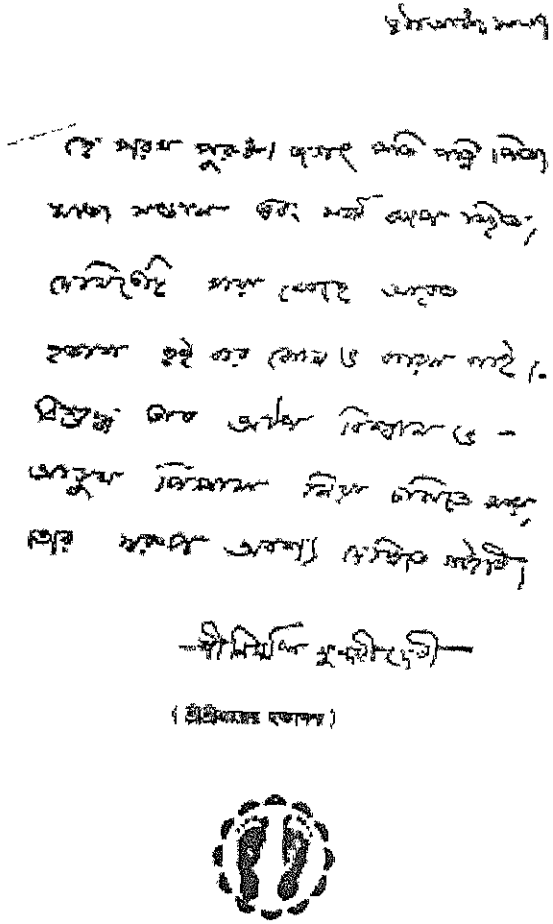

নবম অধ্যায়

সাধকের পথে বাধাবিঘ্ন

প্রথম প্রথম এক সময় সাধকের এক ভাব হয়। ছোট বড়, যে কেহ প্রণাম করিতে আসিলে, মনে হয় কেন আমাকে প্রণাম করিবে। আমি অতি দীন, কিছুই না। সেইজন্য সে প্রণাম করিতে দিতে পারে না। সরিয়া যায়। আরও একটা ভাব হয় - শক্তিক্ষয় হইবে। যখন ক্রমশঃ কিছু শক্তি লাভ হয়, কাহারো আর একটা ভাব জাগিবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। তখন ভিতরে ভিতরে সর্বসাধারণের মঙ্গল করিবার ভাব জাগে। কেহ নমস্কার করিলে আশীর্বাদ করে বা কেহ কিছু ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করে। যেমন নির্ধনীরা ধন লাভ করিয়া অনেক সময় লোককে খাওয়াইয়া পরাইয়া দান করিযা আনন্দ লাভের বাসনা জাগে। সে অবস্থায় লোকের সহিত তাহার সভ্য ব্যবহাব, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং সে আনন্দ পায়, সত্য বস্তু কিনা। সে সকলকে দিতে ও জানাইতে চায়। তাহার ভিতর কিছু সঞ্চিত আছে বলিয়া শ্রোতারা তাহার কথায় প্রাণে আনন্দ পায়। এইরূপ ব্যক্তির লক্ষণাদি কতকটা মধুর দেখায়। সম ব্যবহার ও সরল খোলা ভাব, তাহাতে দেখা যায়। হিংসা, মিথ্যা বা নিন্দা, তাহার নিকট বিশেষভাবে আশ্রয় পায় না। সে লোভ মোহাদি হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে।

সত্যনিষ্ঠা নিয়া আরো উন্নতি করিলে কোন কোন সময় তাহার সামান্য সামান্য বিভূতিও দেখা যায়। ঐ সব প্রথমতঃ শরীর ও বিষয় জনিত ব্যবস্থাদি নিয়া বাহিরে প্রকাশ হয়।

তখনো ভিতরে লুক্কাযিত প্রশংসা, প্রতিষ্ঠার ভাব থাকে বলিযা সেই বসবোধ কাহারো কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া আনন্দ পাওয়াব বা কাহারো নিকট হইতে ধর্মার্থ কোন বিষয় গ্রহণ করিযা তৃপ্তি লাভ করে। প্রতিষ্ঠার জন্যও এইসব ভাবের মুলোচ্ছেদ হয় না। এই অবস্থায় বিশেষ মাতিয়া গেলে শক্তি ক্ষয় অনিবার্য। ইহার কারণ এই যে, সত্য বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যে শক্তি লাভ করিয়াছে,

সে যদি এইসব বাহিরের খেলায় অধিকতর মাত্রায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে তাহা হইলে কোন সময় যে, তাহাকে সত্য পথ হইতে বিপথগামী করিয়া সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া ফেলে। সে প্রথমতঃ টের নাও পাইতে পাবে। পরে যখন বুঝিতে পারে, তখন মহা দুঃখের কারণ হয়। ঐ সময় যথাশক্তি হুঁসিয়ার থাকা ও ঐ গন্তব্যে লক্ষ্য রাখা।

সাধক সামান্য সামান্য বিভুতিতে আকৃষ্ট না হইযা যদি সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দেয়, লক্ষপতির এক লক্ষ্যে চলে, তাহা হইলে যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহার ভিতর নানা প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতির খেলা খুলিতে থাকে। আধ্যাত্মিক খেলা এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয় তাহার ভাল লাগে না, বাজে কথা কানে শুনিলে, বাজে বিষয় চোখে দেখিলে, তাহার গায়ে কাঁটা বা আগুন লাগার মত জ্বালা যন্ত্রণা হয়। সকল সময় ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা বলিতেও তাহার ভাল লাগে না। সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক ভাবে সংলগ্ন থাকার দরুণ তাহার হাবভাবগুলি বড় সুন্দর দেখায়।

তাহাতে যৌগিক নানা প্রকার অলৌকিক বিভূতিকে, যাহাব যাহাব সাধনার গতি অনুযায়ী তাহার সেইরূপ প্রকাশ দেখা যায়। ঐ সব বিভূতিকে যাহারা সরাইয়া চলিতে না পারে তাহারা আবার সে খেলার ভিতরই আটকাইযা যায়। আর যাহারা সেইগুলিও অতিক্রম করিয়া চলিযা যায়, তাহারা একযোগে উচ্চতম স্তরে আরোহণ করে।

ক্রমে ক্রমে সে আরো যখন অগ্রসর হয়, তখন তাহাব বলা কওয়ার ভাবগুলি কমিয়া আসে। সে দেখে এই উচ্চভাবের কথা বিনাকর্মে ও গুরু-কৃপা ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিবে না, তবুও প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে সে সবল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করে। আর প্রণাম বা স্পর্শ তাহাকে কেহ করিতে গেলে সে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে এবং তাহার পক্ষে অসহনীয় হয। কারণ চুলার উপর তপ্ত পাত্রে জল কিংবা জলসংযুক্ত কিছু দিলে যেমন ছ্যাঁক করিয়া উঠে, ঠিক সেই অবস্থা তাহার হয়। নমস্কাবকাবীর বাসনা কামনা রূপ যে ভাব তাহা তাহাকে আঘাত কবে।

সাধকের যখন সব এক, একেবই বিভিন্ন মূর্ত্তি এইরূপ ভাব জাগ্রত হয, তখন আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক বা অসুখেব কথা, তাহাব নিকট একই রূপেব প্রতিভাত হয়। কর্মও যে তাঁহারই একরূপ ইহা তাহাব বোধ হয। এ অবস্থায় সে যদি

হুঁশিয়ার থাকিয়া পরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিতে পারে, তাহার পতন হইবার আশংকা। নানা রকমারি নিয়া শরীরটা খেলিয়াছে ত।

পরে যদি সাধক দৈহিক খেলার পরপারে যায, তখন আব তাহাকে এইসব বিষয় চঞ্চল করিতে পারে না। স্বভাবে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোন ভাব হইতে অব্যাহতি নাই। মোটামুটি কয়েকটি অবস্থা বলা হইল। অবশ্য জগৎগুরু যিনি, তাঁহার যে করুণা ধারা সে ভিন্ন কথা।

এইসব কথা শুনিয়া প্রশ্ন উঠিল সাধকের কথা ত শুনিলাম। আপনার প্রণামে এইরূপ কেন?

মা বলিলেন - আরে! এই শরীরের কথা বাদ দে। এই শরীর ত তোমাদের এক একটা নিয়া আপনা খেয়ালে সাময়িক খেলিয়া যাইতেছে। দেখিতেছ না। সবটাই ত এইরূপে।

এ মহাযাত্রার বিশেষ বিঘ্নেরও আশঙ্কা থাকে কিন্তু। প্রথমতঃ যথা শক্তি সাবধান হইয়া চলা সেই জন্যই বলা হয় সুকৌশলেই এই রাস্তায় প্রবেশ।

কোন সময়ে কাহারো ইহাও হইতে পারে কিন্তু - দীক্ষাদি নিয়া বাহিরের পূজা ইত্যাদি সব শিখিয়া - যেমন কীর্তন, গ্রন্থাদি হইতে ভগবৎ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া লোককে শুনান, পূজা, জপ, ধ্যানাদি করান, প্রণাম করিতে দেওয়া, স্পর্শেও কোনভাবে আশীর্বাদের প্রকাশ করা, ফুল চন্দন মাল্যাদিতে ভূষিত হওয়া ইত্যাদি, সাধুদের অনুকরণ, কাহারও এইভাব আসিতে পারে।

সাধারণতঃ যাহারা প্রকৃত সাধু চিনে না, একটু ধর্ম পিপাসু তাহাদের কিন্তু ভালই লাগে। একটু আনন্দই পায়। তবে ইহাও ত তোমাদের মুখে শুনা যায় - যাহারা আশ্রিত হইবে, সে নিজে যতটা, ততটাই ত সে দিবে। তাহার বেশি ত আর নয়। যদি ভগবানের কৃপা ও শুভ যোগাযোগ হয, তবেই না ভক্তশিষ্য গুরুকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

যাহার এইভাবে অনুকরণ - এই সব কর্মাদির পূর্ণফল কোথায়? ফল পাইবে না, তাহা নয় কিন্তু এখানে যতটুকু পাইবার কেবল ততটুকুই। কেননা ইহার পিছনে প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, বাসনার মূল রাখিয়া ইহা করা কিনা।

যেমন কোন সাধক ও গৃহস্থ প্রারম্ভে সমস্ত বিষয়বাসনার তাড়না হইতে নিজে উদ্ধার পাইবার জন্য ভগবানের নামে, পাঠে, কীর্তনে, ধ্যান, জপ-ইত্যাদিতে

মূল লক্ষ্য - নিজেকে বাঁচান, নিজেকে পাওয়া। অমৃতত্বই তাব লক্ষ্য। পরম চরমই তার লক্ষ্য। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, প্রশংসার বাসনা বলে বিষয় জড়িত থাকে কিনা, তাহাব ফলটিও আবাব পূর্ণাঙ্গীন পাইবে। কেননা, সে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মোহ ইত্যাদিব হাত এড়ায নাই বলিয়া - চাপা বাখিযা অনুকবণ - এগুলি তাড়নার ফল দিবে।

কীর্তনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

এ শরীর যখন শশাঙ্কবাবুর দেশের বাড়িতে গিয়াছিল, তখন এ শবীরকে খুকুনীর মামার বাড়ি নিয়া যায়। সেখানে ভোগাদি হইল - খুব সুন্দর কীর্তনও হইয়াছিল। ইহার ভিতর দেখা গেল, ঐ কীর্তনের কেমন এক মহান ভাবে শরীরটা এলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে হাত মাথা নীচুব দিকে ধীরে ধীরে শরীর কেমন এক অবলম্বন বিহীন হইয়াও যেন কোন অবলম্বন লইয়া ধীরে ধীরে সর্পেব গতির মত বারান্দার উঁচু ভিটা হইতে উঠানে চলিয়া গেল। শরীরটা একেবারে ধপ করিয়া পড়িয়া যাওয়া, তাহা নয়। এত উঁচু ভিটা হইতে বিনা সিঁড়িতে এইরূপ ভাবে যাওয়ায় সকলেই আশ্চর্য বোধ করিল। সেই ভাবভঙ্গী ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না। তীব্র গতিতে কি রকম একটা ভাবে। সমগ্র শরীব লাল আভা, তেজঃপূর্ণ। ভাবে ঢল ঢল। চক্ষেব ভঙ্গীও কি বকম, ভাবটি যে কি সুন্দর।

ক্রমশঃ শরীর দাঁড়াইযা দুই বাহু উর্দ্ধে - কি এক ভঙ্গি। সেই সময় দেখা গেল, সমস্ত শরীরেব লোম কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। লোমের গোড়া ফোড়ার মত ফুলা। এইরূপ ত কতই হইত, কোন দিন তাহাতে রক্তের মত।

সাহবাগেও কখনও কখনও ঐ রকম ঐ ভাব লইয়া এই শরীর একভাবে দিনেব পর দিন পড়িয়া থাকিত। কখনও উঠিবাব সময় গালে, মুখে লালা - কোথা হইতে এত বাহির হইত! খুকুনী মুছাইত, মুছাইযাও যেন কুল পাইত না। কখনও চোখের জলের ধারাও এইরূপ, মুছিলেও মুছা যাইত না। অবিরাম দীর্ঘ সময় চলিয়া যাইত।

এই শরীরে শোযার ভাবটি পূর্বের হিসাবে চলিতে লাগিল। সময নাই, অসময নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, যখন তখন যেখানে সেখানে পড়িযা থাকিত।

রমনা আশ্রমেও যখন দুই তিন দিন ও কত কত সময় পরে উঠিতে মুখের লালা ইত্যাদি দেখা যাইত। খুকুনী ঘন্টার পব ঘন্টা ধাক্কা দিতে দিতে এক

একবার চক্ষু খুলিত আবার যেন এইদিকের খেয়ালে কোথায় ডুবিয়া যাইত। কখনও হাসি, কখনও কি রকমভাবে চক্ষু খুলিত। কথাও ঐ সময় আধো আধো, কি রকম ভাষা, বলা যায় না। নানা সময়ে নানা রকম ভাব দেখা দিত। কোন সময় ত একেবারে কাঠের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা, অনেক ঘসাঘসিতেও গরম হইত না। কত আঘাত দিয়াও দেখা গিয়াছে - কোথায় সাড়া? শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিই বা কোথায়? তখন সকলে ভয়ে কান্নাকাটি, নানা রকম কত কিছু - আর বুঝি একে এ দেহে পাইলাম না। এই রকম কতদিন কত রকম কতভাব গিয়াছে - উপায় আর কতটুকু।

কখনো শোয়া অবস্থায়, কখনও বসিয়া কথা বলিতে বলিতে, কোনদিন স্থিরভাবে বসা অবস্থায় বা দৌড়াইয়া চলিতে চলিতে খুব হাসি আসিয়া শরীর অবশ হইয়া যাইত ও মাটিতে ঢলিয়া পড়িত। হাসি এইরূপ আসিত যে সকলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও থামাইতে পারিত না। পরে তাহারও সঙ্গে সঙ্গে হাসিত। কখনো তাহাদের ভয় হইত যে পাছে না শরীর ছাড়িয়া যায় - এইরূপ অস্বাভাবিক অদ্ভুত হাসি প্রকাশ পাইত। পরে সকলে চিন্তিত হইয়া এ শরীরের হাসি কি করিয়া কমে, সেই চেষ্টা করিতে। কতক্ষণ এইভাবে চলিয়া আবার আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত। কোন কোন সময়, যে কোনভাবে থাকি না কেন হঠাৎ উন্মাদের মত, যেমন হাসি, তেমন কান্না দুই'ই রৌদ্র, বৃষ্টির মত প্রকাশ পাইত।

মুখ ধোয়া, স্নান, কাপড় ছাড়া বা শরীরের অন্যান্য নিত্য স্বাভাবিক কর্মাদি সময়ের কিছুই ঠিক ছিল না। এ অবস্থায় কখন কখন এইরূপ হইয়া যাইত যে, কোথায় শরীরটা যায় কোন ঠিক নাই। সামনে আগুন, জল, কাঁটা, গর্ত যাহা থাকুক না কোন, কোন খেয়ালই নাই। হয়ত কোনদিন দৌড়াইয়া হঠাৎ কোথায় যাইয়া পড়িয়া থাকা হইত। কোনদিন বেশি সময় পড়িয়া থাকিত। কোনদিন অল্প সময়েই উঠা হইত। ভোলানাথ দেখিলে ধরিয়া আনিত। খুকুনীও কোন সময় দৌড়াইয়া ধরিত। যখন ঐ রকম ভাব হইত, তখন শরীর থাকে কি যায়, কিসের উপর দিয়া কোথায় বা কেন যাইতেছে, কিছুই খেয়াল থাকিত না। গায়ে কাপড়াদিও ঠিক থাকিত না। কীর্তনে কাপড় ঠিক থাকিত না বলিয়া ভোলানাথ সর্বদা সেমিজ ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পূর্বে কেবল একখানি কাপড় মাত্র পরা থাকিত।

শরীরের এ অবস্থা দেখিয়া সকল সময় কেহ না কেহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সাহবাগে একদিন বসিয়া আছি হঠাৎ কি খেয়াল হইল ছুটিয়া যাইয়া বাগানে একটি গভীর জলের চৌবাচ্চা ছিল, ধপ্ করিয়া তাহার ভিতব পড়িলাম। স্থানটি

অপরিষ্কার। তখন সন্ধ্যা। অন্ধকার হইয়াছে। ভোলানাথ পিছনে পিছনে আসিল। একলা কি করিবে ভাবিতেছে। এমন সময় আপনা আপনি কেমন করিয়া উহার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলাম। ভোলানাথ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল - কি করিয়া উঠিলে? বলিলাম - কেন আমি ত সহজ ভাবেই উঠিয়াছি।

কিছুদিন এইরূপে চলিল। সেই সময় খাওয়ারও কোন নিযম ছিল না। যখন উঠিতাম সামান্য ফলাদি বা ক্বচিৎ অল্প দুধ খাইতাম। কোনদিন কীর্তনের পর অনেক সময় অবধি পড়িয়া থাকা হইত। আবার অল্প সময়েও উঠা হইত।

একদিন সাহবাগে কীর্তনের পর দেখিলাম যে কীর্তনের মাঝখানে পূর্বের মত শরীরটা হইল। পরে উঠিলাম এবং আসন করিযা অনর্গল সংস্কৃত স্তব, স্তুতি ও মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। স্তব ও মন্ত্রাদি বলিতে বলিতে কান্নাব ভাব আসিল। পরে আবার মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক মাটিতে যেইরূপ নমস্কার করে, সেইভাবে শবীরটা মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। ইহার পর হইতে কীর্তনে কোনদিন অল্প বা কোনদিন বেশি সময নিয়া মন্ত্র স্তবাদি বাহির হইত।[১]

একদিন কীর্তনে মাটিতে পড়িয়া আছি। কোথা হইতে আমি নিজেই দেখিতেছি - এ শরীরটা পড়িয়া আছে, আমি সকলেব মুখে কীর্তন করিতেছি। আর আমিই শুনিতেছি ও কীর্তনের ভাবে আনন্দ কবিতেছি।

আবাব একদিন খুব কীর্তন হইতেছে শরীবটা ঢলিযা পড়িয়া পূর্বের মত দাঁড়াইয়া সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছে, সকলে সরিয়া সরিযা জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে, একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে আবার মধ্যে মধ্যে সামনের পা দুইটা তুলিয়া দুই পায় নাচিযা নাচিয়া চলিতেছে, এই শবীরটার সামনে সামনে। তাহার পর হইতে দেখিতাম কুকুরটি কীর্তন আরম্ভ হইলে যেখানে বসিতাম ঠিক সেখানে আসিয়া বসিত ও কোন কোন সময় হাঁটুর উপর মাথা দিয়া পড়িয়া থাকিত। হরিলুট হইলে বাতাসা ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাইত। কেহ উহাকে তাড়া করিলে খাইত না। এই শরীরের গড়াগড়িতে বা চলার অবস্থায় কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত বলিয়া কখনো কখনো উহাকে বাঁধিয়া রাখিত। কিন্তু সে আসিবার জন্য এমন অস্থির আগ্রহ দেখাইত যে বাধ্য হইয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়াও দেওয়া হইত।

[১] মা যে পরম সত্তা স্বরূপ এই ঘটনাটি তাবই একটি আভাস। ইহা out of body অভিজ্ঞতা রূপে চিন্তা কবা ঠিক না।

ঢাকায় ধানকোড়ায় দীনেশবাবুর বাড়িতে একদিন কীর্তন হইল। এই শরীরের পূর্ববৎ অবস্থা। সেইদিন ছিল বুধবার। তাহাদিগকে বলিয়া আসা হইল তোমরা প্রতি বুধবাব কীর্তন করিও। তাহাবা তাহাই কবিত। এ শরীরও মাঝে মাঝে যাইত।

সাহবাগে বাহিরের লোকের আসা নিষেধ হইলে সকলকে বলিলাম, তোমরা ৪/৫ বৎসরের জন্য সপ্তাহের প্রতি বুধবারে এক একজনের বাসায় কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া সান্ধ্য কীর্তনটা বজায় রাখ। ঐ সময়ের ভিতর রমনা আশ্রম হয়। আশ্রম হওয়ার পর অনেক বাড়ি কীর্তন বন্ধ হইয়া যায়।

কীর্তনে যোগেশের সহিত মায়ের লীলা

সাহবাগে একদিন কীর্তন হইতেছিল। যোগেশ[২] প্রায় আসে, গান করে, কিন্তু কীর্তনে বিশেষ যোগ দেয় না। ইহার মধ্যে একদিন কীর্তনে এই শরীরের পূর্ববৎ অবস্থা হইল। উঠিয়া যাইয়া সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। সকলে দাঁড়াইয়া কীর্তন করিতেছে কিন্তু যোগেশ বসিয়া আছে। ইহার ভিতব কেমন একটি ভাব হইল, সোজা যোগেশের পিছনের দিকে যাইয়া পিঠে এক পা ও শূন্যে এক পা দিয়া, শরীরটা টান হইয়া দাঁড়াইল। খুব হাসি বাহির হইতে লাগিল। পড়িয়া যাইতে পারে ভাবিয়া ভোলানাথ গিয়া তাড়াতাড়ি হাতের আঙুল ধরিল। কিন্তু তখন অস্বাভাবিক ভাব, মাথায় কাপড় নাই, চুল খোলা, এলোমেলো ভাব। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পরে কাঁধ স্পর্শ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। পরে ডান হাত উঠাইয়া বেশ এক লক্ষ্যে একটা চড়ের মত যোগেশের গালে গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ছেলেমানুষকে সান্ত্বনা দেয় সেইভাবে হাসিতে হাসিতে বাম হাত যাইয়া তাহার সেই গালটিতে বুলাইযা দিল। পরে এইভাবে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হইল। যোগেশ কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। শুনিলাম যদিও এই শরীরের সম্পূর্ণ ভার যোগেশের উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু যোগেশের নিকট খুব হালকাই মনে হইয়াছিল যেন একটি ছোট্ট শিশু। তাহার পর হইতে সে সব নামকীর্তনে যোগ দিত। তখন পর্যন্ত সে শরীরের নিকটেও আসিত না, কোন কথাও বলিত না।

[২] যোগেশ চন্দ্র রায় ঃ আশ্রমেব সর্বপ্রথম ব্রহ্মচাবী। দেরাদুন কিশনপুব আশ্রমেব পবিচালনায বহু বছর ছিলেন। শেষ জীবন সন্ন্যাসীরূপে বারাণসীতে কাটান।

অন্নগ্রহণ লীলা

সাহবাগে বাসনাদি মাজিবার জন্য হিন্দুস্থানী একটি বুড়ি ছিল। একদিন সে খাইতে বসিয়াছে। আমি ছেলে মানুষের মত কেমন একটা ভাব তাহার থালায় ভাতের দিকে দেখাইয়া বলিতেছি - এইগুলি কি? তুমি কি করিতেছ? আমিও করিব। কি সুন্দর ভাবে সে মুখে দিতেছে, চিবাইতেছে ও গিলিতেছে - ইত্যাদি হাসিযা হাসিয়া বলিতে বলিতে তাহার কাছে এ শরীবটা গেল। সে অন্য জাতি, আমি হাঁ করিলে পাছে সে আমার মুখে দেয, এইজন্য ভোলানাথ যাইয়া জোর করিয়া আমাকে টানিয়া আনিল ও বলিল - তুমি ত এখন মাটিতে পড়া ফল ছাড়া কিছু খাও না। এ যে ভাত। ভাতও চিনিতে পাবিতেছ না? তোমাব যে সব ভুল হইতে লাগিল।

ইহার পূর্বে একদিন একটি কুকুর খাইতেছিল। ছেলেমানুষের মত উহার নিকট যাইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে 'আমি খাইব, আমি খাইব' এই হইতেছিল। সেই দিনও ভোলানাথ আমাকে টানিয়া নিয়া আসিয়াছিল। কোন সময় আমি খাইব, বা এইটি করিব, এ সব কথা বলিতে বলিতে কাহারো বাধা পাইলে ছেলেমানুষের মত শরীরটা মাটিতে পড়িয়া যাইত। কোনবকম স্পন্দন থাকিত না। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যাইত। এইরকম নানারকম ছুটাছুটি ভাবের ভিতর দিয়া কয়েকদিন কাটিতে লাগিল।

একদিন সকলকে বলিলাম - দেখ, আমাব খেয়াল থাকুক আব না থাকুক, তোমরা তিনটি ভাত রোজ খাওয়াইবে। তাহা না হইলে যেমন হাতে খাওয়া হয় না, তেমন ভাত না খাওয়ার দিকটাও হইতে পারে। কিছুই ঠিক নাই। মানুষ ত্যাগের চেষ্টা করে, এই শরীরের সবই বিপরীত, যাহাতে ত্যাগ না হইয়া যায সে ব্যবস্থা করিতেছে। ত্যাগ ভোগে আটকাইযা থাকিলে ত চলিবে না। ত্যাগ ভোগেব পরপার চাই। সকলে বিশেষ স্মরণ কবিযা বোজ তিনটি করিযা ভাত খাওয়াইয়া দিত। সে তিনটির সঙ্গে যদি সামান্য একটু কণাও অতিরিক্ত মুখে পড়িত তাহা গিলিতে পারিতাম না। জিব দিযা বাহিরে ফেলিযা দিতাম। এই সঙ্গে তিন ঢোক জলও খাইতাম। শুনিয়াছি এইভাবে প্রায় ৬ মাস চলিযাছিল।

রায়পুর আসিবার পূর্বে হইতেই এ শরীরের খাওয়ার ঠিক ছিল না। কোন দিন সামান্য ছাতু ও দই, কোন দিন সামান্য ফলাদি, কখনো দুধ খই। আবার ক্বচিৎ কখনও কোন কোন মাসে ২/১ দিন রুটি ও তবকারি সিদ্ধ, কোন দিন কেবল

তরকারি জলে সিদ্ধ। কখনো ভোলানাথ বা অন্য কাহারও পীড়াপীড়িতে কয়েক গ্রাস ভাত খাওয়া হইত। এইরূপ অনির্দিষ্ট খাওয়া। রায়পুর[৩] আসিলে দেখা গেল জিনিষপত্র কিছুই মিলে না, তরকারি একেবারে পাওয়া যায় না। জ্যোতিষকে বলা হইল এখানে যা পাওয়া যায় তাহাই খাইব। ২/৪টি আলু সিদ্ধ ও এক পোয়া দুধই সাধারণতঃ ব্যবস্থা ছিল। জ্যোতিষ কোন দিন খুঁজিয়া আম এবং পেঁপে নিয়া আসিত। পরে যখন তাহাও মিলে না তখন আমি কি খাইব তাহার ভাবনা হইলে বলিতাম আমার জন্য ভাবিস না। তোদের জন্য রুটি বা যাহা রান্না হয় তাহা হইতে সামান্য কিছু দিলেই হইবে। প্রায় এই নয় বৎসর, সময় মত কি খাওয়া শোওয়া শুনিয়াছিস দেখিয়াছিস ত। তখন আর ঐ আলুও পাওয়া যাইত না। সে সময় সকলেরই একবার বেলা ৪টার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে মা

একবার দেওঘর যাই।[৪] তথায় প্রাণগোপালবাবুর গুরুদেব বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই শরীরটাকে দেখিয়া আনন্দে মহারাজজী বলিলেন - একবার সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিয়াছিলে, এইবার স্থূল শরীরে দেখা দিতে আসিয়াছ।

আশ্রমে একদিন কীর্তনে এ শরীরের অবস্থা পূর্ববৎ হইল। মহারাজজী ও তাঁহার শিষ্যগণ ঘিরিয়া বসিল ও এই শরীরটা একটু স্বাভাবিক ভাবে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন - দুই না এক। বলা আসিল - এক। মহারাজজী বলেন - দুই। হাসিতে হাসিতে এ ধরণে অনেক কথা হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম - দুই কি রূপে? মহারাজজী বলেন - দুই, এই যে আমি আর তিনি। এ শরীর বলিল - আমাকে ছাড়া ত তিনি নয় আবার তিনি ছাড়াও আমি না।

মহারাজজী এ শরীরের উপরোক্ত আলাপাদিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কাহাকে ডাকিয়া লিচু আনাইয়া নিজ হাতে এ শরীরকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

প্রাণগোপালবাবুর বাসায় আমরা ছিলাম, সেখান হইতে আশ্রমের সকাল বিকাল যাওয়া হইত। ওখানে গেলেও প্রায় শুইয়া পড়িতাম।

[৩] মা, ভোলানাথ ও ভাইজী একবস্ত্রে ঢাকা ছাড়িবার পর রায়পুবেব এক ভগ্ন শিবালযে আশ্রয নিলেন যাহা দেবাদুন হইতে চাব মাইল পূর্ব দিশায় অবস্থিত।

[৪] এই প্রথম শ্রীশ্রী মা পদ্মা নদী পাব হইয়া, কলকাতা হইয়া দেওঘর যান - ১৯২৬ সালে মে মাসে।

একদিন কীর্তন আরম্ভ হইলে এ শবীর কেমন হইয়া গেল। বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজী আমার নিকটে আসিলেন। এ শবীরেব হাত কেমন একটা ভাবে যাইয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। তখন মহারাজজী এ শরীরকে তাঁহার ধ্যান মন্দিরে নিয়া যান, আর অন্যান্য সকলকে বাহিরে থাকিতে বলেন। খুব আদরের সহিত তাঁহার ধ্যানের স্থান দেখাইলেন। নিজের আরও আরও কথা ও ক্রিয়াদির কথা খুব আনন্দের সহিত বলিলেন। সেখানে হইতে কিছু দূরে তপোবন নামে একটি জায়গা আছে। ইহা নির্জন ও একান্ত। এই শরীরটা তাহাকে আবদার করিয়া বলিল - তুমি সেখানে যাইয়া থাক না বাবা।

দেওঘর আসার পূর্বে কিছুদিন যাবৎ যখনই শুইযা উঠিতাম বা কোনদিন চলাফেরা করিতে বা অন্যান্য সময়ও মুখে 'সোহহং' শব্দটি প্রায আস্তে আস্তে বাহির হইত। কোন সময় ইহা বড় করিয়াও উচ্চাবণ হইত। যাহাবা কাছে থাকিত, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত - কি বলিতেছ? কিন্তু কোন উত্তর আসিত না। কেহ কেহ ভাবিত আমি 'শিবোহহং' বোধ হয় বলি। পবে কাহারো মুখে 'শিবোহহং' শুনিয়াছি, কিন্তু 'সোহহং' আমি শুনি নাই। এইরূপ একটি শব্দ আছে, তাহাও বাহিরে কাহারো নিকট শুনি নাই। পরে ভিতরের মীমাংসা হইয়াছিল যে 'সোহহং' অর্থাৎ একসত্ত্বাতে স্থিত, অর্থাৎ একমাত্র আমিই।

সে সময়ে নড়াচড়ার ভাবটি প্রায় ছিল না। অচল অটল ভাবে পড়িয়া থাকিবার ভাবটিই প্রধান। দিন রাত একভাবে কাটিয়া যাইত। যখন উঠিতাম, তখনো সেইভাব। বসিলে দেখিতাম মাটির একটি ভবা কলসী, চারিদিকে ঠেকা দিয়া বসাইলে যেমন স্থির একভাবেই বসিয়া থাকে এ শরীবটাও যেন ঠিক সে ধরণে বসিয়া আছে। চলাফেরাতে এ ভাবটা সর্বক্ষণ। দাঁড়াইলে কোন কোন সময় পলকশূন্য অবস্থায় একভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকা হইত, শরীব অচল অটল। দেওঘরে এ শরীরের ভাবাদি এইরকমই ছিল।

চিত্র ঃ শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ

প্রমথবাবুর বাড়িতে মা

দেওঘর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায প্রমথবাবুর বাড়ি উঠিলাম। একদিন সন্ধ্যায় অন্যত্র যাওয়ার ঠিক হইলে, প্রমথবাবু বলিলেন - কিছুতেই হইবে না। ইহা বলিতে বলিতে সে ছাদেব উপর জপে বসিয়া গেল। ক্রমশঃ এমন স্থির হইল যে যেন সংজ্ঞা লোপ হইয়া গিযাছে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আবম্ভ হইল, প্রমথবাবু

এইভাবে বৃষ্টিতেই বসিয়া আছে। এ শরীর উপস্থিত সকলকে বলিল - তোমরা কীর্তন আরম্ভ কর। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া সকলে কীর্তন করিল ও প্রমথবাবু ভাবাবস্থায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঘন্টা খানেক পর প্রমথবাবু প্রকৃতিস্থ হইল এবং বলিল - 'মা কেমন করিয়া যাইতে পারেন' এ ভাবটির আত্যন্তিকতায় কোথায় গিয়া কি আনন্দে যে ছিলাম বুঝাইতে পারি না।

সাহবাগে কালীপূজা

দীপান্বিতা আসিয়াছে। সকলে বলিল - ঐবার মা কালীপূজা করিয়াছিলেন, আমরা অনেকে দেখি নাই। এইবার মাকে কালীপূজা করিতে হইবে। সুরেনবাবু (পোষ্ট মাষ্টার) প্রায়ই এইকথা বলে। এ শরীব 'না, না' করিতেছে। ইহার ভিতর একদিন প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী হিরণ ও আরো কে কে আসিয়া বলিল - ঐবার পূজায় বড় আনন্দ হইয়াছিল, এইবার পূজা আবাব মাকে করিতেই হইবে।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় প্রায়ই লইয়া যাইত। সেখানে ভোগাদিও হইত ও বাড়ির ছোটবড় সকলেই খুব আনন্দ পাইত। উক্তদিন শশাঙ্কবাবুর বাসায় গাড়িতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, লাট সাহেবের বাংলোর নিকট যে পুকুরটি আছে সেইটির বরাবর ছাদ দেওয়ালের সামনে প্রায় আঠার হাত উঁচুতে, শূন্যে চলার অবস্থায় ন্যাংটা এক সজীব কালীমূর্তি, আমাকে দেখিযা উপর হইতে হেলিয়া হাত বাডাইয়া যেমন কোলে আসিতে চায় সেইভাবে, আমার দিকে তাকাইল। আমারও বাম হাত উপর দিকে উঠিয়া গেল। ভাবটাও যেন হঠাৎ কেমন হইয়া গেল। গাড়ির ভিতর যাহারা ছিল, সকলে উহা লক্ষ্য করিল। ভোলানাথ বারে বারে জিজ্ঞাসা করে - কি হইয়াছে? সেই বাসায় যাইযা খাইতে বসিযাছি তখন দেখি ভোলানাথ ও এ শরীরে মধ্যের জায়গায় সেই ন্যাংটা কালীমূর্তিটি ছোট্ট বালিকাব মত আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বেকার মত আমি বাঁ হাতখানি উঠাইলাম। দেখিতে দেখিতে মূর্তিটি সেইখানেই মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এই শরীরটা মাটিতে শুইয়া পড়িল। উঠিলে ভোলানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম - বলিতে পারিতেছি না। জিজ্ঞাসা করিও না। সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

চিত্র ঃ মা কালীর আবির্ভাবের সময় মা'র বাঁ হাত উঠিয়া যায়, তাঁর পাশে ভোলানাথজী - ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়ের টিকাটুলির বাড়িতে।

পরে একদিন আমি রান্নাঘরে কি কাজে গিয়াছি, সেখানে দেখিতেছি যে যেন ভূদেববাবু সাহবাগে আসিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন যে, কালীপূজা হইবে না

শুনিলাম। কেন হইবে না? পূজা করুন। ঘবে ফিবিযা ভোলানাথেব নিকট শুনিলাম যে বাস্তবিকই ভূদেববাবু তাহাকে ঐ কথা বলিযা গিযাছে। সন্ধ্যাবেলা সুরেনবাবু আসিল। সে কালীপূজার কথা আবার তুলিল। বলিল - পবশুদিন কালীপূজা, সময় ত আর নাই। আমি ভোলানাথকে বলিলাম - দেখ সকলে মিলিয়া এত আবদার কবিতেছে, তুমিই পূজা কর না কেন? সকলে আনন্দ পাইবে। ইহা বলিতে বলিতে শরীবটা কেমন যেন হইযা গেল। আমি অন্য ঘরে যাইয়া অবশের মত পড়িয়া রহিলাম। ভোলানাথ সুরেনবাবুকে ডাকিল এবং বলিল - তোমাদের মা এইরূপ বলিয়াছে। একবার যখন তাহাব মুখ দিযা বাহির হইয়াছে, তখন পূজা হইবেই। তোমাবা আয়োজন কর।

সব জিনিষের ফর্দাদি কবিয়া সুরেনবাবু বলিল - মূর্তিব কি হইবে? যখন তখন ত মূর্তি পাওয়া যায় না। মাত্র একদিন মাঝে, ইহাব ভিতব মূর্তি তৈয়ারী হইবে? ভোলানাথ বলিল - এখনই মূর্তির জন্য শহরে যাও। সুরেনবাবু মূর্তিব মাপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভোলানাথ তাহাকে নিযা এ শরীরেব নিকট আসিল। শরীরের অবশ ভাব ও শোযা অবস্থা দেখিযা, সময়ও আর নাই, বাত্রি প্রায তখন ১১টা, তাহার এক খেয়াল হইল যে রাস্তায় গাড়িতে ও শশাঙ্কবাবুব বাসায যে হাত উঠাইযাছিলাম, ততটা মাপ দেওয়া যাক। আমি বসিযা হাত তুলিলে যতটা উঁচু হয়, আন্দাজ করিয়া সে মাপের মূর্তির জন্য সুরেনবাবুকে বলিয়া দিল। সুরেনবাবু বাজারে চলিয়া গেল। একজন কাবিগব বলিল - আমার নিকট ১২ খানি কালীমূর্তির ফরমাইস ছিল। সে কয়খানি শেষ হইলে মনে হইল, আর একখানি একটু বড় করিয়া করি। সেইখানি আছে, নিতে পারেন। সুবেনবাবু মাপের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে মাপ অবিকল ঠিক আছে। সুবেনবাবু আনন্দের সহিত সে মূর্তিতে রং দিয়া শেষ করিতে বলিল।

কালীমূর্তি সাহবাগ আসিলে দেখা গেল যে তাহাব বংটাও বেন অন্য রকম। সাধারণতঃ কৃষ্ণমূর্তিব রং যেরূপ হয়, কতকটা সেই বকম। এ শরীর যে ন্যাংটা মূর্তি শূন্যে দেখিয়াছিল, সমুদয় অবয়ব সেই রকম, কেবল নীচে শিব বেশি আছে। পূজাব আয়োজনাদি যথাবিহিত হইল। পূজার পূর্বে ভোলানাথ এ শবীবকে পূজা করিতে বলে। প্রতিবাদ করিলে বার বার বলে, না তোমাকেই করিতে হইবে।

এ শরীর পূজা করিতে বসিল।[৫] কেমন একটা শরীরের ভাব হইয়াছিল।

[৫] ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৬ - মা দ্বিতীয় বার কালীপূজা করেন।

যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই ভাল বলিতে পারিবে। যজ্ঞ ইত্যাদি এক রকম কিভাবে হইয়া গেল। যজ্ঞ করিয়া যখন অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে যায়, তখন এ শরীরটা মাটি হইতে উঠিয়া হাত বাড়াইল। আজও সেই অগ্নি রক্ষিত হইতেছে।[৬]

পরদিন নিরঞ্জনের স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া মূর্তিকে ধান দূর্বা দিল। ইহার মধ্যে নিরঞ্জনের স্ত্রী বলিল - মা! কি সুন্দর মূর্তি। আমার বিসর্জন দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন বলিলাম - তবে বুঝি এ মূর্তি বিসর্জিত হইতে চায় না। মূর্তি বিসর্জন দেওয়া গেল না। নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হইল।

যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা

সেই রাত্রিতেই আগুন নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলা হইল কে এই আগুন নিয়া এখনই বসিয়া যাইতে পারে, শশাঙ্কবাবু বলিল - মা! আমি বসিতে প্রস্তুত। বলা হইল ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর। শশাঙ্কবাবু বলিল ছেলেদের কি জিজ্ঞাসা করিব। আমি কোন কর্তব্য ছেলেদের উপর ফেলিয়া আসিতেছি না। ছেলেরা উপস্থিত ছিল। তাহারাও বলিল আমাদের কিছু বলার নাই। তখন শশাঙ্কবাবুর হাতে আগুনটা দেওয়া হইল। সে তাহা নিয়া যেখানে পূজা হইযাছিল সেইখানে গিয়া বসিল। সেই দিন হইতেই সে ওখানে সাধন ভজন নিযা থাকিতে লাগিল। পরে শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী সাহবাগে থাকিয়া অগ্নি বক্ষার ভাব লইল। কিছুদিন এইরূপে চলিতেছে।

শশাঙ্কবাবুর গুরুদেব ঢাকা আসিলেন। এ শরীর তখন শশাঙ্ক বাবুকে বলিল - বাসায় গুরুদেব, তাঁহার কাছে যাও। সে তাহাই করিল। পরে প্রতিদিন বাসা হইতে সাহবাগে আসিত এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে এখানেই থাকিত।

বীরেনের কালীপূজা

শশাঙ্কবাবুর বড় ছেলে বীরেন ইহার পূর্বেই ঢাকা আসিয়াছে এবং সাহবাগে প্রায়ই আসিয়া সৎ আলোচনাদি করিত। একদিন বীরেন আসিয়া বলে - মা, আমি এই কালীর উপর পূজা করিব। ব্যবস্থাদিও করিল। পাঁঠা বলি দিবে, তাহার জন্য

[৬] ৫ই নভেম্বর ১৯২৬ হইতে প্রত্যেকদিন গাযত্রী মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ এবং অগ্নী অখন্ডরূপে বক্ষিত আছে আজ পর্যন্ত - বিশেষ ভাবে বাবাণসী এবং কনখল আশ্রমে। এই অগ্নি দিযা বিশালরূপে সাবিত্রী যজ্ঞ হইযাছিল বেনাবসে ১৪ই জানুযারী ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত।

খড়গ ধার দিতে গিয়া বীরেনের হাতে লাগিল এবং রক্ত বাহির হইল। তখন এ শরীর বলিল - এই রক্ত বেলপাতায় করিযা মাকে দিয়া দাও। পরে যখন পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া বলি দিতে নিল, তখন এ শরীরটা উঠিযা বলির স্থানে যাইয়া পাঁঠার ঘাড়ে হাত দিল। যে বলি দিতেছিল, সে খডগ তুলিতে গিয়া থামিযা গেল। পবে তাহাকে বলিলাম - পাঁঠাটিকে বমনাব মাঠে নিয়া চল। সাহবাগ হইতে বাহির হইয়া রমনার মাঠে অতিদূবে পাঁঠাটিকে রাখিয়া ফিবিবার সময়ে ভোলানাথ বলিল - পাঁঠাটিকে শেয়ালে খাইবে। এ শরীর কিছু না বলিয়া সকলের সঙ্গে সাহবাগে ফিরিতে না ফিরিতেই দেখে, পাঁঠাটি ডাকিতে ডাকিতে এ শরীরের কাছে চলিয়া আসিয়াছে। পূজাদি শেষ হইল।

পরে দেখা যাইত পাঁঠাটি ঘুরিয়া ফিরিযা বাগানেই থাকিত। সন্ধ্যা হইলে আপনা আপনিই আমরা যে ঘরে শুইতাম তাহার এক কোণে অতি সন্তর্পণে পড়িয়া থাকিত। ঠাণ্ডার দিনে ইহার গায়ে কিছু দেওযা হইত।

যখন কীর্তন হইত, তখন পূর্বকথিত কুকুরটি ও এই পাঁঠাটি এ শরীরের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকিত। সময় সময় দুই হাঁটুর দুই দিকে মাথা দিয়া দুইটি পড়িয়া থাকিত। কোন কোন দিন কীর্তনে এই শরীর চলিতে থাকিলে ইহারাও পিছু পিছু যাইত। এ শরীরকে একজন জিজ্ঞাসা কবিযাছিল - এ পাঁঠাটি পূর্বজন্মে কি ছিল? মুখে বাহির হইল - সন্ন্যাসীব বেশধারী, দেখ না কম্বল গায দেয। মুক্ত ভাবে চলে, যাহা পায় তাহাই খায়। আমবা যখন ঢাকা হইতে কিছুদিনেব জন্য একবার বাহিরে গেলাম, তখন ফিরিয়া আসিযা পাঁঠাটিকে আর দেখা গেল না। কেহ কিছু দেখিয়াছে বলিয়াও বলিতে পাবিল না।

যজ্ঞাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন

কিছুদিন পর ইহা স্থির হইল যে যজ্ঞের অগ্নি কুণ্ডে রাখা হইবে। স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ভোলানাথকে বলা হইল - একটি গর্ত কব, আর তিনটি বটপাতা আন। সেইখানেই বটগাছ ছিল, পাতা আনিলে যজ্ঞের একটি কয়লা নিযা তিনটি পাতায় তিন রকম ভাষায় তিন লাইন এ শরীবের হাতে দিয়াই আপনা হইতে লেখা হইল। ঐ পাতাগুলি গর্তের ভিতর বাখিযা, গর্তের মুখ বন্ধ করিযা তাহাব উপর শাস্ত্রীয বিধিমত যজ্ঞকুণ্ড করা হইল। এ শবীবের সেই সময় খেযাল হইতেছিল, ভাষা সৃষ্টিব আরম্ভে যে ভাষা, তাহারই এই তিনটি। জাগতিক হিসাবে সংস্কৃত ভাষাটি পরিষ্কাব খেয়ালে প্রকাশ হইল। কোন দিন যজ্ঞকুণ্ড কবা হয় নাই, উপস্থিত

মত সব হইয়া গেল। পরে শোনা গেল, শাস্ত্রীয় বিধিমতেই আকার ও মণ্ডলাদি হইয়াছে।

যজ্ঞের অগ্নি কুণ্ডে রাখিয়া, কালী অন্য ঘরে সরান হইল। যজ্ঞে অগ্নি অপ্রকাশ হইলে কি ব্যবস্থা করিলে পুনরায় অগ্নি প্রকাশ হইবেন, তাহাও বলিয়া রাখা হইল। এত দিন পরে এইবার কেমন একভাবে এই কথাটা বলিবার খেয়াল হইল।

পরে কলিকাতা যাওয়া হইল। সেখানে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বীরেনের সঙ্গে আলোচনা করা হইতেছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইল - অগ্নি অপ্রকাশ। পরে জানা গেল কি, সেই সময় অগ্নিদেব অপ্রকাশ হইলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব নির্দেশানুসারে অগ্নিদেব প্রকাশ হইয়াছিলেন। আবার যখন আদিনাথ যাওয়া হইয়াছিল, তখন শরীরের পিতা ও সতীনাথ সঙ্গে ছিল। হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিয়াছিলাম - অগ্নি অপ্রকাশ। অনুসন্ধানে তাহাও সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল। অবশ্য এ সময়ও অগ্নি অপ্রকাশ হওয়া মাত্রই পূর্ব নির্দেশানুযায়ী প্রকাশিত করা হইয়াছিল। এতদিন যাবৎ যজ্ঞের অগ্নিরক্ষা হইতেছে, কিন্তু কোন দিন এই কথা আসে নাই। হঠাৎ খেয়াল আসিল যাহারা অগ্নিরক্ষা করে, তাহাদের কাছে বলা হইল - যদি কখনও এই যজ্ঞাগ্নি তোমাদের কাছে অদৃশ্য দেখ তবে এই নিয়মে অগ্নি প্রকাশিত করিও।

প্রথমে আদিনাথ হইতে দেখা হয়, পরে কলিকাতা থাকিয়া দেখা হয়। কেমন সুন্দর, এই শরীরটা শুইয়া আছে - পূর্ব দিকে মাথা, আশ্রমের দিকে পা। হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম দিক দিয়া একেবারে সামনে একটি অগ্নির শিখা বাঁকাইয়া, উত্তর দিক শিখার অগ্রভাগ রাখিয়া ঠিক মূর্তির মত আসিয়া এ শরীরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুখ দিয়া বাহির হইল - অগ্নি ওখানে অপ্রকাশ। অর্থাৎ ঢাকায় অগ্নি অদৃশ্য, এ শরীরটির কাছে দৃশ্য। কোথায় ঢাকা, আর কোথায় আদিনাথে এ প্রকাশ। কলিকাতাও গভীর রাত্রে বসিয়া কথা বলা হইতেছে - ঐভাবে সোজা মূর্ত আকারে আসিযা প্রকাশ। আরও ক্বচিৎ কখনও এইরূপ হইলে, এই জাতীয় প্রকাশ। কাজেই তোদের দৃষ্টিতে অগ্নি অদৃশ্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে অগ্নি অখণ্ড ভাবেই ছিল ও তোদের সেবা নিতেছেন।

দেরাদুন[৭] আসিবার পূর্বে শরীরের খেয়াল অনুযায়ী সেই অগ্নিতে প্রায় লক্ষ

[৭] ৬ই জুন, ১৯৩২ সোমবার, শ্রীশ্রী মা দেরাদুনে পৌঁছিয়াছিলেন।

আহুতি দিয়া, পূজাদি করিয়া, নারিকেল তেলের বাতির দ্বারা সে অগ্নি অখণ্ডভাবে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইযাছে। নারিকেল ফল, সেই তৈলই প্রশস্ত খেয়ালে আসিল। প্রত্যহ যজ্ঞ হইবার সময় সেই বাতি হইতে আগুন নিযা আসা হয়। পরে বড় পণ্ডিতদের কাছে শোনা গেল, শাস্ত্রবিহিত মতেই সব করা হইয়াছে।

নির্মলবাবুর বাসায় মায়ের সূক্ষ্মে গমন

ঢাকায একদিন শুইয়া আছি, দেখি কি এ শরীর বেনাবসেব নির্মলবাবুব বিছানায় বসিয়া আছি। আমি উঠিতেই খুকুনী বলিল - নির্মলবাবুব খুব অসুখ বেনারস হইতে খবর আসিয়াছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম - এই মাত্র ত সেখান হইতে আসিলাম। পরে জানা গেল যে ঠিক সেই সময় তাহাদের বাসায় নির্মলবাবু এই শরীরকে তাহার শিয়রে বসা দেখিয়াছিল। নির্মলবাবু সেইবার ভাল হইয়া গেল।

কমলাকান্তের মাতৃদর্শন

কমলাকান্ত নামক একটি ছেলে কিছুদিন হয মেট্রিক পাশ করিয়াছে, ঢাকা ফার্মে থাকে। সে একদিন সাহবাগে আসিয়া বড় বড চোখ করিয়া এক দৃষ্টিতে অনেকদূর হইতে এ শরীরের দিকে অনেকক্ষণ চাহিযা বহিযাছে। সাধাবণ ছেলেপিলে হইতে তাহার ভিতর কিছু পার্থক্য দেখিযা তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম, পরিচয ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলাম - তোমাব যখন ইচ্ছা আসিও। সে-ও সাহবাগে আসা যাওয়া করে। কয়েকমাস ধবিযা তাহার বরাবর জ্বর হইতেছে, কিছুতেই সাবে না। ডাক্তারেরা কালাজ্বব বলিযাছে। এ শবীরের কি খেয়াল হইল, তাহাকে বলিল - জল দেওয়া বাসি ভাত এখানে আছে, তুমি তাহা খাও। সে অতি সন্তুষ্ট হইয়া খাইল। দেখা গেল পরে তাহাব জ্বব আস্তে আস্তে সারিয়া গেল।

একদিন সে বেলা প্রায় ১১/১২টায় আসিযা দুঃখ করিয়া জানায় যে স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বলিযাছে - তোমার বড সংসার বুদ্ধি, ইহা শুনিয়া অবধি তাহাব প্রাণে বড দুঃখ হইয়াছে। সে বলিল - আমার ত সংসাব করিবার মোটেই ইচ্ছা নাই। ধর্ম পথে আমি কি করিযা চলিতে পারি, আমাকে বলিযা দিন। আপনি যাহা আদেশ করেন, আমিই তাহাই করিব। তাহাকে হঠাৎ বলিযা উঠিলাম - তুমি একবার জ্যোতিষের নিকট যাও ত। সে তাহাব নিকট গেল ও ফিবিয়া আসিয়া বলিল - আমি তাঁহার কাছে গিয়া খুব আনন্দ পাইযাছি। সাধুদের যে

সব গুণ ও ভাব আছে বলিয়া পুস্তকে পড়িয়াছি, তাঁহার ভিতর অনেকটা সেই রকম দেখিলাম।

কালী যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা হইবার পর কমলাকান্ত সাহবাগে থাকিতে আরম্ভ করে। কুলদা সন্ধ্যার সময় আসিয়া যজ্ঞের কর্মাদি করিয়া চলিয়া যায়। সে ধর্ম-প্রাণ ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাহার নিষ্ঠা দেখা যাইত।

চিত্র ঃ দেরাদুনের কল্যাণবন আশ্রমে কমলাকান্তদা যজ্ঞে রত।

বিনা জলপানে

একবার সাহবাগে কে কথায় কথায় বলিল - জল না খাইয়া কি মানুষ থাকিতে পারে না? ইহা শুনিয়া কি এক খেয়াল আসিয়া গেল। জল খাওয়ার আর ভাব নাই। এমন কি কিছু খাইলেও জল মুখে দিতাম না, মুখও ধুইতাম না। প্রায় ১৫ দিন এইভাবে চলিতেছে। একদিন বাহিরে যাইব জলের ঘাট দিলে দেখি, জল না কি খেয়াল নাই। জলের ব্যবহার একেবারে বে-খেয়াল হইয়া গিয়াছে। জল না কি অন্য জিনিষ তাহাই প্রকাশ হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ বিচার আসিল যে ব্যবহার নাই তাই এইরূপ হইয়াছে। তখন ভোলানাথ, খুকুনী, অটল, কমলাকান্ত ও নন্দু সেখানে ছিল। তাহাদের ৫ জনকে বলিলাম - আমার মুখে তোমরা ৫ জনেই জল দাও। তাহারা জল দিল। প্রায় ১ ঘটি জল খাওযা হইল। সে সময় অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা হইত তখনো রাত্রি বেশ আছে। জল খাওয়াইবার পর এ শরীরটা বাহিরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলা হইল যে দেখ এখানে পাঁচটি পদ্মফুল পাইলাম। এত রাত্রিতে কাহারো ত এখানে আসিবার কথা নয়। কোথা হইতে এ ফুল আসিল? ইহার ভিতরেও কথা আছে। তাহাদের বলিলাম তোমরা এক একটি নাও।

সাহবাগে থাকিতে আর একবার ২৪ দিন জল খাওয়া হইয়াছিল না। সাধারণতঃ দেখা যাইত যে কিছুদিন পর্যন্ত একভাবে চলিলে পূর্বের ব্যবহাবগুলি অদৃশ্য হইতে থাকিত।

তখন ডাবের জল দিলে এক ঢোক খাওয়া হইত, কেবল জল ভুলের মত না হয় এই অভ্যাসের জন্য। শরীরের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা গেল না। এবার জল বে-খেয়াল হইয়াছিল না। তবে জল না খাইলে যে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা বেশ সুন্দর দেখা গেল।

সাহবাগে প্রথম প্রথম যখন পড়িয়া থাকার ভাবটি খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন দেখা যাইত দুধ জল প্রভৃতি তরল দ্রব্য খাইতে দিলে, চুমুক দিযা খাইতে পারা যাইত না। শ্বাসেব গতি সর্বক্ষণ একভাবে স্থির থাকিলে এইরূপ অবস্থা কোন কোন সময় হইয়া থাকে। প্রথমে দেখা গেল, চুমুক দিয়া টান দিলেই সব তালুতে যাইয়া উঠে। কিছুদিন পরে চুমুক দিয়া খাওয়ার ভাবই চলিযা গেল। এই রকম কিছুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। শেষে চুমুক দিয়া খাওয়ার ভাবই বে-খেযাল প্রকাশ। চামচ দিয়া দুধ খাওয়ানো হইত। তাহাতে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরিযা আসিল।

পাওলদিয়া গ্রামে মা

একবার যোগেশবাবু তাহার দেশের বাড়ি পাওলদিয়া নিবার প্রস্তাব করিল। বলিল - আমার মায়ের অসুখ। জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে। তাঁহার মুক্তিব জন্য একটি কালীপূজা করার ইচ্ছা। আপনারা নিশ্চয়ই যাইবেন। আমবা গেলাম। যোগেশবাবু আমাকে দেখাইযা ভোলানাথকে বলে যে তাঁহার পূজা কবিতে হইবে। ভোলানাথ জোর করিলে এ শবীর বলিল - আর কোন দিন পূজার কথা এ শরীরকে বলিবে না বল। বলিল - আচ্ছা, এইবার কর।

পুরোহিত পূজার সব ঠিক করিলে এ শরীব যাইয়া পূজায় বসিল।[৮] শরীরের আপনভাবে পূজাদি হইয়া গেল। ইহার ভিতর যোগেশবাবু একবার পূজা দেখিতে গেলে, এ শরীরকে সেখানে দেখিতে পাইল না। কেবল একখানি কাপড় আসনের উপর পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইল। ভাবিয়াছিল যে আমি হয়ত বা অন্যত্র গিয়াছি। পরে যখন শুনিল যে এ শরীর পূজার আসনেই ছিল তখন অবাক।

যোগেশবাবুর মার শ্রাদ্ধের সময আমরা পাওলদিতে উপস্থিত ছিলাম।[৯] কীর্তন আরম্ভ করিলে এ শরীরের অবস্থায পবিবর্তন হইল। কীর্তনের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে পাশে একটি মুসলমানকে দেখিযা মুখে আল্লার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামের মত আরো কি কি বাহিব হইতে লাগিল। সে মুসলমানটিও এ শবীরের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম করিতে লাগিল। সে পবে বলিল - মাব মুখে যেইরূপ

[৮] ইহা মা দ্বাবা তৃতীযবার কালীপূজা।

[৯] ডিসেম্বব ১৯২৬, ডাঃ বায বাহাদুব যোগেশচন্দ্র ঘোষ-এব মাযেব শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে।

আল্লার নাম হইয়াছিল আমরা চেষ্টা করিয়াও এইরূপ আনিতে পারি না। পরে ঐ মুসলমানটি বলিয়াছিল সেইদিন আমার যেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল, এইরূপ আর জীবনে হয় নাই, হইবেও না।

পরে ভ্রমর[১০] ও আরো ২/৩টি মেয়েকে সারারাত্রি কীর্তন করিবার কথা বলিলাম। তাহারা তাহাই করিল। এই কীর্তন একদিন অহোরাত্র চলিয়াছিল। কীর্তনের পর এ শরীরের কথায় যোগেশবাবু সব কীর্তনিয়াদের ধূপ নিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

জ্যোতিষের অসুস্থতা

পৌষের মাঝামাঝি[১১] একদিন জ্যোতিষ সাহবাগে আসিয়া জ্বর হইয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল। পরে শুনিলাম সে খুব বেশি অসুস্থ। কমলাকান্ত যাইয়া প্রথম কয়েকদিন তাহার নিকট ছিল ও সর্বদা আমাদের খবরাদি দিত। কয়েকদিন গেলে ডাক্তাব বলিল যে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে যাইতাম। নিরঞ্জন আসিয়া প্রায় প্রত্যহই খবরাদি দিত। তাহারা দুইজন যেন এক জোড়া দেখাইত। কেহ কোনদিন কাহাকেও ফেলিয়া এ শরীরের নিকট একা আসিত না। একদিন নিরঞ্জন বলিল যে মা, জ্যোতিষ ডাল ভাত খাওযার জন্য অস্থির হইয়াছে কিন্তু ডাক্তারেরা দিতে চায় না। অবস্থা খুবই খারাপ, যদি না বাঁচে বড়ই দুঃখ থাকিবে। তখন তাহার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি, কাসি অত্যধিক। মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। সাহবাগে যাহারা আসে প্রায়ই লোকে তাহাকে দেখিয়া আমাদের নিকট দুঃখ করে আর যাহাতে বাঁচে প্রার্থনা করে। তখন খুকুনী প্রায় সর্বদা এ শরীরের কাছে থাকিত। সে বলিত - মা। জ্যোতিষদাকে বাঁচাইতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সাহবাগে কীর্তনে বসিয়াছি, আমি দেখি কি উপস্থিত অনেকের মুখে যেন রক্ত। কীর্তনের পর ভোলানাথকে এই কথা বলিলাম, তিনি বলিয়া উঠিলেন - তবে কি জ্যোতিষের মুখ দিয়া বক্ত পড়িতেছে। ইহা বলিয়া তিনি তাহার নিকট তখনই চলিয়া গেলেন এবং বাস্তবিক তাহাই দেখিলেন।

হঠাৎ একদিন কিরূপ খেয়ালে আসিল যে ডাল ও ভাত মিলাইয়া নিয়া আমি এবং ভোলানাথ জ্যোতিষের বাসায় গেলাম ও তিনবার তাহার মুখে তিন

[১০] ডাঃ বায বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র বোস এর নাতনী।

[১১] ৪ঠা জানুয়াবী, ১৯২৭।

গ্রাস দিলাম। সে খুব তৃপ্তিব সহিত খাইল। সঙ্গে সঙ্গে খেযালে আসিল, যতটা ভাত খাওয়াইলাম, ততদিন সে বাঁচিবে। আর সে যে চেয়াবে প্রত্যহ বসিত তাহার পিছনের পাযার মাথায স্ক্রু প্যাঁচের গোল কাঠটি আসিবাব সময় হাতে করিয়া আনিলাম। ভোলানাথের হাতে ঐটি দিয়া বলিলাম - যখন জ্যোতিষ ভাল হইয়া আমাদের কাছে আসিবে, সেইটি যেন আমাদের নিকট হইতে হাতে করিয়া লইয়া যায়। ভোলানাথ উহা বাখিয়া দিল, পবে তাহাই করা হইয়াছিল।

কয়েকদিন গেলে আমি ও ভোলানাথ এক রাত্রিতে তাহার বাসায় যাইয়া সারারাত্রি কাটাইলাম। সাহবাগ হইতে যাইবার সময় একটি বাঁশের কঞ্চি নিয়া গিয়াছিলাম। আমি উহা দিয়া রোগরূপী যে মূর্তি[১২] জ্যোতিষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া জোরে তিনটা ঘা তাহাব গায়ের উপর দিলাম এবং সে কঞ্চিটিও তাহার ঘরের জানালার উপর রাখিযা আসিলাম। তাহার পর হইতে সে যতদিন পূর্বের বাড়িতে রোগাবস্থায় ছিল ততদিন আমি আব তাহাকে দেখিতে যাই নাই। সেই রাত্রিতে ঐ বোগের মূর্তিটাকে বলিযাছিলাম - যাহা করিবার তো করিযাছিস, এখানেই থামিযা যা। তাহাব পর হইতে তাহাব জীবনের আশা একটু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সাবিয়া উঠিতে দীর্ঘ সময লাগিযাছিল।

যোগেশের ভিক্ষাবৃত্তি

জ্যোতিষের বাড়াবাড়ি অসুখের সময় খেয়াল হইল - যদি যোগেশকে এক বছব ঘর ছাড়া ও ভিক্ষাবৃত্তিতে রাখি, তবে জ্যোতিষেব মঙ্গল হইবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কত বকম যোগাযোগ থাকে,[১৩] এ বিষযে আব কিছু বলা আসিতেছে না।

একদিন ভোলানাথকে বলিলাম যে যোগেশকে বল ফাল্গুন মাসেব ১লা তারিখ[১৪] বাড়ি হইতে বাহির হইযা কেশ মুণ্ডন করিয়া টাকা পযসা শূন্য অবস্থায় ভিক্ষা বৃত্তিতে এক বৎসর ঘুরিয়া আবার ঐ তারিখেই যেন ঢাকা আসিয়া উপস্থিত হয। যোগেশ যথাসময়ে বাহির হইয়া গেল। সেই বৎসবই পূর্ণকুম্ভ ছিল।[১৫] আমরা যখন হৃষীকেশ স্বর্গদ্বার গেলাম, তখন ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া

[১২] প্রত্যেক বোগেরই এক একটি রূপ আছে।

[১৩] হিন্দুদের বিশ্বাস যে এই জন্মেব পবিস্থিতি গত জন্মেব কর্মের উপব নির্ভর কবে, আধ্যাত্মিক জগতেও ইহা প্রযোজ্য।

[১৪] ১৩ই ফেব্রুযারী ১৯২৭।

[১৫] মার্চ-এপ্রিল ১৯২৭।

যোগেশকে সেখানে দেখাইয়াছিল। তাহাকে বলা হইয়াছিল, অজ্ঞাতবাস করিবে, জানাশুনা মানুষকে এড়াইয়া চলিবে। সে আদেশ সর্বতোভাবে পালন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকায় ফিরিয়া আসে।

চিত্র ঃ দেরাদুনের কিশনপুর আশ্রম ভোলানাথজীর মন্দিরের সামনে বসা ব্রহ্মচারী যোগেশদা

রোগমূর্তি

রোগেরও তোমাদের মত মূর্তি আছে। উহাদের সঙ্গে এ শরীরের অনেক সময় দেখা সাক্ষাৎ ও খেলা হয়। উহারা এ শরীরে আসিলে কখনও তাড়াইয়া দেওয়া হয় না। কাহাকেও ত এ শরীর তাড়াইয়া দেয় না। উহাদেরই বা তাডাইয়া দেওয়া হইবে কেন? ঐ-ত। আসলে তোমরাও যেমন এ শরীরেব কাছে, তাহারাও ঠিক সেই রকম। ডাকিয়াও আনি না, আসিলেও তাড়াই না।

বেনারসে একবার নির্মল বাবুর বাসায় শুইয়া আছি। বাহিরে দেখি কি দুইটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদের অন্য রাস্তায় যাইতে বলিলে, তাহারা চলিয়া গেল। যাহারা সামনে ছিল, তাহাদের বলিয়া উঠিলাম - দুইটি মূর্তি। পরের দিন সাহবাগে যেই দিকে তাহারা গিয়াছিল, সেই দিকে জ্বর ও বসন্ত দেখা দিল। এইরূপ অনেক সময় তাহারা যখন আসে তখন তোমাদের মত পরিষ্কার তাহাদিগকে দেখা যায়। যদি খেয়াল হয় তাহা হইলেই উহাদের সঙ্গে এ জাতীয় কথা হয়, নতুবা উহারা আপন স্বভাবে কাজ করিয়া যায়।

পূর্ণকুম্ভে হরিদ্বারে যাইবার আয়োজন

জ্যোতিষের ব্যারামের পূর্বে সে বলিয়াছিল - এইবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। আপনারা যাইবেন। বলিলাম - আচ্ছা। সময় আসিলে হরিদ্বার যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল, প্রায় ২০/২১ জন সহযাত্রী হইল। জ্যোতিষ শয্যাশায়ী, কাজেই তাহার যাওয়া হইল না।

রাজেন্দ্র কুশারী ভোলানাথের গ্রামের লোক ও বাল্য বন্ধু। সে কুন্ডুদের বাড়িতে চাকুরী করে। যোগেন্দ্র কুন্ডুকে একবার সে সাহবাগ নিয়া আসিয়াছিল। তখন কথা হইয়াছিল যে হরিদ্বার যদি যাওয়া হয় তখন কলিকাতায় তাহার বাসায় উঠিব। কলিকাতায় গিযা সেই বাডিতে উঠিলাম।

সে সময়ে শরীরের অস্বাভাবিক ভাবগুলি বিশেষরূপে দেখা যাইত। সব সময় যেন একটি ভাববিহ্বলতা। কখনো কোথাও সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বা নামিতে খেয়াল করিয়া ধাপে ধাপে পা দিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহাতে আরো যেন কেমন হইয়া যাইত। পলকশূন্য অবস্থায় বা কখনো চক্ষু বুজিয়া শরীর ঢলিয়া পড়িয়া যাইত। একটু পরে আবার ঠিক হইত।

সাধকের দিক দিয়া এই কথা যে যখন সাধক আপন ভাবে আপনি তন্ময় হইয়া পড়ে, তখন তাহার জপ, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি আর, কোথায়? সে সর্বক্ষণ এক মহানভাবে খেলিয়া বেড়ায়। কখনো কখনো কেহ কেহ নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সাধারণের ভিতর অসাধারণ, বা অসাধারণেব ভিতর সাধারণ ভাবে লক্ষ্য কবিযা ছুটিতে পারে। তখন প্রথমত - তাহার ভাবোন্মাদনার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, পরে শরীর অচল, অটল স্থির হইয়া যায। সাধকেব এইরূপ একটানা অবস্থায় শরীর পর্যন্ত ভাবে তদনুরূপ করিয়া লয়। এ শবীর তখন কি এক ভাবে চলিতেছিল। এখানে কাহারো ইচ্ছা অনিচ্ছার স্থান নাই।

কলিকাতায় মা

ঢাকা নবাব বাড়ির প্যারীবানু কলিকাতায় থাকে। তাহার বাড়িতে একদিন কীর্তন হইল। আমরা সন্ধ্যায় সেখানে গেলাম। তাহার বড় হল ঘরে অনেক লোক, অনেক মেয়েরাও ছিল। শরীরের টলমল ভাব। কীর্তনের অবস্থাদি প্রকাশ পাইল। প্যারীবানু এবং তাহার ছেলেমেয়ের খুব আনন্দ ও উৎসাহ। প্যারীবানু হরিবোল করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছিল।

তাহার বাড়িতে পরে আরো কীর্তন হয়, তখন সেখানে সি আর দাশের স্ত্রী (বাসন্তী দেবী) ও মেয়ে (অপর্ণা দেবী) আসিযাছিলন। সি. আব দাশের স্ত্রী নাকি পূর্বে এ শরীরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল। সে এতদিন খুঁজিযা পায নাই যে কাহাকে দেখিয়াছিল। সেইদিন এ শবীরকে দেখিয়া তাহার স্বপ্নের কথা বলিল ও নানা সৎ আলোচনা করিল।

হৃষীকেশে জ্যোতিষের অসুস্থতার সংবাদ

বেনারস গিয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ি উঠিলাম। পবে হরিদ্বারে গিয়া ৭ দিন কাটাইয়া হৃষীকেশ গেলাম। হৃশীকেশে মোটর হইতে নামিযাছি, এমন সময দেখি দু'খানি

টেলিগ্রাম, একখানিতে জানা গেল সীতানাথ কুশারীর অবস্থা খারাপ, আর একখানিতে নিরঞ্জন লিখিয়াছে যে জ্যোতিষ বিশেষ অসুস্থ। আমরা তখন কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায়। সেইখানে ঘরের ভিতর বসিয়া দেখি কি জ্যোতিষ ছোট ছেলের মত ভাব, এ শরীর যেন তাহাকে কোলে নিয়া বসিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী আমার নিকটে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। এই কথা ভোলানাথকে জানাইলাম। ভোলানাথ তার পাইয়া খুব ব্যস্ত হইয়াছিল। তখন কথা হইল যে জ্যোতিষ মরিতে পারে না। ভোলানাথকে বলিলাম এ সম্বন্ধে কাহারো সহিত উপস্থিত কোন আলাপের দরকার নাই।

পরদিন হরিদ্বার ফিরিলাম। শশাঙ্কবাবুকে বলিলাম - পূর্ণ কুম্ভের মাত্র প্রথম স্নান হইল। তুমি ও খুকুনী থাক। আমরা চলিয়া যাই। তাহারা বলিল - আমরা কুম্ভে আসি নাই, তোমার সঙ্গে থাকাই উদ্দেশ্য। শশাঙ্কবাবুর এক ফাঁড়া ছিল এবং তাহাকে এক সাধু কি কাজ করিতে বলিয়াছিল। বলিলাম - তোমার সে কাজটি এখানে গঙ্গার পাড়ে সম্পন্ন কর।

পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক দিনের ভিতর ঢাকা পৌঁছিলাম। তখনো জ্যোতিষ শয্যাগত। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তাহার ব্যারামেব প্রথম অবস্থায় যখন তাহাকে দেখিতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছেল, তখন নিবঞ্জনকে বলিয়াছিলাম, একতলা বাসা হইলে তাহাকে দেখিতে যাইব। আমরা হরিদ্বাব যাইবার পূর্বে তাহাকে সাহবাগের খুব নিকট একটি সরকারী একতলা বাসাতে লইয়া আসে এবং আমরা তাহাকে তথায় দেখিতে গিয়াছিলাম।

একদিন জ্যোতিষের দাদা বলিল - যাহা হইবার হইয়াছে, এখন জ্যোতিষ আপনার নামে আছে। তাহাকে রক্ষা করুন, আমরা আপনার উপর তাহাকে রাখিয়াছি। তাহার শ্বাশুড়ীও আসিয়াছিল। সে ফিরিবার সময় এ শরীরকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল - আমি আপনার হাতে তাহাকে দিয়া গেলাম। আপনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। আমি আর কিছু জানি না। তখন এ শরীরের খেয়ালে একটি ভাব হইয়াছিল যে সে নিশ্চয় ভাল হইবে তবে সে আর বেশিদিন সংসারী ভাবে থাকিবে না।

আমরা ফিরিয়া গেলে, তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতাম এবং তাহার জন্য প্রসাদ পাঠান হইত। জ্যোতিষের স্ত্রীও কখনও কখনও সাহবাগে দেখা কবিতে আসিত ও যখন যাহা খবরাদি দিত।

শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে মনসা পূজায়

শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে মনসা পূজায় তিন দিন ব্যাপী উৎসব আরম্ভ হইযাছে। আমবা আগাগোডা সেইখানে। তাহার গুরুদেব পূজা করিয়াছিলেন। পূজায় বলির সময পাঁঠাটির কানও কতকটা কাটা যায়। ইতিমধ্যে কে আসিয়া বলিল জ্যোতিষবাবুকে দেখিয়া আসিলাম। বিশেষ অসুস্থ আপনাদেব দেখিতে চায়। ভোলানাথ শুনিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমাকে বলিল - চল। আমি বলিলাম - তুমি যাও, আমি যাইব না। অনেক পীড়াপীড়ি কবিলে বলিলাম - তবে আমি তাহার বাসার ভিতরে যাইব না। তাহাই করিলাম।

সেইখান হইতে শশাঙ্কবাবুর বাসায় ফিবিয়া আসিয়া পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম - কান কাটা যাওয়াতে বলির অঙ্গহানি হইল না ত? সে বলিল - আমরা ত শাস্ত্রে পাই নাই। আমি বলিলাম - এক সঙ্গে দুই অঙ্গ কাটা গেলে আমার খেয়াল হয় যে অঙ্গহানি হয়।

সেইখানে ৩/৪ দিন থাকিয়া পূজার পর আমাদের সাহবাগ যাওয়া স্থির হইল। যাওয়ার জন্য শশাঙ্কবাবু এক মোটব আনিল। ইহার কিছু সময় পূর্ব হইতে অর্থাৎ দেবী বিসর্জনের পরে শরীবে কেমন একটা ভাব। তাহাদের উপরের ঘরে যাইয়া পড়িযা আছি। পূজার তিন দিনও পূজাব কাছে কতক্ষণ বসিয়া পরে শরীরটা পড়িয়াই থাকিত। কিছুক্ষণ পরে উঠিত। সেইদিন উপরে শুইয়া আছি ইহার মধ্যে যাইবার জন্য ভোলানাথ আমাকে উঠাইলেন। সর্ব শরীর অবশ। দাঁড়াইলাম, কিন্তু যেন চলিতে পারি না। ভোলানাথ তাড়াতাড়ি করিতেছেন, সেইজন্য আমাকে ধরিয়া ধরিয়া উপর হইতে নামাইতেছে। গা ছাড়া অবস্থা। ২/৩ সিঁড়ি দূর দূর যাইয়া পা পড়ে, নিয়মে পডে না। এইভাবে সিঁড়ি দিয়া চলিতে চলিতে, দুই পা কেমন হইয়া ঘুরিযা ৩/৪ ধাপ নীচে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। অমনি উঠিয়াই অনেকটা হাঁটিয়া মোটরে গিযা উঠিলাম। সাহবাগে নেশাখোরের মত অবশ ভাবে পৌঁছিলাম।

ঐ অবস্থায যে ঘবে থাকি, সে ঘরে দরজা পাব হওযার জন্য পা উঠাইয়াছি, খেয়াল হইতেছে যেন বাম পায়ের হাড়গুলি খণ্ড খণ্ড ভাঙিযা একটি থলিতে ঝুলাইযা মাটিতে রাখিলে যেইরূপ হয - পা খানি ঠিক ঐ বকমে মাটিতে পড়িল। বলিয়া উঠিলাম বাম পায়ে কিছু হইয়াছে। পরে পায়ে একটা ঝাঁকি দিলাম এবং পূর্বের মত এলান ভাবে মাটিতে শরীরটা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ আমাকে

ধরিয়া বিছানায় শোয়াইল এবং পায়ে ভিজা কাপড় বাঁধিয়া রাখিল। সকলে চলিয়া গেলে আমি উঠিয়া কতক্ষণ বেশ হাঁটিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। তখন বেলা ১০/১১টা হইবে। ৪/৫টার সময় উঠিলাম, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছি, এমন সময় খেয়াল হইল যে পায়ে খুব ব্যথা লাগিতেছে। সকলে ভাল করিয়া দেখিল ও বলিল - পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে। পা খানি ফুলিয়া পায়ের নীচটা নীল হইয়া গিয়াছে। তাহারা হাড় ভাঙ্গা পাতা দিয়া পাটি বাঁধিয়া রাখিল।

সেইদিন অমাবস্যার ভোগ, অনেকে আসিয়াছে। এ শরীর বেশ হাসিতেছে, আলাপাদি করিতেছে। আমি বলিলাম - ৭ দিন এ বিছানা হইতে নামিব না। সেইভাবেই চলিতেছে। ইহার মধ্যে ডাক্তার কি ঔষধ দিতে লাগিল, দেখা গেল না কমিয়া আরো ফুলিয়া গেল। তখন বলিলাম যত ঔষধ বোতলে আছে সব এক সঙ্গে ঢালিয়া এখনই শেষ কর। তাহাই করিল। আমি ৭ দিন বিছানায় বসিয়া, শুইয়া, দাঁড়াইয়া কাটাইলাম। ৭ দিন পরে ফুলা কমিয়া গেল।

দেখিতাম, যখন পা ভাঙ্গিয়াছে খেয়াল হইত, তখনই খোঁড়াইয়া চলিতাম, আবার যখন সে খেয়াল থাকিত না, তখন বেশ ভাল করিয়া হাঁটিতে পারিতাম। **ইহাতে বুঝিবে শরীর-জ্ঞানই যত দুঃখের কারণ।** পা ভাঙ্গিবার কারণ সম্বন্ধে কাহারো কাহারো ধারণা হইয়াছিল যে বলির অঙ্গহানির দোষটা মায়ের উপর দিয়াই কাটাইয়া নিলেন।

হীরালালের ফাঁড়া

একদিন হীরালাল নামে একটি ছেলে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে জানাইল যে জ্যোতিষী বলিয়াছে তাহার ফাঁড়া আছে। তখন হঠাৎ এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইল - তোমার ত নিকটেই ফাঁড়া। সে বলিল - তবে আমি কি করিব? এ শরীর বলিল - তুমি মাঝে মাঝে এখানে আসিও। কয়েকদিন ধরিয়া সে আসা যাওয়া করে। একদিন অমাবস্যায় সে আসিয়াছে এ শরীর হঠাৎ খুকুনীকে বলিল একটু আগুন আন্। আগুন আনিলে আমার হাতে দিতে বলিলাম। সে 'না' বলিয়া আগুন সরাইয়া নিল। তখন হীরালালকে একটি দেশলাই জ্বালিতে বলিলাম। সে জ্বালাইয়া আমার হাতে দিল এবং উহা যতক্ষণ জ্বলিয়াছিল ততক্ষণ হাতের একটি আঙ্গুল সে আগুনে ধরিয়া রাখিলাম। হীরালাল ব্যস্ত হইয়া বলিল - মা! এ কি করিতেছেন? বলিলাম - তোমার ফাঁড়া কাটিল। সে পোড়া ঘা শুকাইতে প্রায় একমাস লাগিল।

ইহাব মধ্যে আরো এক কথা আছে। একটি লোকের ভযানক অসুখ, শেষ সময় এ শরীরকে নিয়া গিয়াছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাওয়াব পূর্বেই খুকুনীকে আগুন আনিতে বলিয়াছিলাম এইজন্য যে মৃতের সৎকার হওয়াব পূর্বেই আগুন স্পর্শ করিতে হইবে। একই ত। খুকুনী আগুন আনিযা পিতার কথায় ফিরাইযা নিবার পর হীরালাল আসিল। তাহার দ্বারা শরীরে আগুন স্পর্শ করান হইল। ইহাতে হীরালালেরও ফাঁড়া কাঁটিল, পূর্বোক্ত কথাও বহিল।

মা'র আদেশ না পালনে বিপত্তি

কথা প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন - একদিন সন্ধ্যার সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল - মা! আমি গাড়ি আনিয়াছি, আমার বাড়িতে যাইতেই হইবে। এ শবীর নাচঘরে হাঁটিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই খেয়াল হইল যে আমি দূরে সরিয়া থাকি, তাহার সহিত যেন কথা না হয। সে বার বাব যাইবার কথা বলে, আর এ শরীর চুপ হইয়া যায়। একবার মুখ দিয়া বাহির হয় - 'না'। সে বেগতিক দেখিয়া ভোলানাথকে যাইয়া ধরিল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল - কেন নিতে চাও বল ত দেখি। তখন সে বলিল যে তাহার বড ছেলের অসুখ। ডাক্তারেরা বলিয়াছে রোগ ভাল নয়। তাই মাকে নিয়া একবার দেখাইব। এই ভরসায় আসিয়াছি। ভোলানাথ আসিযা সব জানাইলে এ শবীর বলিয়া উঠিল - সে ভাল হইবে না। ভোলানাথ চুপ হইয়া গেল এবং বলিল - এই কথা তাহাকে কি করিযা বলি? এখন কি করা যায়। সে ত না নিয়া কিছুতেই ছাডিবে না। সে সময় জ্যোতিষও নিকটে ছিল। সেই বলিল এখন কি উপায়? এ শরীর বলিল - আচ্ছা তবে চল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়াল আসিল যে ছেলেটির মৃত্যুর পূর্বে এ শরীরের সঙ্গে দেখা নির্দিষ্ট আছে ও এ শরীরেব স্পর্শে তাহার আগ্রহ বহিয়াছে। **যেখানে মৃত্যু, সেখানেও ত এক আমিই আছি। জন্ম মৃত্যুর কোন প্রশ্ন ত এখানে নাই।** জন্ম মৃত্যু কি? কাপড় বদলানো মাত্র, আবার ইহাও মনে করিতে পার অন্য ঘরে যাওয়া মাত্র। মানুষের অজ্ঞান পর্দায় ইহা বুঝিতে দেয় না। সে ভাল হইবে না বলিযা কেন যাইব না।

এ শরীর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। ভাল হইবে না শুনিতে পাইয়া ভোলানাথ আর যাইতে চাহে না। পরে তাহারা কি বলিবে, যাওয়া ঠিক কিনা ইত্যাদি জ্যোতিষের সঙ্গে আলোচনা করিতেছে। জ্যোতিষ বলিল - মা যখন যাইবেন বলিয়াছেন, তখন তিনি যাইবেনই। পরে ভোলানাথ ও আমি গাড়িতে উঠিলাম।

কোথা হইতে ২/৩ টি কুকুর আসিয়া গাড়ির সামনে ঘেউ ঘেউ করে। ঘোড়া আর চলে না। যাই হোক, আমরা গিয়া দেখিয়া আসিলাম।

ক্রমে ক্রমে ব্যারাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার মা একদিন গাড়ি নিয়া আসিয়া বলে - ছেলের অবস্থা খুব খারাপ, তোমাকে দেখিতে চায়। তোমাকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ও ভোলানাথ গেলাম। দুয়ারে পা দিতেই কেহ আসিযা নমস্কার করিল। তখন কেহ নমস্কার করিলে এ শরীরের ভাব বদলাইয়া যাইত। ফিরিয়া এ শরীর নমস্কার করিত। দরজায় এ অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম ও পরে উঠিয়া ছেলের কাছে গেলাম। তাহার মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল - তোমাকে যাইতে দিব না। তুমি একটা কিছু বলিয়া যাও, আমরা নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব। আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তোমাকে বলিতেই হইবে, ইত্যাদি। ভোলানাথও জোর দিতে লাগিল। তখন মুখ হইতে বাহির হইল - এ শরীর যাহা বলে তোমরা করিবে? পারিবে ত? আচ্ছা, দেখ আজ হইতে ১৮ দিন পর্যন্ত তাহাকে এ বিছানা হইতে উঠিতে দিও না। ইহা তুমি মনে করিয়া রাখিতে পারিবে ত? সে খুব শান্ত চিত্তে এ কথা মাথা পাতিয়া নিল। আসার সময় ছেলেটি খুব কাঁদিল ও বলিল - মা! শরীরের কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমি মরি আর বাঁচি - শান্তি চাই।

পরে শুনিলাম ছেলেটির অসুখ একটু একটু করিয়া কমিতেছে। প্রায়ই আমাদিগকে খবর দেয়। ইহার মধ্যে একদিন আসিয়া বলে - মা! আস্তে আস্তে বেশ ভাল হইতেছিল আবার কেন খারাপ দেখিতেছি। এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল - সোমবার দিন নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে। ১৮ দিনের দিন প্রাতে ছেলেটি মারা গেল। সে বলে যে আমার ছেলে মরিতে পারে না। আমি মায়ের আদেশ পালন করিয়াছি। তোমরা তাহাকে শ্মশানে নিও না, এইসব বলিতে বলিতে সে সাহবাগে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল। এই শরীরের শেষ রাত্রি ৪টা হইতেই কেবলই অবসন্ন ভাব। উঠিতেই চায় না। সে আসিয়া কত কান্নাকাটি করিতেছে। ভোলানাথ আমাকে জাগাইবার কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন সাড়া পাইল না। পরে তাহার বাসা হইতে লোক আসিয়া বলিল - মৃতদেহ নিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়, সৎকার আবশ্যক ও তাহাকে জোব করিয়া লইয়া গেল। ইহার পর শোকে দুঃখে সে একেবারে অস্থিব হইয়া গেল। সকলকে বলিত - মা'র কথা ঠিক নয়। তোমরা মা'র কাছে কেহ যাইও না।

২/১ মাস চলিয়া গেল। সে একদিন আসিয়া বলে - মা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কথা বাস্তবিক রক্ষা হয় নাই, তাহাতেই আমাব কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমি ১৮ দিনের মধ্যে এক সোমবার নীচের তলায গিয়াছিলাম। তাহার কাছে আর কেহই ছিল না। তখন উপর হইতে সে আমাকে ডাকিয়া বলে ঐ ছাদের কাঠগুলি শুকাইয়াছে এগুলি নামাইয়া ঘরে নাও। সেই ছাদটি তাহার বিছানায় বসিয়া দেখা যায় না। সে কথা শুনিয়া তাহাই করিযাছিলাম, কিন্তু কোথা হইতে যে সে কাঠ দেখিল, এ খেয়াল তখন আর মাথায় আসে নাই। এখন সে ঘটনা মনে হইয়াছে। তুমি ত মা কৃপা করিয়াছিলে, আমার দুর্ভোগ আছে কি কবিব? এই বলিযা কাঁদিতে লাগিল।

রোগ সারানোর খেয়াল

কোন সময় হাজার মাথা কুটিয়া কেহ কোন কথা বলিলে কানেও যাইত না। এ শরীরের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিত - শুনিতেছ কি না বল? আমি দেখিতাম যে কথা শুনিয়া আমার খেয়ালে থাকিত, আমার শরীব দিযাই হউক বা অন্য কোন রকমেই হউক তাহার ব্যবস্থা হইযাই যাইত। ঐ সময় এ খেয়াল হইতে, ইহা এ শবীরেব করণীয় করিতেই হইবে। বাহিবে মোটেই ইহাব প্রকাশ হইত না। এইরূপে যে কত লোক, পশুপাখী, গাছপালার সঙ্গেও খেলা হইযাছিল তাহার ইযত্তা নাই। আবার কোন সময় কাহাবও উপর কোন রোগপীড়া ইত্যাদি না নিয়াও রোগাদি সারান হইত।

সাহবাগে যখন ছিলাম তখন একদিন সন্ধ্যায শশাঙ্কবাবুর গাড়িতে বাহিবে যাইতেছি। রাস্তায় কি এক খেয়াল হইল জ্যোতিষের বাসায় যাইব। সে তখন সাহবাগের নিকট পীড়িত অবস্থায এক বাড়িতে আছে। প্রাতেও সেখানে গিয়াছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার ঘরে বেগে প্রবেশ করিলাম। ভোলানাথ ও শশাঙ্কবাবু পিছনে পিছনে আসিল। আমার বসার বা কথা বলিবার কোন ভাব নাই। কেমন এক অস্বাভাবিক শরীরের গতিতে যাইয়া সে ঘরের কোণাতে একটি টেবিলে কতগুলি চাঁপা ও গোলাপফুল ছিল, তাহাতে হাত দিয়া দুটি ফুল নিলাম এবং সামান্য একটু দাঁড়াইযা আবার বাহিব হইযা আসিলাম। সেখানে হইতে ধানকোড়ার দীনেশবাবুর বাড়ি গেলাম। সেখানে পৌঁছিলেই পানুবাবুর স্ত্রী নমস্কার করিতে আসিল, তাহার হাতে একটি ফুল দিলাম। আর একটি হাতে রাখিলাম।

কীর্তনাদির পর বনমালী বাক্‌চির বাসায় এ শরীরকে লইয়া গেল। সেই বাড়িতে তাহার স্ত্রীর খুব অসুখ ছিল। সকলের অজ্ঞাতে ঐ ফুলটি রোগীর বিছানায় রাখিয়া দিলাম। যেইদিন ইহা করা হইয়াছিল সেইদিন রোগিণী অতি কষ্টে উঠিয়া এই শরীরের খাওয়ার জন্য কিছু রান্না করিয়াছিল। পরে শুনিলাম সে ভাল হইয়া গিয়াছে।

ঐ সময় সূক্ষ্মতঃ অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যাহাকে দেখি নাই তাহার অসুখ, অশান্তি মুখে জানিয়া খেয়ালে রহিয়াছে এবং সে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সময়ে আবার রোগীর রোগমুক্তি - কাহাকে ভোগ করাইয়া বা নিজে ভোগ করিয়া বা খেয়াল হইলেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া যাইত। খেয়াল হউক বা না হউক কেহ বলিয়া গেলেও রোগমুক্ত হইয়া যাইত। কোন সময় আবাব, কেহ জানায় নাই, বলে নাই, আবার জাগতিকভাবে কাহাবও সহিত চেনা জানা নাই, রোগমুক্ত, বিপদমুক্তির কারণ এই শরীরটা হইয়া দাঁড়াইত। যে কোন উপলক্ষ্য এই শরীরটা নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইত। অথচ এমন ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহার রোগমুক্ত হইয়াছে, তাহারা হয়ত এই শরীরকে জাগতিক হিসাবে জানে না। ভোলানাথ কাহারও কথা শুনিলে বলিত - আমি উহাদের বলি? এ শরীরের উহাদের জানাইবার ভাবটি তখন আসিত না। তাই নিষেধ করা হইত। আপনা হইতেই হইয়া যাইত। আমি, আমার স্থানে বসিয়া, তাহাকে তাহার ঘরে গিয়া যেন স্পর্শ করিতেছি বা দেখিতেছি, এইরূপ খেয়াল হইত।

মার জবাব

ঢাকায় প্রথম প্রথম যখন জাগতিক ও পারমার্থিক বিষয়াদি নিয়া লোকজন আসিত, তখন জবাব দিবার হইলে আপনা হইতেই বাহির হইয়া যাইত। নতুবা তাহাদের চেষ্টায় কিছুই হইত না। এমনও হইত যে মুখ হইতে বাহির হইবে বা কিছু করিতে যাইব, অমনিই কোন একটি অন্তরায়রূপ বিঘ্ন আসিয়া জুটিয়াছে।

মনুর সর্পাঘাত যোগ

কুঞ্জবাবু তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ ছোট মেয়ের বিবাহ দিতে ঢাকা আসে। বেনারস ফিরিবার সময় কুঞ্জবাবুর স্ত্রী বলে দেখ মা - আমার ছেলে মনুর সর্পাঘাতে বা দণ্ডাঘাতে মৃত্যু বলিয়া কুষ্ঠিতে আছে। এই ফাঁড়া নিকটবর্তী। আমি

তাহাকে তোমার কাছে রাখিয়া যাইব। এ শরীর বলিল - তুমি তাহাকে নিয়া যাও। অনেক পীড়াপীড়ি করিল। পরে 'না' বলাতে লইয়া গেল।

শরীরের ঘুরিবার খেয়াল

কিছুদিন পর এ শরীরের খেয়াল হইল এখানে উপস্থিত কাহাকেও না জানাইয়া কিছু দূর ঘুরিতে যাইব। একদিন সন্ধ্যায় জ্যোতিষের বাসায় গেলাম। সে শয্যাশায়ী, বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। ভোলানাথকে দেখাইয়া তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলাম - নমস্কার কর, নমস্কাব কর। সে অতিকষ্টে উঠিয়া নমস্কাব করিল। সাহবাগ হইতে প্রত্যহ তাহার জন্য প্রসাদ পাঠান হইত। সেইদিন কতকগুলি কিসমিস্ হাতে ছুঁইযা তাহাকে দিলাম, বলিলাম - ইহা হইতে তুমি প্রতিদিন নিও। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, কেহই ঠিক বুঝিল না কি জন্য এইসব হইতেছে। এ শরীরের এইসব খেয়ালী ভাব সকলেই জানিত। কিন্তু জ্যোতিষ চুপ হইয়া মুখখানি মলিন করিয়া আদ্যোপান্ত লক্ষ্য করিযাছিল। কিছু বলিল না।

সেখান হইতে শশাঙ্কবাবুর ও বাউলের বাড়ি হইয়া সাহবাগে আসা হইল। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় শশাঙ্কবাবু আসিয়া উপস্থিত ও বলিল - কি জানি কেন, আমাদের প্রাণ কাঁপিতেছে। আমরা না মাকে হারাই। আসিবার সময় সাহবাগের গেট বন্ধ বলিযা দেওয়াতে পার হইয়া আসিতে এই পাযে ময়লা লাগিয়াছে, তাই ঘরের ভিতরে আসিতে পারি না, তাহা না হইলে আজ এখানেই পড়িয়া থাকিতাম। এখন বাসায় যাইয়া স্নান করিতে হইবে। আমাকে এই রকম করিয়া এত রাত্রে সরাইয়া দেওয়া ইহাও বোধ হয় মায়েব ইচ্ছা। বাস্তবিক কি তোমরা কোথাও যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ?

এ শরীর বলিল - গেলে ত তোমরা জানিতেই পারিবে। তখন সে আবার বলিল - তোমরা চলিয়া গেলে জানিব ত? বলিলাম - জানিবে। সে বাসায় চলিয়া গেল। আমরা শুইয়া পড়িলাম।

উঠিয়া দেখি বেশ ফর্‌সা হইয়াছে। ভোলানাথ বলিল - এখন বাহির হইতে সকলেই দেখিবে। বলিলাম - চল ত বাহির হই। যদি কেহ বাস্তায় দেখে, যাইব না। এই বলিয়া উভয়ে বাহির হইতে দেখি কমলাকান্ত ঘরের দরজার সামনে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। গেটের দারওয়ানও দরজা খুলিয়া দিয়া কোথায় গিয়াছে। জ্যোতিষ প্রায়ই ভোরে উঠিয়া তাহার ঘবেব বারান্দায় বসিত, সেখান হইতে বড়

রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়। সেইদিন দেখিলাম তাহার বাড়িও কাহারো সাড়া শব্দ নাই। ঘরের দরজা বন্ধ। আমরা স্টেশনে গেলাম। দেখি গাড়ি তৈয়ার। নিশিবাবুর ছেলে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিল, সে টিকিট আনিযা দিল। নারায়ণগঞ্জ গেলাম। সেখান হইতে কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতা গেলাম। জ্যোতিষ ইতিমধ্যে সপরিবারে হাওয়া পরিবর্তনে যাইবে বলিয়া কলিকাতা গিয়াছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে এইরূপ না জানাইয়া আসিয়াছি বলিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিল। বলিল - আপনারা চলিয়া আসাতে ঢাকা আর ভাল লাগে না, তাই চলিয়া আসিয়াছি। তাহারা বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেল।

আমরা পরে দেওঘরে গেলাম। বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন । তথা হইতে বিন্ধ্যাচল যাইব ঠিক হইল। বেনারসে এ খবর পাইয়া কুঞ্জবাবুর স্ত্রী দুইটি ছোট ছোট ছেলে ও দুইটি মেয়ে লইয়া মোগলসরাইতে আমাদের গাড়িতে উঠিল। আমরা বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের উপর বাংলোয় উঠিলাম। জ্যোতিষ নীচে ছিল। পাহাড়ের উপব উঠিবার পূর্বে তাহাকে দেখিয়া গেলাম। বিন্ধ্যাচলে অষ্টভূজা প্রভৃতি দেবতা ঘুরিয়া ঘুবিয়া আমাকে দেখাইবে বলিয়া ছেলেমেয়েদের আকাঙ্খা।

একদিন প্রাতে সকলে বাসা হইতে বাহিব হইলাম। বাস্তায় আমাদের পিছনে আরও একদল জুটিল। অষ্টভূজা দেখিলাম। সঙ্গীরা বলিল ঐখানে একটি কুণ্ড আছে তাহাকে সীতাকুণ্ড বলে। সে রাস্তা হইয়া কালীখো যাইব। আমি খুব জোরে যাইতেছি, পথের লতার ভিতর দিয়া সরু রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। ইহার মধ্যে দেখি, পায়ের তলায় কি রকম বোধ হইতেছে। ৪/৫ হাত দূরে যাইয়া পিছনে ফিরিয়া দেখি পাথরের উপর একটি সাপ ফণা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। ইহার মধ্যে আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম - তোমরা এখন আসিও না। দাঁড়াও। ভোলানাথ বলিল - কি হইয়াছে? দেখিল একটি সাপ। জিজ্ঞাসা করিল - কামড়াইয়াছে নাকি? তাঁহার হাতে লাঠি ছিল। মারিতে উদ্যত হওয়াতে না করিলাম। কিছুক্ষণ সাপটি আমার দিকে তাকাইল, আমিও তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পরে সাপটি ভোলানাথের দিকে ফিরিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। সাপটির ভাব ও দৃষ্টি দেখিযা সকলে অবাক হইল।

আমরা রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, কুঞ্জবাবুর ছোট ছেলেব তখন বয়স ৬/৭ বছর ছিল। তাহার মাকে দৌড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল - দাদার যে সাপে কাটার ফাঁড়া

ছিল, তাহা আজ মা কাটাইযা দিলেন।[১৬] তখন তাহার মা'বও খেয়াল হইল। হিসাব কবিয়া দেখিল, কোষ্ঠীতে এই সময়ে তাহার বিপদ লিখা আছে।

আমরা বেশ চলিযাছি। ভোলানাথ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে - পায়ে সাপে কামড়াইযাছে নাকি। আমি হাসি আর হাঁটি। ইতিমধ্যে পা উঠাইযা একবার দেখিলাম। যে পাটি সাপের গায়ে পড়িয়াছিল, সেই পাটি উরু পর্যন্ত শিহরিযা উঠিতেছে। তখন আবার চলিতে লাগিলাম। কাহাকেও এ শরীরের বিষয় বলার ভাব হইল না।

সেখান হইতে বাসায় গিয়া বলিলাম - আজ ভাত খাইব। তোমরা রান্না কর। আমরা সেখান হইতে পাহাডেব নীচে জ্যোতিষেব বাসায গেলাম। ভোলানাথ তাহাকে বলিল - দেখ। তোমাব মা সাপেব গাযে পা দিযাছে। কামডাইযাছে কিনা জানি না। সে তাড়াতাড়ি কিছু স্পিরিট আনিযা আমাব পায়েব তলায় দিল। যে পায়ে সাপে কাটিয়াছিল, ভাবের খেয়ালে অন্য পায়ে ঢালিয়া দিল। তখন এ শরীর হাসিতেছে ও বলিতেছে - এইসব দিও না। কিছু দবকার নাই। পরে পাহাডেব উপর আসিয়া ভাত খাইতে বসিলাম। সে সময এ শরীব দু বেলা সামান্য ফলাদি খাইত, অনেক দিনের পর ভাত খাইতেছে। ভোলানাথ খাওযাইয়া দিতেছে। দেখা গেল, হাঁড়ির ডাল, ভাত, তরকাবি শেষ হইযাছে। এ শরীর আবো খাইব, আরো খাইব করিতেছে, আর বলিতেছে - আমারে খাইল সাপ, আর আমি খাই ভাত। তাড়াতাড়ি আবার খিচুড়ি রান্না করিল এবং আমাকে খাওয়াইল। শেষে তাহাদের বলিলাম - দেখ, তোমবা খাইযা যাহা বাঁচিবে, পরে আবার খাইব। ভোলানাথের খাওয়া হইল, এ শরীর আবার খাইল। পবে পুনরায় রান্না করিয়া বাড়ির সকলে খাইল।

বিকালে পাহাড়ের নীচে আসিয়া এক জায়গায় বসিয়াছি, তখন ছেলেরা আসিয়া পায়ের নীচে দুটি নীল বড় সুচ ফোটানোর মত দাগ দেখিতে পাইল ও বলিল এই ত তোমার পায়ে সাপে কাটার দাগ।

এক বস্ত্রে ভ্রমণ

জ্যোতিষকে চুনাব যাইতে বলিলাম। কুঞ্জবাবুব পবিবাব বেনারস চলিযা গেলে, আমরাও চুনার গেলাম। তখন কি এক খেয়াল হইয়াছিল জ্যোতিষের

[১৬] আগষ্ট ১৯২৭।

বাসার কোন জিনিষ খাইব না। সেইজন্য তাহার খেয়ালে খাইলেও কতকটা টাকা তাহাকে দেওয়া হইত। সেও না করিত না। কিছুদিন চুনারে থাকিয়া, কোন স্থানের কথা তাহাদিগকে না বলিয়া আমরা ভরতপুর জয়পুরের দিকে গেলাম।[১৭] এ শরীরের ভাব হইয়াছিল যে কোথাও একবারে একান্তে একবস্ত্রে যাইয়া থাকিলে মন্দ কি। টাকা পয়সা কিছুই সঙ্গে রাখিবে না। জগৎ ভরাই ত আপনার জন। সঙ্গে টাকা জিনিষ পত্রের দরকার কি?[১৮] রাস্তায় বাহির হইলে দেখি ভোলানাথ নানা রকমে কষ্টবোধ করে এবং বলে মেয়ে মানুষ নিয়া একা এইভাবে আসা যাওয়া বড় কষ্টকর। তাহার খাওয়া দাওয়া এবং থাকারও অসুবিধা হয়। ইহা দেখিয়া বলিলাম - না, উপস্থিত একা চলা হইবে না। চল কলিকাতায়।

আমরা ফিরিবার সময় চুনার আসিলাম, জ্যোতিষের স্ত্রী ও মেয়ের সহিত কয়েকদিন আনন্দে কাটিল। জ্যোতিষের স্ত্রীর ভাবগুলি খুবই সরল, সোজা ও সুন্দর দেখিতাম। জ্যোতিষকে হাসিয়া হাসিয়া বলিতাম - তোমার চেয়েও মায়ের ভাব আমার নিকট বেশি সরল দেখায়। সে বলিত - আপনারও তাহাকে ভাল লাগে, সে ত দেখি আপনার দর্শনে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

ইহার মধ্যে ভোলানাথ একদিন দেখিল, আমি বসিয়া খুব মাথা চুলকাইতেছি এবং বলিল - দেখ না মাথায় কতকগুলি উকুন। তখন হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম - ইহারাত আপনা হইতে আসিয়া বাস করিতেছে। এখন কোথায় তাড়াইয়া দিব। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই পূরণ করি। জ্যোতিষের স্ত্রীকে যাইয়া বলিলাম - দেখ আমার মাথায় উকুন বাস করিতেছে। তখন মাথার চুল লম্বা ও বেশি ছিল। সে মাথা বেশ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া ও আঁচড়াইয়া দিল। সেই দিন হইতে উকুন চলিয়া গেল। পরে আমরা কলিকাতায় আসিলাম।

গিরিডিতে মা

আমরা কলিকাতা হইতে প্রথম বিন্ধ্যাচল পরে গিরিডি যাই। তখন জ্যোতিষ সেখানে অসুস্থ অবস্থায় ছিল। গিরিডিতে কিছুদিন থাকি ও পরেশনাথ পাহাড়

[১৭] সেপ্টেম্বব ১৯২৭ - সম্ভবতঃ শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী দক্ষিণ বাজস্থানে উদয়পুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

[১৮] যখন তীব্র বৈবাগ্য ভাব জাগে তখন সাংসাবিক প্রযোজনীয়তা লোপ পায এবং পবিব্রাজক হইয়া ভগবানেব উপব সম্পূর্ণ নির্ভবতা আসিযা আকাশবৃত্তি অবলম্বনে জীবন নির্বাহ করে।

দেখিয়া আসি। গিরিডিতে একটি নদী ছিল। একদিন সেখানে বেড়াইতে গিয়া দেখি একটি পাহাড়ী স্ত্রীলোক নদীর ধারে কাপড় কাচিতেছে। আমার কেমন এক ভাব হইল, তাহার কাপড় কাচিয়া দিব। আমি কাপড় লইতে চাহিলাম। সে মনে করিল, বোধ হয় পাগল, তাই ডাকিয়া বলিতে লাগিল - পাগল পাগল! সামলাও সামলাও! আমি কাপড় ছাড়িয়া দিযা তাহার নিকট বসিযা হাসিতেছি। তাহার ভাব যেন অন্য রকম হইয়া গেল। সে বলে - তুমি সর, না হইলে কাপড়ের জল তোমার গায়ে লাগিবে। তাহাকে বলিলাম - তুমি তোমাব কাজ কর। কাজের সময় বাজে কথা বলিতে নাই, বসিযা থাকিতে নাই। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়াই থাকে। তাহার কাপড় কাচা আর হয় না। আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরে আমি যখন উঠিয়া চলিয়া আসি, পিছন ফিরিয়া দেখি, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গে এই জাতীয় আরো অনেক খেলা ও কথাবার্তা হইল।

দশম অধ্যায়

মার শরীরে যোগ-বিভূতির প্রকাশ

বাসন্তী পূজার পর, শারদীয়া দুর্গাপূজায়[১] এ শরীরের এক খেয়াল হইল যে তিন দিন যাবৎ সূর্য উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাহারো সঙ্গে কথা বলিবে না। সাহবাগে সারাদিন নাচঘরের সংলগ্ন একটি কোঠায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রে সকলের সঙ্গে দেখা কবিত। এভাবে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পার হইল। দশমীর দিন ১০/১১ টার সময়ে নিকটে এক পুকুরে স্নান করিয়া থাকার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সে সময়ে নাচঘরে বহু লোক ছিল, এ শরীর যখন পুকুর হইতে স্নান করিয়া তাহাদের পাশ দিয়া ঘরে গেল, তখন এ শবীরকে কেহই দেখিতে পাইল না। পরে যখন স্নানেব কথা শুনিল, তখন জিজ্ঞাসা কবিল - কখন বাহির হইলে, কখন স্নান করিলে, কখনই বা আবাব ঘরে গেলে? তাহাদের বলিলাম - আমি ত যাইতে আসিতে তোমাদিগকে দেখিয়াছি। আমার যদি খেয়াল হইত যে আমাকে কেহ দেখিবে না, তাহা হইলে তাহাই হইত। কেহ কেহ আবাব বলিল তোমাকে কখন বড় দেখায়, কখন ছোট দেখায় - ইহার কারণ কি? এইসব যোগ-বিভূতি সাধকের ত হয়ই। এ শরীরের ত আপনা হইতে নিজের খেয়ালে খেলিয়া যায়।

দশমীর দিন সন্ধ্যার একটু পরে পুকুরে গিয়াছি, এমন সমযে কি খেযাল হইল জলে নামিয়া গেলাম, কেমন একটা ভাব হইল যে জল যেন আমায় ডাকিতেছে, পরে শরীরটা অবশ হইয়া গেল এবং সকলে ধরিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। এ ভাবটি কয়েকদিন চলিল। 'জলে ডাকে, জলে ডাকে' বলিয়া জলের কাছে চলিয়া যাইতাম। আগুন সম্বন্ধেও ঐরূপ হইত। আমিও জল ও আগুনের সঙ্গে সেই সেই রূপ হইয়া যাইতাম। গাছপালা, জীবজন্তু, যাহা কিছু দৃশ্যে আসে এবং কানে শুনি - এ শরীর রূপ গুণ নিয়া তাহাই।

[১] অক্টোবর ১৩-১৬, ১৯২৬।

একবার শশাঙ্কবাবুর গাড়িতে সিদ্ধেশ্বরী যাইতেছি, গাড়ির ভিতর অনেক লোক, মা এ শবীরকে কোলে নিয়া বসিল। খেয়াল হইল যে এ শবীবেব ভাব যেন তার গায়ে না লাগে। মাযেব কোলে বসিযাছিলাম। মা বাব বাবই বলে, তুমি যে বসিযাছ আমাব গায়েই লাগে না। আমি ত সেইরূপ কিছু বুঝি না। যখন গাড়ি হইতে নামিলাম, তখন ধপ্ করিয়া শরীবটা মাটিতে বসিযা পডিল। তখন আমি বলিলাম, পূর্বে যে লোক আকাশ মার্গে চলিতে পারিত, তাহার প্রমাণ এই। গাড়িতে যেমন একেবারে ভারশূন্য হইযা বসিয়াছিল। দেখ না ঘুড়িটি এত কাগজ ও বড় বড় কাঠি নিয়া কেমন শূন্যের উপরে ঘোরে। ঐ ক্রিযায সব সম্ভব।

সাধকের যখন স্বকীয় দেহভাব-রূপ বুদ্ধি পরিবর্তিত হইতে থাকে তখন সে দেখিতে পায় যে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নাই যাহাতে সে নাই। প্রথম প্রথম সে একটি লক্ষ্য ধরিয়া অর্থাৎ জল, আগুন, আকাশ, বাতাস, মাটি এ সবের কোন একটি নিয়া, এ ভাবটি খেলিতে পারে। তখন প্রথম দিকে তাহাকে কখনো কখনো অস্থির দেখা যাইতে পারে এবং কখনো স্থির, অটলও দেখা যাইতে পাবে। আবার এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে দেখিতে পায নিজেব ভিতরই ব্রহ্মাণ্ড, আবাব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সবটাতেই সে অক্ষুণ্ণভাবে - ইহাই প্রকাশ হয। আলাদা আলাদা দৃষ্টিব আর কোন প্রশ্ন থাকে না। ঐ আব কি। এইগুলিও কিন্তু বিশেষ কথা। এই শরীর যখন সাধনাব খেলাগুলি খেলিয়াছিল, এই সব ভাবগুলি স্বভাবতই ত প্রকাশ ছিল।

সাধকের যখন সব এক, একেরই বিভিন্ন মূর্তি এইরূপ ভাব জাগ্রত হয়, তখন আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক বা অসুখের কথা, তাহাব নিকট একই রূপে প্রতিভাত হয়। কর্ম ও যে তাঁহারই একরূপ, ইহা তাহার বোধ হয়। এ অবস্থায় সে যদি হুঁসিয়ার থাকিয়া পরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিতে পাবে, তাহার পতন হইবার আশঙ্কা। নানা রকমারি নিয়া শরীরটা খেলিয়াছে ত।

বাজিতপুর থাকিবার সময গাছের ডগা, তরকারি, ফলাদি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মানুষের সঙ্গে কথা বলিবার মত কথা বলিতাম - চল, এখন তোমার এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। তাহারা যেন জীবন্ত, এইরূপ ব্যবহাব হইত। কোন লোকজন কাছে থাকিলে মুখে কিছু বাহির হইত না।

গাছপালা লাগাইলে, তাহাদের এমনভাবে যত্ন কবিতাম, যেন মানুষের সেবা

করিতেছি। দেখিতাম সবজি ইত্যাদি যখন যাহা করিতাম, খুব সুন্দর হইত। **খেয়াল হইত - আমিই সৃষ্টি করিতেছি, আমিই স্থিতি করিতেছি, আমিই সব করিতেছি। এক আমাতেই আমি।**

এক দিন অমাবস্যায় নিরঞ্জনের বাড়িতে কীর্তন ও ভোগাদি হইল। কীর্তনে শরীরটা কেমন হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কীর্তন শেষ হইল। বহু লোক, ভোগ নিবেদন হইলে প্রসাদ নিবার জন্য সকলকে বসাইয়া দিতে বলিলাম। মথুরবাবু বলিল - মা! যাহা আয়োজন তাহাতে ত এত লোকের কুলাইবে না। তাহাকে বলা হইল - আগে তো একসঙ্গে বসাইয়া দাও। তখন শরীরের খেয়াল হইল যে যতক্ষণ পরিবেশন দেখিব ততক্ষণ কিছুতেই কম হইতে পারিবে না। পরে দেখা গেল সকলের খাওয়া হইলে আরো কিছু রহিয়া গেল।

সাহবাগে স্বতঃস্ফূর্ত নমাজ পাঠ

কলিকাতায় কয়দিন থাকিয়া ঢাকা গেলাম। সাহবাগে একদিন নাচঘরে কীর্তন হইতেছে ইহার ভিতর শরীরটা উঠিয়া কি এক অস্বাভাবিক ভাবে বাহিরের দিকে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে পিছনে পিছনে খোল করতাল সহ আসিল। জ্যোতিষ ও নিরঞ্জন একটি মুসলমানের[২] সঙ্গে একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল। আমি বরাবর সেখানে গেলাম। মুসলমানটির পিঠ স্পর্শ করিয়া চলিতে ইঙ্গিত করিয়া আমি আগে আগে চলিতে লাগিলাম, মুসলমানটিও আমার পিছু পিছু আসিল। অন্যরাও ছিল। বাগানের কিনারায় বড় কবরের নিকট গেলাম ও দরজা খুলিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমি ভিতরে গেলাম, মুসলমানটিও আমার সহিত গেল। যাইতেই দেখি মুখ দিয়া নানা শব্দাদি উচ্চ কণ্ঠে বাহির হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠা বসা, কানে হাত দেওয়া প্রভৃতি অঙ্গাদিরও নানাবিধ ক্রিয়াদি হইল। পরে শুনিলাম মুসলমানেরা নমাজ যেইরূপ করে, এ শরীরের ও সেইসব অনুষ্ঠানাদি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানটি তদনুসারে করিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম তাহাদের নাকি নিয়ম একজন নমাজ পড়িলে সঙ্গীদেরও পড়িতে হয়।

ঐখান হইতে আবার নাচঘরে ফিরিয়া আসিলাম। মুসলমানটিও আসিয়া কীর্তনে যোগ দিল। তাহাকে বলিলাম - ঐ কবরে সিন্নি দেওয়া হয়। আজ বোধ হয় সে লোকটি আসে নাই, তুমি দাও। সে সিন্নি নিবেদন করিল এবং আমাকে

[২] মৌলবি যেনউদ্দিন হুসেন

প্রসাদ স্বরূপ বাতাসা খাওয়াইয়া দিল। হরিলুট হইলে, সেও প্রসাদ পাইল। জ্যোতিষ বলিয়াছিল যে সে লোকটি গোঁড়া মুসলমান ছিল।

সাহবাগের মালিক প্যারীবানু ঢাকা আসিল। সাহবাগে আসিয়া কালী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া সে কালীর গলায় একটি সোনার কণ্ঠমালা দিয়া প্রণাম করিল। তাহার ছেলেমেয়ের বিবাহে এ শরীরকে ১০ গাছা সোনার চুড়ী পরাইয়া দিয়াছিল। ঢাকা থাকা কালীন সে কখন কখন সাহবাগে বেড়াইতে আসিত। একদিন সে ছেলে, বৌ, মেয়ে ও জামাই নিয়া গাছতলায় বসিয়া এ শরীরের রান্না পোলাও, তরকারি প্রভৃতি খাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল।

আর একদিন বলে - আপনি ত এই কবরে নমাজ পড়িয়াছেন, আজ আমাদিগকে দেখান। বড়ই আগ্রহ করিতে লাগিল। বলিলাম - এ শরীর ত তোমাদের মত ইচ্ছায় কিছু করে না, ভিতরে যাইতেছি। যদি হইবার হয় শুনিবে। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কেননা তাহাদেব ভিতব মেযেদেব কববে যাওয়া নিধেষ। এ শবীর ভিতরে গেলে পূর্বের মত মুখ দিযা আবো কি কি সব বাহিব হইল। প্যারীবানুর ছেলের বৌ কিছু কিছু বুঝিল এবং এক পুস্তকেব নাম কবিযা বলিল - যে ঐ পাঠেব সবই ইনি বলিযাছেন।

যোগ-বিভূতি ও স্বভাব-বিভূতি

ঐ সময় এ শরীরেব কিরূপে খেয়ালে এক ভাব ছিল যে নদীতে জলের ঢেউ দেখিলে খেয়াল হইত, আমি এক একটি ঢেউ। দেখিতে দেখিতে শরীরটা গড়াইতে থাকিত। পাওলদিয়া যাইয়া ঐ ভাব হইল। শরীরের নড়াচড়াতে নৌকা ঠিক রাখিতে পারে না। পরে পাড় ঘেঁসিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। নৌকা হইতে উলটিয়া জলে পড়িতে চাই, শরীরে এত শক্তি যে কাহারও ধরিয়া রাখা কঠিন হইয়াছিল।

কীর্তনে যেমন শরীরের অবস্থা কেমন হইয়া যাইত, জল, আগুন ও বাতাস দেখিলেও তেমন হইত - আমিই বাতাস, জল ও আগুন। আবার কখনো গাছ ফুল ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে আমি তাহাই হইয়া যাইতাম। এইরকম ভাব অনেকদিন চলিয়াছিল। সেই সময় কোন কোন দিন একটু স্থিরভাবে, আমি কোথাও থাকিয়া, দেখিতাম ও বুঝিতাম যে জল, অগ্নি, গাছ, পশুপাখী, মাটি, পাথব ইত্যাদি বিশেষ দৃশ্যাদির কি গুণ, কি স্বভাব, কি ভাবে তাহাদের গতাগতি হয় এবং আমিও তদ্রূপ। কোন ধ্বনি শুনিলেও বোধ হইত আমিই সেই ধ্বনি। ঝটকা বাতাস দেখিলে

কাপড়ের মত শরীরটাও উঠিয়া আনন্দেব সহিত এক অস্বাভাবিক ভাবের প্রকাশ হইয়া বা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে যাইত। পরে আপনিই স্থির হইত। কোন কোন দিন এই ভাব লইয়া শরীরটা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িযাও থাকিত।

কীর্তন আরম্ভ হইলে সর্বাঙ্গের যে অবস্থা হইত তাহাও এই রকম। নাম কীর্ত্তন শরীরের ভিতরে ও বাহিরে খেলা করিত। উপাসকের নাম করার লক্ষণ হইতেছে নিজেই নামময় হইয়া যাওয়া, যেমন ধ্যানের উদ্দেশ্য নিজেই ধ্যেয় হওয়া।

সাধকের যোগবলে কত কি হইতে পারে। কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র সুতার অবলম্বনে বাতাসে উড়ে, তেমন যোগীর শরীর ও যোগসূত্রে গতি ধরিয়াও শূন্যে উঠা, সূক্ষ্ম হওয়া, বৃহৎ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া অনেক রকম খেলা তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। সাধারণের এইসব বুঝা কঠিন। যেমন পণ্ডিত না হইলে পাণ্ডিত্যের মর্ম বুঝিতে পারে না। যোগবিভূতি উদয় হইয়া আপনা হইতে স্বভাবে যাহা নিত্য আছে তাহা প্রকাশ না পাইলে, সাধক স্ব-ইচ্ছায কখনো খেলিবার চেষ্টা করিতে পারে না। সাধকের সাধন ফলে যে যোগবিভূতি হয় তাহা ফল-স্বরূপ আর অভাবের প্রাপ্তি রূপ কিনা। আর যেখানে স্বভাব-বিভূতি সেইখানে এই কথা নয।

বদ্রীনারায়ণ যার দর্শন উদ্দেশ্য, তাহার যেমন দীর্ঘ রাস্তার মনোবম দৃশ্যাদিতে মুগ্ধ না হইয়া গন্তব্য পথে চলিতে হয়, তদ্রূপ সাধনার চরম সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত লক্ষ্যটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা আবশ্যক।

সাধকের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে সতর্কবাণী

আর একটি কথা এই - সাধক যখন বিভূতি লাভ করে, তখন তাহার শক্তি ক্ষয় ও বৃদ্ধিভাব থাকা পর্যন্ত সে যাহা প্রকাশ করে তাহার শক্তিক্ষয়ের প্রতিকার স্বরূপ, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম করিতে হয়। এ শরীরের ত সবই আপনা আপনি, আপন খেয়ালে খেলিয়া যাইত। আর জিজ্ঞাসার কারণগুলিও মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইত। কেবল বাহ্যভাবজনিত যে সব অলৌকিকতা তাহা প্রতিকারের কোন অপেক্ষা রাখে না কিন্তু। এ শরীরের আপনা আপনি স্বভাবতই তোমাদের এক একটা দিক নিয়া খেলিয়া যাইতেছে।

শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজায়[৩]

শশাঙ্কবাবুর বাডিতে বার্ষিক দুর্গাপূজা হয। তিন দিনই বলি দেওয়া হয়, তদুপরি তাহার কল্যাণার্থে একটী পাঁঠা বেশি বলি হইত। একবার পূজায় সেখানে ছিলাম। দেখিলাম, অতিরিক্ত পাঁঠাটিব বলির সময এ শবীব যাইয়া পাঠার গলার উপব হাত পাতিয়া দিল। খড়্গ উঠাইয়াছিল অল্পের জন্য এ শবীরের হাতের আঙ্গুল বাঁচিল। যিনি খড়গ উঠাইয়াছিলেন, তিনি তো ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এ শরীরের তখন কোন খেয়ালই ছিল না, কি জন্য কি করা হইতেছে। খড়গ নামাইয়া নিল, পাঁঠাটি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে তখন ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া এ শরীরের পায়ের কাছে মাথা দিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সেই হইতে এই বেশি বলি দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। পরে সেই পূজায় একটি পাঁঠা বলিতে আটকাইয়াছিল, সকলেই চিন্তিত। এ শরীর বলিল - এখনই একটি ডাব গাছ হইতে লইযা আস। ডাব আনিলে এ শবীব বলিল - এইটিকে এক ঘাযে বলি কব এবং ইহার জল রুধির জ্ঞানে উৎসর্গ কব। বলি হইলে দেখা গেল আপনা আপনিই এক পাশের খোলে কতটুকু জল রহিয়া গিয়াছে। তাহাই নিবেদন কবা হইল। এই ঘটনার পর হইতে শশাঙ্কবাবুর পূজায় পাঁঠা বলি বন্ধ হইযা যায়।

মায়ের নিকট আসা ও যাওয়া

এটা সত্য জানিস্, তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরের নিকট হইতে যাহাবা সরিয়া গেল, তাহাদের সঙ্গে যতটুকু সময়ের জন্য দরকার তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য এই ভাবে ততটুকু সময়ই মাত্র থাকিতে পারে। আবাব এই শরীরের নিকট হইতে যাইতে হইলে এমন কোন উপলক্ষ্য সৃষ্টি হইযা পডে যাহাতে নিজেই কোন কারণ দেখাইয়া চলিয়া যায। অবশ্য এই শবীবেব তীব্র খেযাল হইলে কিছুই দাঁডায না। কিন্তু এই শরীরের ত নিকট বা দূরে বলিযা কোন কথা নাই। এই শরীবেব যে সকলেব জন্য সর্বত্র সব সময়ই সমান।

[৩] ২রা থেকে ৫ই অক্টোবব, ১৯২৭।

একাদশ অধ্যায়

বিন্ধ্যাচলের সাপের কথা

একদিন নগেন দত্ত এ শরীরকে বিন্ধ্যাচলের সাপেব বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ঐ সম্বন্ধে বলিতে বলিতে, যেমন বিশেষ আপন জনের অভাবে কান্না পায়, ঠিক সাপের জন্য তেমন একটা ভাব প্রকাশ হইল। তখনই হাসিয়া বলিলাম - শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

নিরঞ্জনের বাড়িতে প্রতি শনিবার কীর্তন হইত। কীর্তনে সেখানে গিয়াছি। তাহার স্ত্রী খুব অসুখ। প্রায়ই যাইয়া তাহাকে দেখিতাম। সেই দিন দোতলার উপর তাহার কাছে একটা বালিশে হেলান দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছি, ইহার মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হইল, পায়ের কাছে যেন সাপ। আমি কিছু বলি না, ইতিমধ্যে কে বলিয়া উঠিল, সে কোঠার পরের পরের কোঠায় সাপ। এ সময় আমি কীর্তনে যাইব বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ভোলানাথ আমার আগে। ইহার মধ্যে দেখি একটি কাল সরু সাপ ভোলানাথের পায়ের কাছে। এ সময়ে কেমন একটা খেয়াল হইল, ভোলানাথকে ছেলেমানুষের মত সবাইয়া আনিলাম ও সাপটি আমার পায়েব বুড়া আঙ্গুলের চাপে রহিল। পরে সেটি আঁকা বাঁকা হইয়া সিঁড়ির নীচে গিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। ইহাব মধ্যে অনেকে আসিল, জিজ্ঞাসা করে - সাপটি মারিব? হাসিয়া বলিলাম, যদি পার তবে দেখ। কে আসিয়া একটি লাঠি দিয়া চাপা দিল, ভাবিল সাপের গায়ের মাঝখানে চাপা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে দেখা গেল, সাপটি নাই। বাহির ভিতর সিঁড়িতে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, কিন্তু সাপটিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না - অদৃশ্য। যখনই এ শরীরের সাপের কথা খেয়াল হইত, তখনই দিন বা রাত্রি হউক যে কোন সময়ে একটি সাপের রূপে এ শরীরের সাথে প্রায় দেখা হইয়া যাইত।

বিদ্যাকূট হইতে বওনা হইয়া সাহবাগের পথে আমরা নৌকায় উঠিলাম। বাহিরে বসিয়াছি। বীরেনও আমার নিকট বসিয়াছে। নৌকা খাল ছাড়িয়া বিলে যাইয়া পড়িল। দেখি কি একটি সাপ জলের ভিতর আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আমার বরাবর, নৌকা যত যায়, সাপটি টেরাভাবে প্রায় দশ হাত দূরে চলিতেছে। এই রূপে বেশ কতদূর চলিল। আমারও চোখের পলক নাই, সাপটির দিকে চাহিয়া আছি। আর ঐটিও এক লক্ষ্যে আমার দিকে আসিতেছে। যখন নৌকার কিনারা দিয়া আমার কাছাকাছি আসিল তখন মাঝি দাঁড় দিয়া এক আঘাত দিল, সাপটি আমাদের নৌকার নীচ দিযা, পাশে আরও একখানা নৌকা ছিল, তাহার তলা দিয়া চলিয়া গেল। মাঝি বলিল - আমার ভয় হইয়াছিল পাছে মায়েব গায়ে আসিয়া উঠে। বীরেন জিজ্ঞাসা করিল - এইটি কি? এ শবীর বলিল - দেখিতেছিলাম, একজন মহাপুরুষ,[১] তাঁহার সহিত একটি শিষ্য আমাদেব নিকট হইতে ১০ হাত দূরে দূরে এতক্ষণ ছিল। এইমাত্র অদৃশ্য হইল। পবে আসিযা স্টীমারে উঠিলাম। এই শরীরটা আগাগোড়াই এলান অবশ ছিল। সকলে ধরাধবি করিযা সাহবাগে লইয়া আসিয়াছিল।

ভোলানাধের মাতৃপূজা

ইতিপূর্বে যখন কামাখ্যায় যাওয়া হয়, তখন ভোলানাথ একবার এ শবীরকে তথায় পূজা করিয়াছিল। সেই সময় বিনা আহ্বানে অনেক কুমারী সেখানে উপস্থিত হইযাছিল। এবং যতক্ষণ পূজা হইয়াছিল তাহারা ওখানে হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়াছিল। ঢাকায় উত্তমা কুটীরে ভোলানাথ আবার এই শরীরটাকে পূজা করিল। ঐ সমযে পূজাব মন্ত্রাদিব সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরটা কি একটা ভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিত। ঘন্টার পর ঘন্টা ঐভাবে কাটিযা যাইত।

ভোলানাথের তারাপীঠ গমন

ঢাকায় উত্তমা কুটীরে[২] কয়েক মাস কাটাইবার পর ভোলানাথকে সঙ্গে কবিয়া সিদ্ধেশ্বরী আসিলাম। তাহাকে কালীমন্দির সংলগ্ন ছোট্ট কোঠার ভিতর বসিবার কথা বলিলাম। তিন দিন বসিয়া ভোলানাথ বলিল - আমি মাথা ছাড়া এক

[১] এই সাধকের সমাধিস্থলে বমনা আশ্রমেব ছোট শিবমন্দিবটি স্থাপিত হয। দ্রষ্টব্য ঃ *শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ*, প্রথম খণ্ড - পৃষ্ঠা ৩০, লেখক ঃ অমুল্য কুমাব দত্তগুপ্ত।

[২] সাহবাগ ছাড়িবার পবে এই বাড়িটি ভাড়া নেওযা হইযাছিল।

কালীমূর্তি দেখিতেছি। উহা কি বল? তাহাকে বলিলাম - তুমি তারাপীঠ যাও। তারাপীঠের নাম পূর্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে বিগ্রহাদি কি আছে জাগতিক হিসাবে জানিতাম না। যোগেশকে সঙ্গে করিয়া ভোলানাথ তারাপীঠ গেল।

এইদিকে এ শরীরের এক খেয়াল হইল, প্রায় সারাদিনরাত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেই ছোট কোঠায় যাইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। বেলা ৪টার সময় বাহিরে আসি সামান্য যাহা কিছু খাই, রাত্রি ৯/১০টা পর্যন্ত বাহিরে থাকিয়া আবার সে কোঠায় প্রবেশ করি।

এইদিকে কিছুদিন পরে ভোলানাথ এ শরীরকে নিবার জন্য তারাপীঠ হইতে সুরেনকে পাঠাইয়া দিল। সেইদিন ঢাকা স্টেশনে হঠাৎ আমার যাইবার কথা শুনিয়া অনেক পুরুষ ও মহিলা দেখা করিতে আসিল আর কান্না জুড়িয়া দিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে এ শরীরও হাউ হাউ করিয়া হাত পা নাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, যেন শরীরের সর্বাঙ্গেই কান্না। জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলে, মা! এ কি করিতেছেন। স্টেশনে এত লোক ইহারা কি বলিতেছে? কাহার কথা কে শুনে। আমি আমার এই ভাবেই আছি। দেখিয়া আমাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। বাহিরের লোকেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ বলাবলি করিল যে বোধ হয় জোর করিয়া মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইতেছে।

এ শরীরের ত যখন যাহা হয় চূড়ান্ত; হাসিও আবার এইরূপই, করা কি! পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। রাস্তায় ও নারায়ণগঞ্জে স্টীমারে গিযাও কান্নার ভাব চলিয়াছিল। পরে আস্তে আস্তে পড়িয়া রহিলাম।

কলিকাতা পৌঁছিয়া তারাপীঠ গেলাম। দেখিলাম ভোলানাথের জপ ধ্যানে সুন্দর ভাব, একটু তন্ময়তাও। সারা দিনরাত্রি তারামায়ের মন্দিরের বারান্দায পড়িয়া থাকে। মুখে মশামাছি বসিলেও খেয়াল নাই। শীত সত্ত্বেও গাযে কাপড় নাই। আগে হুঁকা সর্বদা মুখে লাগা থাকিত, তখন দেখি সে খেয়ালও বিশেষ নাই। আমবা যখন যাইয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রির খাবাবের জন্য উঠিয়াছে। আমাকে বলিল - আমি যে সিদ্ধেশ্বরীতে মাথা ছাড়া কালী দেখিয়াছি তাহা এই তারা মায়ের মূর্তি। কাল সকালে স্নানের সময় দেখিও। একখানি পাথর, তাহাতে ইহারা মুখ লাগায়। বলিলাম - তোমার তারাপীঠে আসার কথা, আমার ভিতর হইতেই উঠিয়াছিল। এইরূপ মূর্তির কথা আমি আগে কিছুই শুনি নাই।

ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরেব কোঠায যেইরূপ দেখিযাছিল এখানকার মূর্তিও প্রায় সেইরূপ দেখায তাহাব বেশ উৎসাহ ও আনন্দ হইযাছিল। এখানে আসিয়া অবধি তারা মায়ের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু খায না। সর্বদা জপ ধ্যানে এক অখণ্ড ভাবেব ধাবায় আছে এবং রাখিতেও চেষ্টা।

এইরূপে দশদিন গত হইল। শেষদিন দেখি কি! অনেক বাত্রে ভোলানাথের কেমন একটা ভাব আরম্ভ হইয়াছে। সর্বাঙ্গ ওলট পালট। খুব বড় বড় আওয়াজ করিয়া বলিতেছে - তারা মায়ের কৃপা পাইয়াছি। পাণ্ডারা মনে করিল, তাবাপীঠে যাহারা সাধন ভজন করিতে আসে, তাহারা কেহ কেহ প্রথম একটু ক্ষেপিযা উঠে, পরে শান্ত হয় - ইহাও সেই বকম একটা ভাব। তাবা মা ভোলানাথকে নিয়া কি ভাবে খেলা করেন তাহা বলিতে লাগিল ও শরীরের অনেক ক্রিযা প্রকাশ হয। এইরূপে রাত্রি শেষ হইল। সকাল বেলা আসিয়া শিবমন্দিরে পড়িয়া রহিল। সেইদিন আর তামাক খাইল না। বেলা ৩/৪টা হইতে মুখে লালা পড়িতে লাগিল। ইহাব পর হইতে তামাক খাওযা একেবারে বন্ধ হইযা গেল। ২/১ দিন তথায় থাকিয়া আমবা কলিকাতা চলিযা আসিলাম।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী তারামা, তারাপীঠ, পশ্চিমবঙ্গ।

যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

একদিন দেখি কুশারী মহাশয়ের গলায় পৈতা নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দিব দিব বলিয়া আর দেওয়া হয নাই। তাহাকে বলিলাম - তবে ছেলেরা কি শিখিবে? শিগ্গির সকলে পৈতা নিন। আর একদিন খুকুনী এ শরীরকে স্নান করাইতেছে। গলার সোনার সরু হারটা খুলিয়া রাখিয়াছে। স্নানের পরে যখন হারটা গলায় দিতে গেল তখন হারটা পৈতাব মত হইয়া গলায় পড়িল। মাপিযা দেখিলাম সামবেদীব পৈতাব মাপে আছে। কি একটা ভাব হইল। বলা হইল, বেশ ত পৈতার মাপেই আছে। ঐ ভাবেই হারটা ঐ সময় রহিযা গেল। পবে সন্ধ্যাব সময এক খেযাল হইল যে আমি পৈতা নিব। গলাব সেই সোনার হারটি খুলিযা বেঙ্গীব হাতে দিলাম। সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা হাত পা ধুইযা শুদ্ধ হইয়া আমাকে গায়ত্রী শুনাও। সে সময় সোনার হারটি পৈতার মত গলায় দিলাম। এই গাযত্রী পড়া হইলে উপনয়নের সময় যেইরূপ হয় বেঙ্গী সেই ভাবে ভিক্ষা আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিল। খাওয়া ত সামান্য ফল দুধই হয়, কাজেই আহার সংযমের

ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইয়া গেল। পরদিন কলিকাতা হইতে যজ্ঞের অগ্নি সে বাসায় আনা হইল ও গঙ্গায় গিয়া তাহাদের ৫ জনের গলায় নূতন পৈতা দেওয়া হইল।[৩]

একদিন নন্দুর গলায় পৈতা না দেখিয়া বলিয়াছিলাম - ধর! তুই আমার পৈতাটি (সোনার) নে। সে স্বীকার করিল না। রেবতীবাবুকে একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলাম - আমার বাবা যখন, তবে ত ব্রাহ্মণ। এই পৈতাটি নাও সেও নিল না। এ সব নানা রকম খেলা খেলিয়া শরীরটা ঢাকা চলিয়া আসিল।

কালীমূর্তির স্থানান্তর

কালী বিসর্জন না দিয়া রাখা হইলে, প্রথমতঃ যে ঘবে ছিল, সে ঘর হইতে সরাইয়া অন্য ঘরে নেওয়া হইল। সে সময় যোগেশবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) বলিল - এ কালীর কি যে গতি হয় জানি না। তুলিতে শরীর কাঁপে, পাছে ঝর ঝর করিয়া ভাঙ্গিযা পড়ে। তাহারা খুব ভয়ে ভক্তিতে সবাইয়াছিল। তাহার পর যখন আমাদেব অনুপস্থিতিতে সাহবাগ হইতে মোটবে টিকাটুলী লইয়া যায, তখনো কেবল কালীর উপর ভরসা রাখিয়াই গিযাছিল। মাটির মূর্তি, বছর হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার না হয়। পরে আবার উত্তমা কুটীরে আনে, সেখান হইতে সিদ্ধেশ্বরী আনিতে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে একটি কাঠের আলমারী করিয়া উহার ভিতর কালীমূর্তি রাখা হইয়াছিল। অবশেষে, মহালয়ার দিন[৪] মা কালীর মূর্তিকে নিয়া আমরা সকলে রমনা আশ্রমে যাইলাম।

চিত্র ঃ ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী প্রথম আশ্রমের ছবি।

আগ্রহ জনিত কর্মের সুফল

উত্তমা কুটীরে থাকাকালীন আমরা একবার কুমিল্লা যাই। তথায় কীর্তনাদিতে খুব আনন্দ হয় এবং অনেক লোক সমাগম হয়। আমরা উত্তমা কুটীরে ফিরিলে, নিকটস্থ বাসার অক্ষয়বাবুর মেয়ে একখানি বদ্ধ চিঠি নিয়া আসিল। সে বলিল কয়েকদিন হয়, সে যখন স্নান করিতে পুকুরে যায়, তখন এই শবীরের নামে ঐ চিঠিখানা পুকুরের পাড়ে পড়িয়া আছে দেখে। সে আর ধরিল না। কিন্তু যখন

[৩] ভোলানাথজীব তৃতীয় ভগ্নীপতি - কালীপ্রসন্ন কুশারী এবং তাঁর চার পুত্রেব সালকিযাতে (হাওড়া)।
[৪] ২রা অক্টোবব, ১৯২৭।

দেখিল ৩/৪ দিন পর্যন্ত পড়িয়াই আছে, তখন সে ভাবিল কেহ হয়তো ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, আজ সে তাহা লইয়া আসিয়াছে। চিঠিখানা খুলিয়া দেখি, কুমিল্লা হইতে একটি ছেলে তাহার বুকের বক্ত দিযা কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রাণের আবেগ নিবেদন করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায, মানুষের আগ্রহ থাকিলে কোন কর্ম বিফলে যায় না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা

আশ্রমের জন্য জ্যোতিষের প্রথম ইচ্ছা জাগে। এ শরীরকে বলিলে তাহাকে বলিলাম - জগৎ ভরাই ত এই শরীরের একটি মাত্র আশ্রম। জ্যোতিষ বলিল - আপনাকে হরিদ্বারে এক কুটিয়া করিয়া দিলেও ত আপনি থাকিতে পারেন। কিন্তু আশ্রম আমাদের জন্য প্রয়োজন। দেখিলাম তাহার প্রবল আগ্রহ। সাহবাগে যখন লোকজনের আসা বারণ হইল, তখন আমি গেটে আসিয়া কখনও কখনও সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতাম। একদিন সন্ধ্যাব সময জ্যোতিষ আসিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি ও ভোলানাথ তাহাকে নিয়া মাঠে গিয়া বসিলাম। সে আবাব আশ্রমের কথা তুলিল। তখন তাহাকে বলিলাম - যদি তোমবা তোমাদেব জন্য আশ্রম একান্তই করিতে চাও, তবে ঐ ভগ্ন দেওয়াল যুক্ত ছাড়া বাড়িতে (বর্তমান আশ্রম) করিবার চেষ্টা করিও। ভোলানাথের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম - উহা তোমাদের পুরানো স্থান।

তাহার পরে জ্যোতিষের ব্যারাম হইল। যখন সে সুস্থ হইয়া আবার ঢাকা ফিরিয়া কাজে হাজির হইল, তখন একদিন বলে - নিবঞ্জন ও আমি আজ ৩ বৎসর ধরিয়া আশ্রমের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিযা উঠিতে পারিলাম না। নানারকম বাধাবিঘ্ন লাগিয়াই আছে। এখন নিরঞ্জন বলে, আশ্রমেব প্রস্তাব কোথাও করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনি ইচ্ছা না করিলে কিছুই হইবে না। সকলের মঙ্গলের জন্য আপনার ইচ্ছা আসুক, এই প্রার্থনা করি।

ইহার পর আমাদের তারাপীঠ যাওয়া হয়। ফিরিয়া আসিলে কলিকাতায় বিনয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তখন তাহাকে বলিলাম - তোমবা যে আশ্রম আশ্রম সর্বদাই কর, তোমাদের যদি দবকার মনে হয়, তবে ঢাকা গেলে জ্যোতিষকে বলিও তাহারা ঐ রমনার জায়গাটি যেন আবাব চেষ্টা করে। তবে এ শবীবের কথা এই - তোমরা আশ্রম কর আর নাই কর, এ শরীরকে যে চার দেওয়ালের মধ্যে সর্বদার জন্য বাঁধিযা রাখিবে, তাহার কি হইবে না হইবে কিছুই কিন্তু ঠিক

নাই। যাহা হইয়া যায়। তোমাদের আশ্রম করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা। এই শরীরের কিন্তু আশ্রম করা সম্বন্ধে কোনই কথা নাই, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড জোড়াই একখানি আশ্রম। সেইখানে সেই একেরই নিত্য নিবাস।

পরে রমনার স্থানটি ঠিক হয়। জন্মোৎসব সিদ্ধেশ্বরী হইতেছে। এ শরীরের কি এক খেয়াল হইল উৎসবের মধ্যেই নূতন স্থানে যাইতে হইবে। জ্যোতিষকে ইহা জানাইলাম। সে রাতদিন লোক খাটাইয়া আশ্রমে একখানি ঘর কবিয়া দিল।[৫] ১৯শে বৈশাখ রমনার আশ্রমে প্রবেশ কবিলাম।

সেইবারও তিথি ও তারিখ মিলিয়াছিল। এই শরীরটা যখন তোরা পাইয়াছিলি তখনও সেই তারিখ ও তিথি মিলিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ১৯শে বৈশাখ কৃষ্ণা চতুর্থী ছিল।[৬]

সেই দিন সন্ধ্যায়, রমনার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। ও সেই রাত্রে বাউল ফুলের মালা দিয়া রকমে রকমে আশ্রম সাজাইল। সকলে মিলিয়া রাত্রি প্রায চটা পর্যন্ত খুব আনন্দ করিল। পরদিন ঘরের বাহির হইতেই দেখি শরীরের কেমন একটি অবশ অবস্থা। এই শরীর আর ঘরে গেল না। সারাদিন বাহিরেই পড়িয়া রহিল। সেইদিন ভোগের ব্যবস্থা হইল। বহু লোক আসিয়া প্রসাদ নিল। এই শরীর প্রায় সন্ধ্যায উঠিয়া পিতার সঙ্গে কিছু খাইল। ভোলানাথ নিরঞ্জনের বাসায গেল।

ঢাকা ত্যাগ

ইহার অনেকদিন পূর্ব হইতেই ভোলানাথকে বলিতাম - তুমি ঢাকা থাকো, আমি কয়েকদিন ঘুরিয়া আসি। তাহা শুনিয়া তিনি রাগ করিতেন। এই শরীরের কেমন একটা ভাব আসিল, বলিয়া উঠিলাম - আমি এখনই কোথাও যাইব। সকলে বলিল - কাল সন্ধ্যায় এই আশ্রমে আসা হইল। এত করিয়া আশ্রম করা হইল আর আজই তুমি চলিয়া যাইবে? একি হয়? আমরা যাইতে দিব না। আশ্রমে তখন শশাঙ্কবাবু প্রভৃতি ১০/১২ জন ছিল। সন্ধ্যার পর একটু কীর্তন হইয়াছিল পরে অনেকে বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। এই সব কথা চলিতেই এই

[৫] বাঁশের কঞ্চি এবং বাঁশেব বোনা দেওযালেব ওপর খডেব ছাউনি দেওযা ঘর, ইঁটেব মেজে, চারিপাশে বাবান্দা।

[৬] ২ মে ১৯২৯, বৃহস্পতিবাব।

শরীরের মুখ হইতে মন্ত্র ও স্তোত্র বাহির হইতে লাগিল, অনেকে তাহা লিখিতে আরম্ভ করিল। তখন বলা হইল - যখন লিখিযা নিলে তখন ইহা তোমবা প্রত্যহ পাঠ করিও।[৭] আরও বলা হইল - যেখানে তোমবা এখন কীর্তন করিয়াছ তাহার ঐ দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলাম - পূর্বে যে কথিত আছে উগ্র তপস্বীদের কথা, ঐ স্থান পূর্বোক্ত তপস্বীদের মধ্যে একজনের বিশেষ স্থান। তাঁহার তত্ত্বে স্থিতিলাভ হইয়াছিল। তিনি এখানকার তপস্বীদের পূজ্য ছিলেন। সেই সময় এই কথাটি একটু অস্পষ্ট ও সংক্ষেপে হওয়ায় সকলে ইহা বুঝিতে পারে নাই। সেই তপস্বীর সঙ্গে ঐ স্থানের সূত্র কি ছিল, তাহা আর বলা আসিল না। সেই জন্য সেখানে একটি বাতি দিবার কথাও বলা হইল।

এই শরীরটা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিযা মাঠে বসিল। শবীবের পিতাকে ডাকাইয়া বলিলাম - আমাব সঙ্গে আপনাকে যাইতে হইবে। আশুকে খোঁজ করিলাম। তাহাকে না পাওয়ায় সীতানাথও সঙ্গে যাইবে স্থির হইল।

ভোলানাথ ও জ্যোতিষ আমার যাওয়া সম্বন্ধে শশাঙ্কবাবুব বাসায খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিল। ভোলানাথকে আমার যাওয়ার কথা বলিলে কেবল 'না' 'না' করিতে লাগিল। তখন কি এক প্রবল বেগে এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল - যদি যাইতে না দাও তবে এ শবীরের কি হইবে ঠিক নাই। ইহা শুনিয়া রাগের ভাবে বলিল - যাও।

এ শরীর এই কথা শুনিবামাত্র স্টেশনের দিকে চলিল। পিছে পিছে সকলে আসিল। ভোলানাথ আশ্রমে বহিল। কতক্ষণ পব দেখি ভোলানাথও জ্যোতিষকে সঙ্গে করিয়া স্টেশনে আসিয়াছে। আমরা গাড়িতে উঠিলাম। খুকুনী আসিযা বলিল - মা! আমাকে তোমাব সঙ্গে নাও। বলিলাম - না। জ্যোতিষ আসিয়া বলিল - আমিও যাইব। তাহাকেও না করা হইলে, সে বলিল - বাবা আমাকে যাইতে বলিতেছেন। আপনি যদি আমাকে আপনাদেব কামরায না নেন, তবে অন্য কামবায় যাইয়া বসিতে বলিতেছেন। এই সব কথা হইতে হইতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভোলানাথের আদেশ পালনের জন্য জ্যোতিষ আমাদেব কামরায় বসিয়া পড়িল। গাড়িতে বসিয়া শুনিলাম ভোলানাথ এ শরীরেব উপর অসন্তুষ্ট হইয়া চলিযা যাইতেছে।

[৭] শ্রীশ্রী মায়েব মুখনিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্লোকেব উল্লেখ দেওযা আছে ভাইজীব দ্বাবা লিখিত "মাতৃদর্শন" পুস্তকে এবং গুরুপ্রিযা দিদির "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী"-ব দ্বিতীয় খন্ডে। দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট-৭।

গাড়ি পরদিন ভোরে মৈমনসিং পৌঁছাইল। মৈমনসিং যাইয়া জ্যোতিষকে বলিলাম - তুমি ঢাকা চলিয়া যাও, এ শরীর কোন পাহাড়ের দিকে যাইবে। সে বলিল - বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন, আপনাকে অনির্দিষ্ট এই ভাবে ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাই। এক বৃদ্ধ পিতাকে নিয়া আপনি এই বর্ষার দিনে কোথায় যাইবেন? যদি কোথায়ও যাইতে হয় নিকটে আদিনাথ, কক্স বাজার বেশ ভাল স্থান। একান্ত, পাহাড় ও সমুদ্র দুইই আছে, তথায় চলুন। তখন খেয়াল আসিতেছিল সে চলিয়া গেলে পরে আমি অন্য একস্থানে চলিয়া যাইব। কিন্তু উপস্থিত তাহা হইল না। বলিলাম - যাই হোক, চল। শেষে চট্টগ্রাম রওনা হওয়াই স্থির হইল।

রাত্রে আশুগঞ্জ স্টেশনে খুব ঝড় বাতাস আরম্ভ হইল। এ শবীর বলিল - আজ কি দেখিতেছ, কাল আরও দেখিবে। পরদিন ভোরে চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছিলাম স্টেশনে নীরোদবাবু, শশীবাবু[৮] উপস্থিত। জ্যোতিষকে এক সার্ট গায়ে ও চটি পায়ে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল - ব্যাপার কি?

অবশেষে স্টীমার স্টেশনে যাইয়া কক্সবাজার বওনা হওয়া হইল। স্টীমাব কতদূর যাইয়া সমুদ্রে পড়িল। আর খুব দোলায়িত হইতে আরম্ভ হইল। এ শরীরের পড়িয়া থাকার ভাবটি তখনও বেশ ছিল। স্টীমারে উঠিয়াই শুইয়া পড়িল। সকলে বলাবলি করিতেছে এইরূপ দোলায়িত অবস্থা ৫/৬ বছরের ভিতর দেখি নাই। বৃষ্টি বাতাস ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। স্টীমারের উপর জল এদিক ওদিক গড়াইতে লাগিল। এ শরীরটাও এলাইয়া পড়িয়া আছে। কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া গেল। দীর্ঘ সময় এ শরীরের অচল, অটল স্থিরভাবে পড়িয়া বা বসিয়া থাকার ভাবটি তখনও বেশি ছিল। উপরে নীচে যাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সমুদ্রের এই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া খেয়াল হইতেছিল - অনন্ত জলরাশি তুমুল গর্জনে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে বিপদের বিভীষিকার ভিতর দিয়া মানুষকে তাঁহার প্রতি শরণাগতি শিখাইতেছে।

কক্সবাজার ঘাটে প্রায় সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। সেখানে একদিন থাকিয়া আদিনাথ আসিলাম।[৯] জ্যোতিষ ও সীতানাথ ফিরিয়া গেল। আমি ও বাবা থাকিলাম। ইতিমধ্যে কুঞ্জবাবু ঢাকা হইতে আসিয়া উপস্থিত। জ্যোতিষ ঢাকায় ফিরিয়া

[৮] শশীভূষন দাশগুপ্ত ঃ চট্টগ্রামের বিখ্যাত আলোকচিত্রকারী।

[৯] কক্স বাজারের সমুদ্রের পাড়ে "আদিনাথ" সবচেয়ে বড় দ্বীপ - সেখানে বড় শিব মন্দির আছে। কথিত যে ইহার নির্মাণ রাবণ কবিয়াছিলেন।

ভোলানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহার উপর নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। বলিল - তোমাকে তাহার সঙ্গে দিলাম ফিরাইযা আনিবার জন্য, আর তুমি তাহাকে তোমার দেশে রাখিয়া আসিয়াছ। এইভাবে বহুলোকের সম্মুখে তাহাকে . . . ভর্ৎসনা করিল। কয়েক দিনের ভিতরই ভোলানাথ আশুকে সঙ্গে করিয়া আদিনাথে আসিয়া উপস্থিত। এ শরীরের উপর রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল।

পরে আমরা কলিকাতা যাই। রাস্তায় ভোলানাথকে বলিলাম - আমার যখন এই রকম ভাব, তুমি আমার চলা ফিরায় বাধা দিও না। ভোলানাথ রাগ করিতে লাগিল, নানা কথার পর আমি বলিলাম, তুমি কসবা কালীবাড়ি বা যে কোন স্থানে এতদিন অপেক্ষা কর। যদি ইহার মধ্যে আমাব ভাবেব পরিবর্তন হয, তবে আমি খবর দিব অথবা সেখানে যাইব।

হরিদ্বার, অযোধ্যা, দেরাদুন ও কাশীতে মা

বর্ধমানের টিকিট করিযা বাবা ও আশুকে নিয়া গাড়িতে উঠিলাম। কুঞ্জবাবুও দেখি যাইতে চায়, তাহাকে বলিলাম - তুমি ফিরিয়া যাও। সে প্রথমতঃ মানিযা নিল। পরে দেখি সঙ্গেই চলিল। বর্ধমানে যাইয়া হরিদ্বারের টিকিট কবা হইল, কুঞ্জবাবু বলে আমিও হরিদ্বার যাইব, ৩/৪ দিন থাকিয়া চলিয়া আসিব। হরিদ্বারে ৩/৪ দিন কাটিয়া গেলে দেখি কুঞ্জবাবু আর যায় না।

ইহার ভিতব এ শরীরের অন্যত্র চলিয়া যাইবার ভাব জাগিল। তখন শরীবের পিতাকে বলিলাম এখনই আমি কোথাও যাইব। আপনি কুঞ্জবাবুব সহিত থাকুন। ৭ দিনের ভিতর না ফিরিলে আপনি কাশী চলিয়া যাইবেন।

হরিদ্বার স্টেশনে গিয়া একটি বাঙ্গালী টিকিট্ কালেক্টরের সহিত দেখা হইল, সে আমাদিগকে অযোধ্যার টিকিট আনিয়া দিল ও গাড়িতে তুলিয়া দিল। সে সময় খাওয়া ছিল সামান্য সরবৎ, ফল ইত্যাদি। তখনো পড়িয়া থাকাব ভাব চলিতেছে। আশুকে বলিলাম এক স্টেশন আগে ডাকিস্। অযোধ্যার নিকট ভোর রাত্রে পৌঁছিলাম। দেখিলাম ৯/১০ জন পাণ্ডা আসিযা আমাদেব কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডার দরকাব নাই বলিলে, তাহারা শুনে না, কেবল গোলমাল করে। অবশেষে চলিয়া গেল। অযোধ্যায় একদিন থাকিযা আবাব হরিদ্বাব আসিলাম। ঐ টিকিট কালেক্টরটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তাহাব বাসায় উঠিলাম। আমরা ৩/৪ দিন সেখানে বহিলাম। টিকিট কালেক্টব ও তাহার স্ত্রী খুব যত্ন

করিতে লাগিল। একদিন বৌটি বলে - আপনাকে দেখা অবধি আমার কেমন উদাস ভাব হইয়াছে। সংসার আর ভাল লাগে না। তাহাকে বলিলাম - যখনকার যে কাজ তাহা গুছাইয়া করিতে হয়। তোমার পতিসেবাই এখন ধর্ম। সময়ে সব হইবে।

একদিন বেড়াইতে গিয়া রাস্তায় কয়েকজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হয়, তাহারা আমাদিগকে ভোলাগিরি ধর্মশালায় নিযা গেল। কিছুতেই আসিতে দিবে না। সেখানেই রহিলাম। শরীরের পিতা ও কুঞ্জবাবুর সহিত দেখা হইল। পরে একদিন গোপীবাবু ও উপেনবাবু আসিয়া বলে যে দেরাদুন রায়পুরে সহস্রধারা আছে, আপনার ইচ্ছা হইলে একবার দেখিয়া আসিতে পারেন। সকলে মিলিয়া সেখানে যাওয়া হইল।

সহস্রধারা হইতে হরিদ্বার ফিরিবার সময় কুঞ্জবাবু খুব পীড়িত হওযাতে তাহার ছেলেকে আসিবার জন্য বেনারসে তার করা হইল। ঢাকা হইতে এ শরীর যখন বাহির হয়, তখন সেখানে থাকিবার জন্য কুঞ্জবাবুকে বলা হইয়াছিল। সে তাহাই করিয়াছিল। পরে আবার কি মনে করিয়া আদিনাথ গেল। সেখান হইতে আর এই শরীরের সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। বার বার কাহাকেও কিছু বলিবার ভাবও এ শরীরে হয় না। কিন্তু কথা না মানিয়া চলিলে কোন না কোন সময় তাহাকে সাময়িক একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। কুঞ্জবাবুকে ও এই অসুখে অনেক ভুগিতে হইয়াছিল।

এ শরীর যখন সহস্রধারা হইতে ফিরিয়া আসে, তখন পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের স্থানগুলি দেখিয়া খেয়াল হইতেছিল - আবার এখানে আসিতে হইবে।[১০]

আমরা পরে বেনারসে নির্মলবাবুর বাসায যাই। ২/৩ দিন থাকিযা জিতেনকে সঙ্গে করিয়া বিন্ধ্যাচল গেলাম। তথায় আবার নির্মলবাবুব স্ত্রী আসিয়া খবর দেয - এই শরীরের পিতার খুব অসুখ, বেনারস ফিবিয়া চল। এ শরীরের যাইবার বিশেষ খেয়াল হইতেছে না বলাতে সে বলিল - তুমি যে সময় আমাদের বাসা হইতে আসিয়াছ তাহা গৃহস্থদের পক্ষে অশুভ ছিল। আবার যাইয়া তোমাকে যাত্রা বদলাইতে হইবে। আমি তোমাকে না নিয়া যাইব না। অনেক কান্নাকাটি

[১০] মে ১৯৪৩ সালে মা আবার এই স্থানে গিযাছিলেন, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচাবীব নিমন্ত্রণে ভাগবৎ সপ্তাহে। এই প্রথমবার মাকে সাধুদের মাঝে মঞ্চে বসানো হইযাছিল।

কবিতেছে। এই শবীব বলিল - আচ্ছা, বল কত সময় থাকিলে তোমাব গৃহের অমঙ্গল দূর হইবে বলিয়া তোমার মনে হয়। সে বলিল - তোমার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ থাকিও। তাহাদের সঙ্গে বেনারস যাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় কীর্তন হইলে পর কথাবার্তা হইতেছে, হঠাৎ খেয়াল হইল এখনই কলিকাতা যাইব। সকলে অবাক। যাইতে দিবে না বলিযা লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। এ শরীর বলিল - যাইবই। এই বলিযা জিতেনকে নিয়া চলিয়া আসিলাম। কলিকাতায গিরীনেব বাসায় ২/১ দিন আছি। একদিন গিরীন বলে - নবদ্বীপে যে সাধু দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আর একবার দেখিলে হয়।

নবদ্বীপের মৌনীবাবা

এক বছব পূর্বে ভোলানাথ সহ আমরা কয়েকজন নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। সে সময় এক মৌনীবাবা তথায় ছিল। দেখা গেল একখানি কোঠায এক লক্ষ্যে একজন বসিয়া আছে। আল্‌গা ঢাকা একখানি চাদর, পিছনে বড তাকিয়া। মশারি টাঙ্গান ও দরজা বন্ধ। দুইটি জানালা আছে, তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে হয়। এ শরীর পলকশূন্য অবস্থায় তাহার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া নিল, পাছে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার জন্য এ শরীরেব অবস্থার পবিবর্তন হয। কোন সময় এ শরীবেব এইরূপ হইত যে এক লক্ষ্যে পলকশূন্য ভাবে দেখিতে দেখিতে শরীব একেবাবে স্থির হইযা যাইত। তখন হাজার ডাকাডাকি পীড়াপীড়ি করিলেও কেহ সাডা পাইত না। কোন সময় চোখ বুজা অবস্থায়ও শবীর অবশের মত হইয়া অনেক সময এইভাবে কাটিয়া যাইত। আপনা হইতে না উঠিলে কাহারও তুলিবার সাধ্য হইত না। পূর্বে এইরূপ হইত যে কোন কোন সময় যে কোন সূত্র ধরিযা বাহিব ভিতব স্থিররূপ প্রকাশ হইযা ঘন্টাব পর ঘন্টা, দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত।

মৌনীবাবাকে দেখিযা কেহ বলে মানুষ, কেহ বলে কৃষ্ণনগরের পুতুল ইত্যাদি নানা রকমের আলোচনা হইল। এ শরীর কিন্তু তাহার পেটে ও বুকে শ্বাসের গতি দেখিয়াছে। ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধা আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল - বাবা কখন উঠেন? কি খান? সে বলে উঠিতে ত দেখি না। খাওয়াও নাই বলিলেই চলে। ১৫/২০ দিন পর একটু দুধ মুখে ধরিলে কখনও নেন, কখনও নেন না। বৃদ্ধা বলিল ৩ বছর যাবৎ এইভাবে আছেন। বাহ্য প্রস্রাব নাই, আরও কত কি! জানিলাম দর্শনের সময় ৮টা হইতে ৯টা, ১০.৩০ মিঃ হইতে ১১টা,

আবার ২.৩০ মিঃ হইতে ৭টা জানালা খোলা থাকে। মৌনীবাবা সম্বন্ধে সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দেখিলাম, অনেকেই তাঁহার উপর চমৎকারিত্ব ও ভক্তির বেশ একটি ভাব। এ শরীর কাহারো ভাব নষ্ট করে না, কারণ সকলের মধ্যে এক ভগবানই ত আছেন। যাহার যেইভাবে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। যে যতটুকু শুদ্ধভাবে অগ্রসর ও স্থায়ী হয়, ততটুকুই ভাল। যে যাহা দেখে বা শুনে তাহা সত্য হওয়া চাই, নতুবা পরে সাধারণের ক্ষতি হয়। বলিলাম - এই সাধু তোমাদের মুখে তাহার সম্বন্ধে মাটির পুতুল পর্যন্ত বাহির করিয়াছে। তাহার দৃষ্টি স্থির, এক আসনে একভাবে পলকশূন্য অবস্থায় বসিয়া থাকা কম কথা নয়। এ শরীবের ভিতর বার বার উঠিতে লাগিল যে সে সব করে। কথাও বলে।

গিরীনের মুখে এইবাব নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা শুনিয়া বলিলাম - বেশ। সঙ্গে জিতেন, গিরীন, তাহার স্ত্রী ও ভাইয়ের বৌ। বিকালে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া মৌনীবাবার আশ্রমে উঠি। দেখি ঠিক পূর্বেকার মত ঐ ভাবে বসিয়া আছেন। কিন্তু শরীর দুর্বল ও মশারিটি নাই। সকলে দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসার কথা বলে। এ শরীর বলিল - তোমরা যাও, আমি এখানে থাকিব। তাহারাও সে রাত্রি রহিল। পরদিন আমাকে ও গিরীনের ভাইয়ের বৌকে রাখিয়া তাহাবা কলিকাতা চলিয়া গেল।

এ শরীর বসিয়া আছে, খানিক পরে বৃদ্ধাটি আসিয়া আমাকে পাশের একটি ঘরে থাকিতে বলিল। আমরা দুইজন সেখানে গেলাম। ঐখানে বসিয়া দেখি কি সাধুর ঘরের আর এক দুয়ারে বেশ ভালো বিছানাপত্র রহিয়াছে একটি মেয়েমানুষ সেই ঘরে বালতি বালতি জল নিতেছে। আমরা আর তত খেয়াল করিলাম না। আবার সেদিকে চোখ পড়িতে দেখিলাম বিছানা নাই। ঘবেব দবজাও বন্ধ। কেবল জানালা দুইখানি খোলা। সাধু পূর্বের মত আসনে বসিয়া আছে। গিরীনের ভাইয়ের বউ বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের ঘরে গেল, শুনিল ঐ মেয়েমানুষটি মৌনীবাবার জন্য রান্না করিতেছে। কতক্ষণ পর বেলা হইয়াছে বলিয়া মৌনীবাবার ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল এবং মেয়েটি খাবার নিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরে মেয়েটিকে তাহার খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল - আমি প্রসাদ পাইয়াছি।

অপর একটি স্ত্রীলোক মৌনী সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়া আমাকে জানায় যে মৌনী সাধুর সঙ্গে যদি কথা বলিতে চাও, এই সময় -এই বলিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেল। মৌনীবাবা আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। আমাকে বলে - তুমি ঘুরিয়া বেড়াও কেন? বলিলাম - তুমিই বল। সে

বার বার বলে - দেখ না, আমি কেমন বসিযা থাকি। এইরূপে অনেক কথাবার্তা হইল, পরে তাহাব আসনে বসিবার সময় আসিল। বলিলাম - এখন ত তুমি সাজ পোষাক পবিয়া সকলকে দর্শন দিবে, তবে আমি যাইব কি? বলে - না। আমি চলিয়া আসিলাম।

বারান্দায় বসিয়া আছি। তখন আমাব খেয়াল হইল যে ইহাবাও বুঝে বাবা কথা কয় না, এইভাবে সর্বক্ষণ থাকে। ইহাও মিথ্যাচার। তাই দেখা যায় সাধুর যতটুকু সদ্‌বৃত্তি তাহাও মিথ্যার প্রভাবে শেষে ঢাকিয়া পড়ে।

দেখিতে দেখিতে বেলা চলিযা গেল। বৃদ্ধা আসিযা সাধুর ঘরের জানালা বন্ধ করিল। সাধু আমাকে ডাকিয়া নিল। তাহার কত শিষ্য আছে, ঐ মেয়েটি তাহার শিষ্যা ইত্যাদি অনেকক্ষণ বুঝাইল। পরের দিন দেখিলাম মেয়েটি সকাল সকাল রান্না করিতেছে এবং শুনিলাম গত রাত্রে মৌনীবাবা রাগ করিয়া খায় নাই। মৌনীবাবাকে খাওয়াইয়া তাহার ঘরের জানালা খুলিযা দিল। বেলা হইলে আবার যখন জানালা বন্ধ করিল, মৌনীবাবা আমাকে ডাকিয়া, তাহার জীবনের অনেক বিষয় জানাইল এবং বৃদ্ধা ও তাহার শিষ্যাটিকে বলিল, তোমরা বলিযাছিলে - মাথা গরম একটি মেয়ে আসিযাছে। এখানে থাকিবে বলিয়া থাকিল। সে আসল পাগল, তোমরা চিন না। পরে আমাকে বলিল - সকলে তোমাকে মা বলে, তবে তুমি আমারও মা। বলিলাম - আমি তোমার মেযে। সে বলিল না, তাহা হইতে পারে না। তুমি তোমার আপন মুখে বল - তুমি আমার ছেলে। পরে তাহাকে বলিলাম - আচ্ছা! কিন্তু তোমাব এইসব মিথ্যাচার ত ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, মা! আমি আর এখানে থাকিব না। তুমি বেশ আছ, ঘুরিয়া থাকাই ভাল। বলিলাম - এ শরীর ইচ্ছা করিযা ঘুবে না ঃ যাহা আপনা হইতে হইয়া যায়। বৃদ্ধা ও সে শিষ্যাটি বলিল - এত শিষ্য, এত ভক্ত, কিন্তু তোমার সহিত যেইরূপ প্রাণখোলা কথাবার্তা হইল, এই রকম ত দেখি নাই। সাধু আমাকে বলিয়া দিয়াছিল - তোমার যখন ইচ্ছা আসিও। তাহাব পরদিন আমি তাহার ঘরে খবর না দিয়াই গেলাম, দেখি মেঝেতে শীতল পাটী, বালিশ ও পরিষ্কার বিছানা। পরণে শান্তিপুরী ধুতি। আমাকে তাহার শিষ্যাটি বলিযাছিল তাহার টাকাব অভাব, তাই আজকাল পুষ্টিকব খাইতে না পারিয়া শরীব শুকাইযা গিযাছে। অথচ দেখিলাম তাহাব চারিবেলা আহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আসিবার সময তাহাকে বলিলাম - সকলে মৌনীবাবা বলে, আমার কিন্তু খেয়াল হইয়াছিল, তুমি কথা কও। তোমার সহিত দেখা হইয়া গেল, এখন যাই।

সে বলিল - মনে রাখিও মা। ৪/৫ দিন থাকিবার পর গিরীন আমাকে আনিতে গেল। গিরীন রাস্তায় বলিল - মা! এ কেমন মৌনী? আমি ত তাহার ব্যাপার দেখিয়া অবাক। এখন ত তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও করাইলে, কথাও শুনাইলে।

তাহাকে বলিলাম মানুষের ভালটুকু মাত্র দেখা ও গ্রহণ করা। দোষ দেখিও না। আমরা গিরীনের দেশের বাড়িতে গেলাম। পরে আবার যখন নবদ্বীপ যাই, শুনিলাম মৌনীবাবা কোথায চলিয়া গিয়াছে।

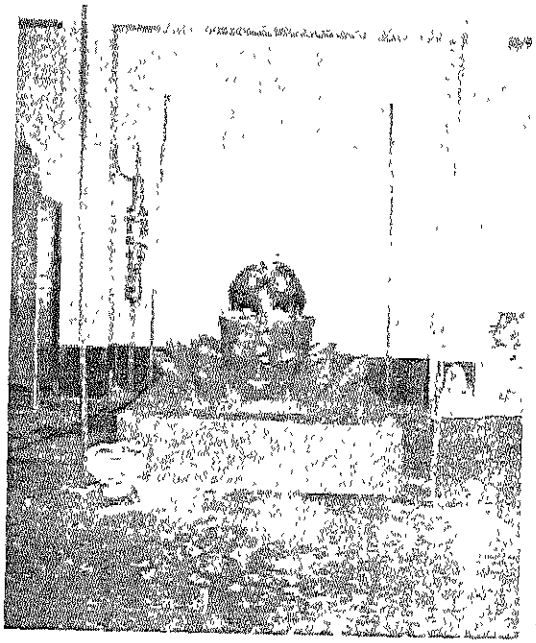

শ্রীশ্রী চালনা শিব

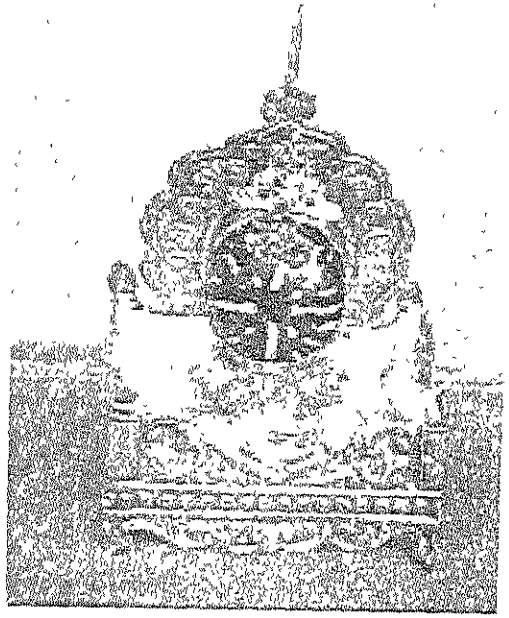

শ্রীশ্রী বাজ-বাজেশ্বব
শালিগ্রাম

সিদ্ধাসনে শ্রীশ্রী মা

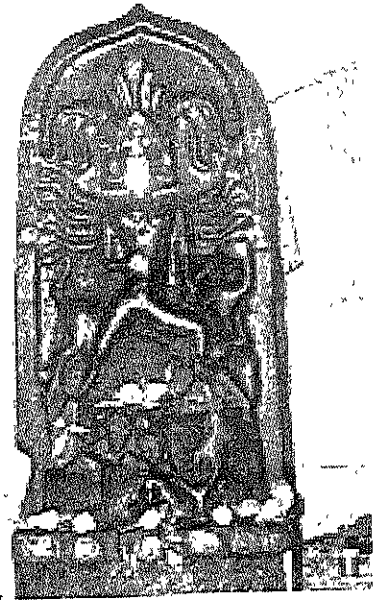

শ্রীশ্রী কসবা কালী

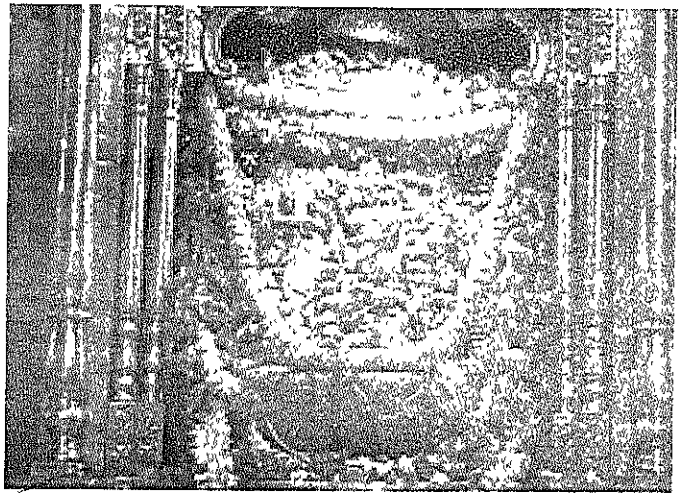

প্রাচীন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী - যেখানে শ্রীশ্রী মা'র ভাব হইয়াছিল, সেটি এখন কুমারটুলি, কলকাতায়।

শ্রীশ্রী মায়ের কপালে জ্যোতি (চিত্র - অক্টোবর ১৯২৬)

সাধন লীলার সময় শ্রীশ্রী মা।

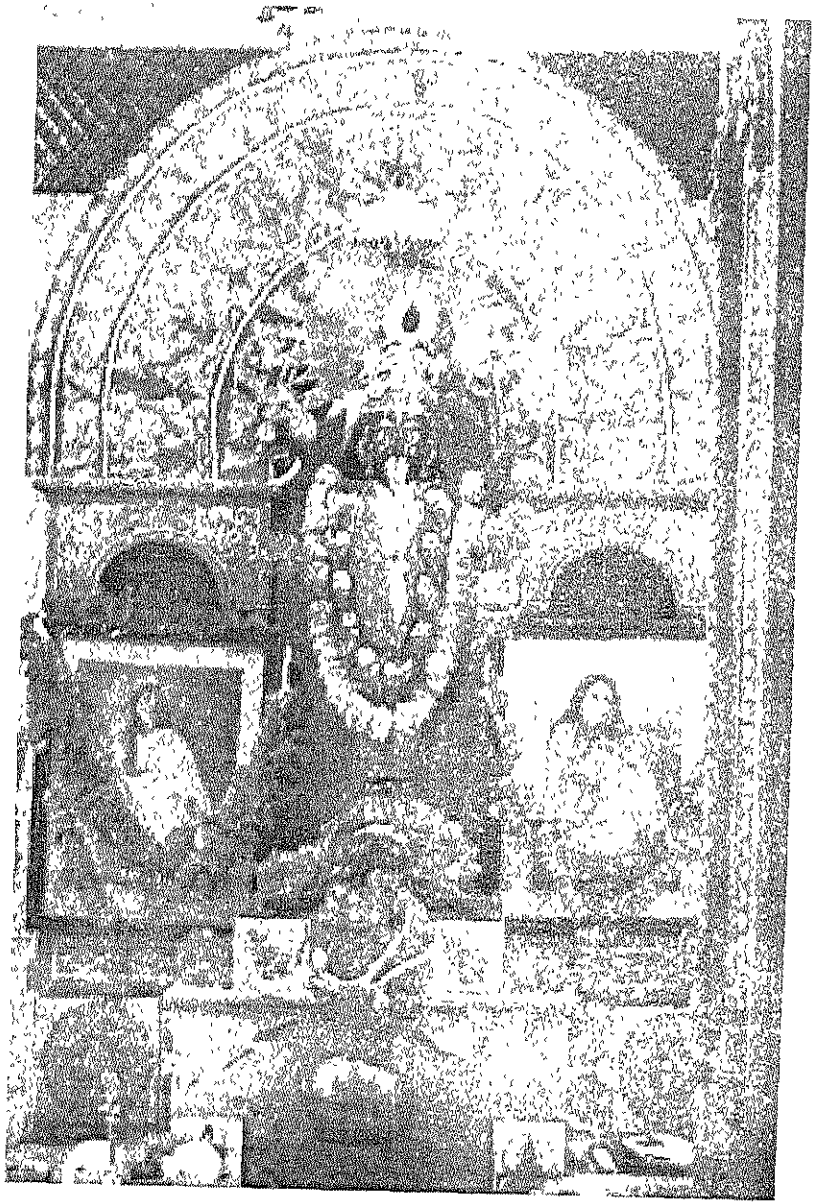

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী

সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ণ স্থানে বেদীর দুই পাশে বসা শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী। বেদীর উপর থামটিব উচ্চতা শ্রীশ্রী মা'র বসার অবস্থায় উচ্চতার সমান।

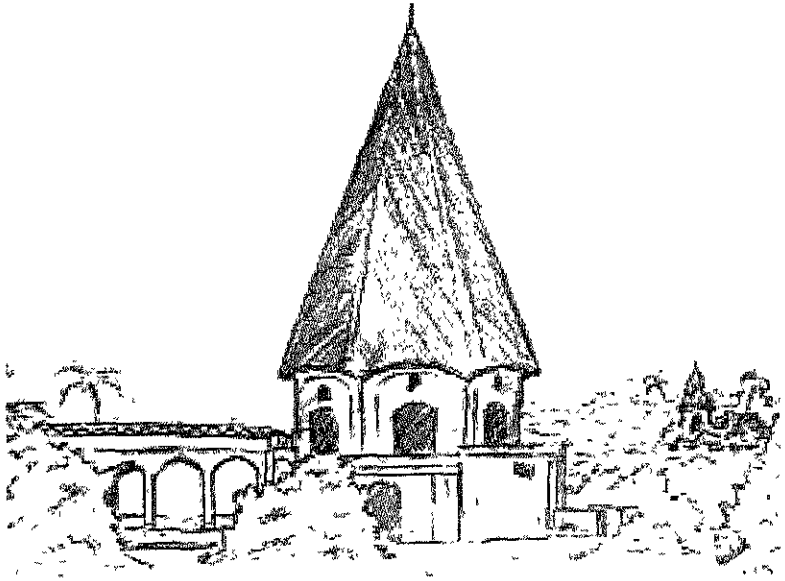

রমনা কালীমন্দির ও পিছনে ভগ্ন মন্দিরটির হস্ত-অঙ্কিত চিত্র

শ্রীশ্রী মাব সমাধিব স্তবেব ছবি

শ্রীশ্রী মাব সমাধিব স্তরেব ছবি

শ্রীশ্রী মার সমাধিব স্তরের ছবি

শ্রীশ্রী মার সমাধির স্তরের ছবি

শ্রীশ্রী মাব সমাধিব স্তবেব ছবি

শ্রীশ্রী মাব সমাধিব স্তরের ছবি

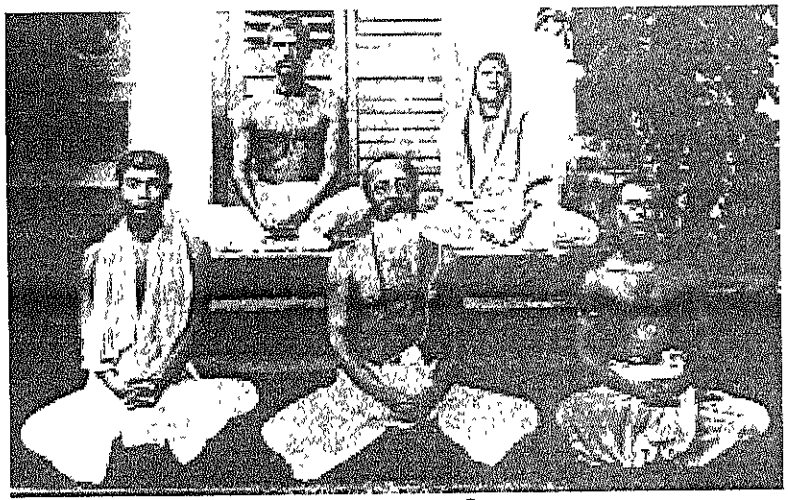

শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীর ঃ প্রথম তোলা ছবি - ১৯২৫ সালের জুন মাসে। প্রথম সারিতে ঃ বাউল চন্দ্র বসাক, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। বেদীর উপরে ঃ বাবা ভোলানাথজী ও শ্রীশ্রী মা

সাহবাগে শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজীব সঙ্গে বালিকা মরণী ঃ ১৯২৬ মার্চ মাস, বাসন্তী পূজার পরে

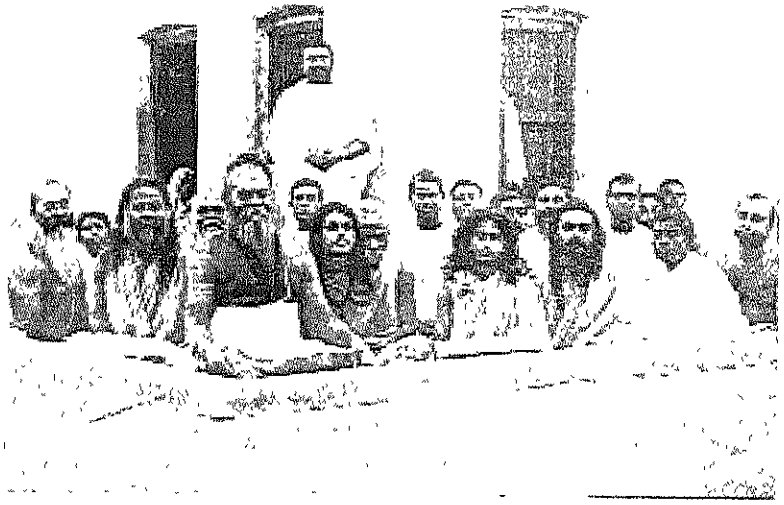

শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তাঁহাব ভক্তবৃন্দ

মা কালীব আবির্ভাবের সময় মা'র বাঁ হাত উঠিযা যায, তাঁর পাশে ভোলানাথজী - ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যাযেব টিকাটুলিব বাড়িতে

দেরাদুনের কিশনপুর আশ্রম ভোলানাথজীর মন্দিরের সামনে বসা ব্রহ্মচারী যোগেশদা

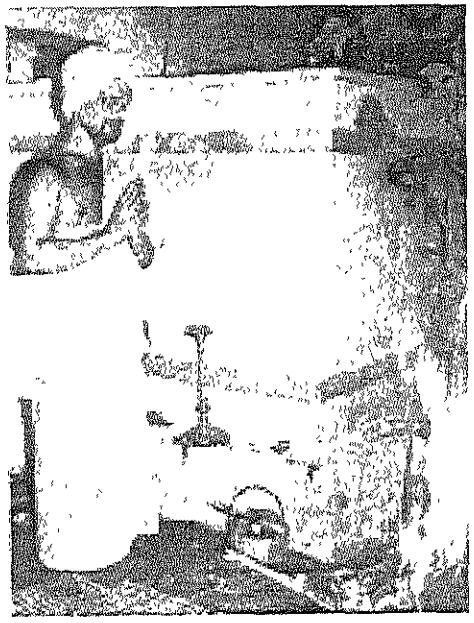

দেরাদুনের কল্যাণবন আশ্রমে কমলাকান্তদা যজ্ঞে বত

শ্রীশ্রী তাবামা, তারাপীঠ, পশ্চিমবঙ্গ

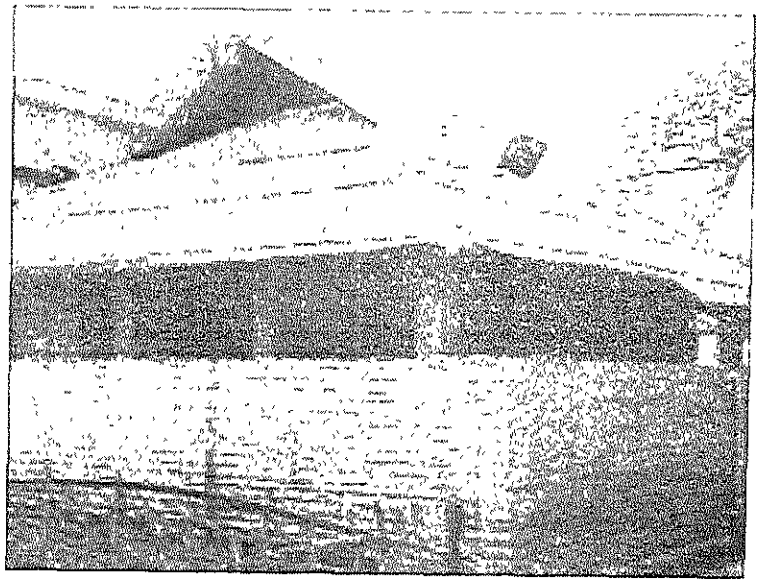

ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী প্রথম আশ্রমের ছবি

সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীশ্রী মা ও ভোলানাথজী ভাইজীকে আশীর্বাদ করিতেছেন

শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মা, বর্তমানে কাশী আশ্রমে

শ্রীশ্রী মা, ভোলানাথজী ও ভাইজী - ১৯৩২ সালে জুন মাসে ঢাকা ছাড়ার পব

দ্বাদশ অধ্যায়

ভোলানাথের অসুখ

ভোলানাথের অসুখের সময়[১] দ্বিপ্রহরে সিদ্ধেশবীর আসনে যাইয়া শুইয়া থাকা হইত। অন্য সময় ভোলানাথের কাছে বসা হইত। একদিন সেখানে যাওয়া হইতেছে, শরীরের সঙ্গে সত্যবাবুর স্ত্রী ও আবও কযেকজন মহিলা গেল। তাহারা কতক্ষণ বসিয়া চলিয়া যাওয়ার সময বলিল - আমরা বাবাকে দেখিতে আবার আসিব। এ শরীরও 'আচ্ছা' বলিল ও দরজা বন্ধ কবিযা শুইযা পড়িল। শরীর একেবারে অবশ, এলাইয়া যেমন পডিয়া থাকিত সেইরূপ। কিছু সময পব জানলার কাছে আসিযা উহাদেরই একজন মা বলিয়া ডাকিল। ডাক পাওযা মাত্র এই শবীর বাতাসে পাতা উড়াইবার মত উঠিয়া আসিযা দবজা খুলিয়া দিল এবং শরীরটি ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহারা আসিয়া আমাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে দরজা খুলিয়াই আমি দাঁড়ান অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছি। মাথায় রক্ত দেখিয়া তাহারা এ শবীবেব মাকে ডাকাইযা আনিল। মাথায় জল দিল এবং আমাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক পরে আপনা হইতে উঠিলাম। লোকজন কাছে বসা সারা কাপড়ে জল রক্ত, মাথা ভিজা - এসব আস্তে আস্তে চোখে পড়িতে লাগিল। তখন প্রায সন্ধ্যা।

আমি ভোলানাথের নিকট গেলাম। দেখি তাহাব জ্বর বাড়িয়াছে। কে বলিয়া উঠিল, তুমি সেমিজ কাপড় ছাড়িয়াছ, আবার দেখি পিঠেব উপর রক্ত। সে মাথার কাপড় খুলিয়া দেখিল মাথায় এক জায়গায কাটিযা গিযাছে ও সে স্থান হইতে সূক্ষ্ম ধারায় রক্ত পডিতেছে। চুল ও বক্ত জমিযা জডাইযা আছে। মাথা পরিষ্কার কবিযা দিল। পরদিন ভোলানাথেব ডাক্তাব আসিলে আমাব মাথা দেখাইল। সে বলিল - তালুর দিকে আহত স্থানটি ফোড়াব মত নরম হইযাছে। ২/৩ দিন পবে আমার মাথার ঐ জাযগাটি অস্ত্র কবিতে হইবে বলিযা ডাক্তার ছুরি ইত্যাদি

[১] জুন১৯২৯।

লইয়া আসে। শশাঙ্কবাবু বলিল - খুলির হাড় ভাঙ্গিযা গিয়াছে অস্ত্র করিলে কিরূপ দাঁড়ায় ভয় হয়। আমি বলিলাম - তোমাদেব যাহা ইচ্ছা কর। তখন ঠিক হইল যে অস্ত্র করিয়া দরকার নাই। ক্রমে ক্রমে তাহা সারিয়া গেল।

ভোলানাথের অবস্থা প্রায় এক রকমই চলিতেছে। একদিন একটা দেড়টার সময় সিদ্ধেশ্বরী আসনে যাইব। শরীরের মা বলিলেন - আজ এত সকালে কেন? বলিলাম - সময় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি একটু চিন্তিত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন আসিয়া পড়িল। কথাবার্তা চলিতেছে। দেখি কি আমার খুব জ্বর হইয়াছে। হঠাৎ আমি খুকুনীকে বলিয়া উঠিলাম - দরজা বন্ধ কর, বমি হইবে। বমি হইল।

সন্ধ্যার সময় বাহিরে গেলাম। দেখি হাঁটিতে পারি না। বেড়া ধরিযা ধরিযা শরীর চলিতে লাগিল ও বাহিরে যাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। খুকুনী আবার ধরিয়া আনিয়া শোয়াইয়া রাখিল। দেখি কি, ভাত বসাইলে যেমন মুখের হাল্কা ঢাকনীটি ভাতের ফেনার সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠে, ঠিক সেইরকম মাথার তালুর মধ্য হইতে হাড় মাংস ভেদ করিয়া ঐ রকম একটা ভাব উপর দিকে উঠিতে চায়। এই রকম অবস্থা বোধ হইতে লাগিল যেন এ মুহূর্তে শরীর ছাড়িয়া যাইবে। তখন ঐখানে যাহারা ছিল তাহাদিগকে বলিলাম - শীঘ্র এ শরীর ধরিয়া বারান্দায় নাও। তাহারা তাহাই করিল। শ্বাস ত জোরে জোরে চলিতে লাগিল। শরীরের গতি অনুসারে যেরূপ ভাবে ক্রিয়া হয়, সে ধরণে আমাকে উঠাইতে, বসাইতে ও শোয়াইতে বলিলাম। সমস্তগুলি যৌগিক আসন হইয়াছিল।

পরে শুনিয়াছি যাহারা এ শরীর ধরিয়া এইরূপ করিয়াছিল, তাহারা ভয় পাইয়াছিল। কাহাবো ইহাও আশঙ্কা হইয়াছিল, যেইরূপ ভাবে শরীবের ক্রিয়া, পাছে না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া ভযানক চোট লাগে। এইরূপ অবস্থায় শবীর না ছাড়িয়া যায়। ইহার পরে ঘরে নিতে বলিলাম। সর্বাঙ্গ অবশ। সকলে বলিতে লাগিল প্যারালিসিস্ হইয়াছে। বাহ্য প্রস্রাব করাইতে সকলে ধরিয়া বাহিরে আনে। মাথা কেহ না ধরিলে হয়ত পিছনে না হয় সামনে অথবা পাশের দিকে হেলিয়া পড়িয়া যায়। যখন বসাইত মাথা ২/৩ জন ধরিয়া থাকিত। নবজাত শিশুর যেমন ঘাড় ঠিক সিধা থাকে না ধরিয়া রাখিতে হয়, সেই রকমটি। সকলেই ব্যস্ত কিন্তু আমার খেয়াল হইতেছিল মহানন্দে এই এক কীর্তন চলিতেছে। শরীবেও সে আনন্দ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অসাড় অবস্থার ভিতর বলিয়া দিতাম, কোথায পিঁপড়া, মাছি বসিল, আঙ্গুলটা কোথায় বাঁকা হইয়া গেল এবং কি ভাবে শরীরের

কোন জায়গায় কি কবিতে হইবে।

এইভাবে ৪/৫ দিন চলিলে একদিন পাশ ফিরাইযা দিতে দিতে খুকুনী কাতর ভাবে বলিল - মা, আর এ শরীর আমরা চালাইতে পারি না। ঐ কথার পর হইতে দেখিলাম রাত্রে শুইয়া আছি, পা গুলি নড়িয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব শরীর নিয়মিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু জ্বর ছাডে না। উহারা মাথায় জল ঢালার কথা বলিল। ৪/৫ দিন ধরিযা রোজ এই খেলা চলিল। বেলা ১০/১১টা হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে চার পাঁচটা পর্যন্ত ৬০/৭০ বালতির বেশি জল ঢালা হইত। যাহারা এই সেবা করিয়াছিল তাহাদেব ভিতর কাহারো জ্বর, কাহারো গা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিল। ভূপতিবাবু থার্মোমিটার দেয়, কিন্তু অতি অল্প সময়েব ভিতবই ১০৪°, ১০৫°, ১০৬° পর্যন্ত নানা রকম দেখা যায। পবে থার্মোমিটার দেখা বন্ধ করিয়া দিল।

চুল লম্বা ছিল, ভিজা ও গন্ধ থাকে বলিয়া বলাতে, কাটিয়া দিবার কথা বলিলাম। খুকুনী কাটিয়া দিল। অসুখ বাড়িতে লাগিল। পাযে, গাযে শোথ দেখা দিল। ইতিমধ্যে ভোলানাথের অসুখ সারিয়া গেল। ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া আমার অসুখের কথা বাহিরেও জানাইল।

জ্যোতিষের বাড়িতে ভগবান ব্রহ্মচারী পূজা কবে, ভোলানাথ তাহা দেখিতে যায়। জ্যোতিষকে সিদ্ধেশ্বরীতে আসিতে বলে। গিবিজাও আমাকে দেখিয়া জ্যোতিষকে প্রত্যহ খবর দিত। একদিন দুপুরে জ্যোতিষ আসিল। আমাকে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া বিকালেই পূর্ণ কবিরাজকে নিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম - এ শরীরের কি হইয়াছে? সে বলে অসুখ হইয়াছে, ঔষধ খাইতে হইবে। তাহাকে বলিযাছিলাম - আচ্ছা, যদি চিকিৎসা কবি তোমাকে ডাকিব।

দেখিতাম এ শরীরের কোন পরিবর্তন হয নাই। পূর্বে হাঁটিযা বসিযা, শুইযা যেমন থাকিতাম, এখন শুইয়াও তেমন আছি। খেয়ালেই আসিত না যে, আগে ভাল ছিলাম, এখন অসুস্থ হইয়াছি। সকলে মিলিয়া যখন ছুটাছুটি করিত, ব্যতিব্যস্ততা দেখাইত, তখন দেখিতাম ইহাও যেন আনন্দেব কীর্তন চলিয়াছে। শবীরেরও ঐরূপ ভাবের প্রকাশ পাইত। এ কারণে আমার প্রায় হাসি বাহির হইত।

ভোলানাথ একদিন বলে - এইরূপ হাসিয়া মানুষকে দেখাও বুঝি যে তোমার কোন অসুখ জ্ঞান নাই। তোমার এইসব আমার ভাল লাগে না। যখন হাসিতাম, তখনই এ ধরণের কথা বলিত। একদিন এইরূপ বলাতে, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম

- আচ্ছা, চুপ থাকিব। সেইদিন হইতে আর হাসি বাহির হইত না।

একদিন রাত্রে ভোলানাথ সকলকে সরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে আমার হাতে পায়ে ধরিয়া বলে যে, তোমার অসুখ, তুমি ভাল কর। তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ তোমাকে ভাল করিতে পারিবে না। বলিলাম - আমি ত বেশ আছি। ভোলানাথ বলে - ভয়ানক অসুখ। তুমি বুঝ না। তোমার হাসি দেখিয়া সেইদিন আমি ঐকথা বলিয়াছিলাম। অন্যায় হইযাছে, ক্ষমা কর।

বলিলাম - শরীরটা নিয়াই ত তোমাদের যত গোলমাল, বেশ ত একভাবে পড়িয়া আছে, ভালই ত। যদি শরীরটা তোমাদের দৃষ্টিতে যায়ও তাহাতেও বা ক্ষতি কি? আপনা হইতে যাহা হয় হইতে দেওয়াই ত ভাল। কাকুতি মিনতি করিয়া ভোলানাথ বলিল - তোমাকে আর কোন ভাবে বাধা দিব না, তুমি ভাল হও। তুমি ইচ্ছা কর, ভাল হওয়ার জন্য। বল, ইচ্ছা করিবে? বলিলাম - আচ্ছা, যদি ভাব আসে যে অসুখ করিয়াছে ও তাহা ভাল হওয়ার দরকার, তবে করিব।

পরদিন ভোরে উঠিযা বলিলাম - আজ ভাত খাইব। এইরকম অবস্থায় ভাত খাইবে কি? সকাল হইতেই আমাব খেয়াল হইতে লাগিল যে আমি নাকি অসুস্থ হইয়াছি, তাহাদের দৃষ্টি মত ভাল হইতে হইবে। অসুখ সারিযা উঠিলে রুগী যে যে পথ্য করিয়া থাকে, সেই রকম পদে রান্না করিতে বলিলাম। রান্না হইলে সকলে আশেপাশে ধরিয়া বসাইল, মুখে ভাত দিতে লাগিল। ভাত গিলিতে পারি না, পড়িয়া যায়। কোনমতে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলাম ও শুইয়া পড়িলাম। ক্রমে ক্রমে শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল।

রোগ সম্বন্ধে মায়ের খেয়াল

একদিন দ্বিপ্রহরে শুইয়া আছি, দেখি আমার বাম পার্শ্বে ঐ জ্বরেব মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ শরীরে আসিতে চায়। আমি বাম হাত দিয়া ধরিলাম, চক্ষু মেলিয়া হাসিলাম। খুকুনী কাছে বসিয়াছিল। সে ইহা দেখিয়া বলিল - মা! বাম হাত উঁচু করিলে কেন? তোমার হাতে কি আছে? বলিলাম - আমার হাতে জ্বর! সে বলে - আবার জ্বব কি? বলিলাম - এখনই জ্বর আসিবে। এই দেখ বাহিরে প্রকাশ হইবার বেশি দেরী নাই। দেখিল গা একটু গরম এবং বলিল - যখন বলিয়াছ একটু হইলেও হইবে। আমি বলিলাম - সে আপনা হইতে আসিয়াছে তাহাকেই বা তাড়াইয়া দিই কেন? তাহার ভোগ যদি হিংসা কর, তবে তাহাকে

রোগ বলিয়া দূর করিয়া দিবার ইচ্ছা, তাহাও ত তোমাদেব শবীরেব হিংসা ও পরিত্যাগ বাসনা। এ শরীর কাহাকেও ডাকিয়া আনে না, তাডাইবার ভাবও আসে না। তোমাদের সকলকে নিয়া যেমন আনন্দের প্রকাশ দেখ, বোগকে নিযাও কিন্তু তেমনি জানিবে। তোমরা যেমন ইচ্ছা আস যাও, তাহারাও অবাধে আসা যাওয়া করুক না কেন? অসুখ রূপটা ত আর ইহা (বলিয়া শবীরটা দেখান হইল) বাদ দিয়া নয় সবই যে ঐ। অসুখ ও ব্যারামের মানে কি? সুখ নাই, আরাম নাই। **এ শরীরের যে আরাম ব্যারাম, সুখ ও অসুখের কোন প্রশ্নই নাই। সব সময়ই ঐ এক ভাব। কাজেই কোন গোলমালই নাই, ঐ সবের। মানে এটা ওটার একেবারে মূলোচ্ছেদ আর কি। আবার যা বল তাই। কোন অসুবিধা নাই।**

এ শরীরের অসুখের সময় শরীরের সম্মুখে সিদ্ধেশ্বরী আসনে ত সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত শনিবারেব কীর্তন হইত। একদিন বিকেল বেলা ঐ কীর্তনে, বিছানায পড়া অবস্থায় এই দুর্বল শবীর, যাহা না ধরিলে নড়িতে চড়িতে পারে না, কীর্তনেব ভাবে উঠিয়া বারান্দায় গিযা বসিল, কতক্ষণ স্থিব হইযা বহিল।

ইহার ভিতর ভোলানাথেব আবাব সামান্য সামান্য জ্বব হইতেছে। শবীর ক্রমশঃ দুর্বল, ঔষধাদি কিছুই খায় না। আমার যে পবে আবাব জ্বব আসিল, তাহাও একদিন পবে একদিন হইতে লাগিল। ভোলানাথকে ঔষধ খাওয়াব কথা বলিলে বলে যে তুমি আগে ঔষধ খাও, আমিও খাইব। আমি বলি, আমার এত বড় অসুখ সারিয়াছে, জ্বরও আপনি চলিয়া যাইবে। তুমি ঔষধ খাও। কিছুতেই খাইবে না। তখন বলিলাম - আচ্ছা। আমি সামান্য একটু কুইনাইন মুখে দিলাম। ভোলানাথও চিকিৎসা আরম্ভ করিল।

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন - রমনা আশ্রমে মহালয়ার দিন কালী আনা হইল। আমরাও সকলে সেদিন সেখানে গেলাম। ভোলানাথের অসুখ ক্রমশঃই বাড়িতেছে, এমন কি পাশ ফিবাইতেও কষ্ট বোধ করে। এক ডাক্তার আসিয়া বলিল লিভার পাকিয়াছে। কিন্তু শবীর এত দুর্বল যে অস্ত্র কবাও সম্ভব নয। তাই ইনজেকসন দিয়া গেল। বলিল যদি পরিবর্তন না হয তবে পবে অস্ত্র করা যাইবে। সেইদিন ভোলানাথ অসাড় অবস্থায পড়িয়া বহিল। কেহ কেহ ভাবিল ঔষধে বোধ হয় এইরূপ হইযাছে। কিন্তু তাহা নয, আসলে অবস্থাই খুব খাবাপ। প্রায ১২ ঘন্টাব পর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। অস্ত্র আব কবিতে হইল না। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিল এই সব অসুখের কারণ কি? তাহাদের বলিলাম - তোমাদের হিসাবে ত প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগাযোগ আছে। আবার কোন যোগাযোগ বলিয়া কথাই নাই। ভোলানাথকে বলিয়াছিলাম - এ শবীরকে বাধা দিও না। বাধা দিলে এই শরীরের গোলমাল হইবে। প্রসন্নভাবে যাইতে দাও। ইহা শুনিয়া আমাকে যাইতে দিল বটে কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা ও বাধা বিঘ্নের সহিত।

যেইবার চাঁদপুর হইতে ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী আসনে গেলাম, তাহার প্রায় ৮ বছর পূর্বে নিজের মুখেই বলি নিজেই শুনি যে ৩৪/৩৫ বৎসর বয়সে এই শরীরের গতি পবিবর্তন হইবে। সে সময় আপন খেযাল অনুসারে বিশেষ যোগক্রিয়া দ্বারা যোগী যে শরীর রাখিয়া দিতে পারে, যোগবলে শরীর ছাড়িতেও পারে, শরীর ভাল করিতেও পারে, তাহার ক্রিয়াদি এ শরীরে প্রকাশ হইবে। সিদ্ধেশ্বরীতে যে অসুখ হয় তাহারই ৮ বৎসর পূর্বে এই কথা বলা হইয়াছিল। যখন হরিদ্বার হইতে বেনারস আসি, তখন নির্মলবাবুর বাড়িতে একদিন রাত্রে শুইযাছি, ইহার ভিতর হঠাৎ বলিয়া উঠি যে - আর ৬৫ দিন বাকি। এই কথা সেখানে যাহারা শুনিল, তাহারা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু মুখে কোন জবাব বাহির হইল না। ননী সেখানে লিখিয়া রাখিল। পরে যখন অসুখ হয় সে নাকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল যে ঠিক ঐ তারিখের সঙ্গে মিলিয়াছে।

অসুখটা ত তোমাদের দৃষ্টিতে। এই শরীরের ত সুখ আর অসুখ দুইটাই সমান। তোমাদের নানা ভাবের মধ্যে আপনভাবে শরীরটা ত খেলিয়া যাইতেছে, এই আবার এক রকম হাসি খেলা মনে কর না। আর এই সময়ে যে শরীরের পরিবর্তন হইবে, নিজের খেয়ালে আগেও প্রকাশ হইয়াছিল। এই সত্য রক্ষাব জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে এই অসুখেব প্রকাশ। যাহা পাকা খেযালে আসে তাহা অকাট্য হইবেই। এসব ত খেলা ছাড়া কিছুই না। এ শরীর নিয়া বেশ খেলা চলিতেছে বটে।

রক্তের উপলক্ষে - ভাবান্বিত মা

একদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে পাঁঠাবলির সময় রক্ত দেখিলাম। তাহার পর কেমন একটা ভাব, যেদিকে তাকাই কেবল রক্ত মাংসেব খেলা। জল মাটিও রক্ত। গাছ কাটিলে যে রস বাহির হয়, তাহাও সজীব যেন গাছটির রক্ত। ফলটা, মাংস, হাড়, রক্ত জড়িত জীবন্ত ইত্যাদি অনেক রকম লাগিত। যদিও সব সময়

লাল রং দেখিতাম না, কিন্তু ঐ যে জীবন্ত একটি হাড়, বক্ত ও মাংসের ভাব, তাহা সকল সময় লাগা থাকিত। কেহ কোন ফল কাটিলে বোধ হইত আমার শরীবটা কাটিতেছে। কেহ কোন গাছ কাটিলে বস পড়িতেছে দেখিলে খেযাল হইত আমাব গাযেব বক্ত পড়িতেছে। দূধও রক্ত, এ শবীবটাও রক্ত মাংস এরকম খেয়াল আসিয়া পড়িত।

এইরূপে ভাবান্বিত হইয়া কিছু খাইতে গেলে কেমন হইয়া যাইতাম। কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু খাওয়াও হয় না। খাওয়ার ভাবও আসে না। জ্যোতিষ আসিয়া একদিন বলে - এইভাব চলিলে ত শরীর টিকিবে না। আপনি ত এইসব নিয়া বেশ এক আনন্দে আছেন কিন্তু ইহা শরীর থাকার লক্ষণ নয়। আমি বলিলাম - এ শবীরের ত থাকা না থাকার প্রশ্ন নাই। বেশ একটা খেলা চলিযাছে। অর্থাৎ সবই চৈতন্যময়। আপনা হইতে যাহা হইবার হইতেছে। তবে কিনা দেখ, আমবা নিজেকেই নিজে খাইতেছি জানিবে। জীব জীবকে খাইয়া তাহাব জীবত্ব বক্ষা কবে। তাই বলিতে হয় যে নিজে নিজেকে সৃষ্টি কবে, স্থিতি করে আব লয় করে - নিজেতেই নিজে। দেখ গাছ লাগাইয়া রক্ষা করা হয়, আবার ইহার ফলাদিও খাওয়া হয়। ইহাতে জানিবে সকল শক্তি ও সবই সবেতেই নিহিত রহিয়াছে। সব শক্তি সবখানে পূর্ণভাবে আছে। আধ্যাত্মিক জগতে যাহারা সৃষ্টি স্থিতি লযের আসল বীজটিতে একবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহারা ঠিক এই রূপে জাগতিক, আধ্যাত্মিক ঐ দৃষ্টিতে খেলিয়া যায়। আবার দৃষ্টি সৃষ্টির কোন প্রশ্নই নাই। এইরূপ অনেক কথা হইল।

জ্যোতিষ বলিল - আপনি যখন স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে একই আছেন, আপনার সব কথাতেও তাহা বুঝা যায়, তবে আমবা চাই আপনি নিজেই নিজেতে থাকুন আমবাও যেন আপনাকে ব্যবহাবে পাই। মোট কথা, আপনাব শবীব বক্ষা আমাদের জন্য দরকার। আমি বলিলাম - তোমাদেব প্রবল ইচ্ছা হইলে আব এ শবীরেব খেয়াল হইলে আপনা হইতে তাহা হইয়া যাইবে। পব-ইচ্ছা, স্ব-ইচ্ছা, অনিচ্ছা, তাব খেযাল সবই গ্রহণ ত্যাগ। এই ভাব কযেকদিন বেশ চলিযাছিল। পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল।

সাধনায় সাধকের শরীর

একটা অবস্থায় সাধক যদি তাহার কর্মে স্বাধীন ভাব না পায, কাহারো আচরণ বা চরিত্র তাহার কর্মের ও ভাবের অনুকূল না হয, তাহা হইলে

বিঘ্নকারীদেরও অসুবিধা ঘটিয়া যাইতে পারে। সাধক যদি উন্নত হয় তবে সে নিজের উপর সব বিঘ্নাদি নিয়া অপরকে অব্যাহতি দিতেও পারে। আবার বিঘ্নকাবীর গতিও ফিরাইতে পারে। আর উন্নত অবস্থায় যদি না থাকে তবে নিজের ক্ষতি হয়। ইহারও সামান্য একটুমাত্র বলা হইল। আরো যে কত রকম ভাব, কত রকম অবস্থা তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাধারণতঃ তোরা মিনিট ঘন্টা, দিন, রাত্রি, মাস, বৎসব গুনিস। মিনিটের মধ্যে তোরা কত রকম বদলাইয়া যাইতেছিস। ছেলেদের খেলার মত এই শরীরটা সাময়িক সাধনার খেলা যখন খেলিয়াছিল, মিনিটের মধ্যে কত রূপ, কত ভাবের খেলা হইয়া যাইতেছিল। তোদের দিন রাত্রি ঘড়ি ঘন্টার হিসাব ওখানে কোথায়? তোরা যে সবই কালের অধীন দেখিস, বলিস কিনা। ওখানে যে নাই কালাকাল, নাই দিবারাত্রি, নাই আলো, নাই অন্ধকার। যতক্ষণ নিয়ম ও বদ্ধ ভাবের আশ্রয় ও অধীনে, অর্থাৎ বন্ধন, ততক্ষণ অবস্থা ও অনাবস্থার কথা, গতাগতি ও পরিবর্তন যা বলিয়া থাকিস। জগৎ মানে গতাগতি। বদ্ধভাব হইতেছে জীব। কথা হইল, এই যে স্বভাবে স্থিত হইবার জন্য রাস্তায যে লক্ষণ প্রকাশ হইলে স্বাভাবিক ভাবে স্বভাবে স্থিতি প্রকাশ দেখা দেয়, সেইজন্য সাধককে তাহার আপনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া। অধিক বাধা পাইলে নিজের ইচ্ছানুসারে এ শরীরও ছাড়িয়া দিতে পারে, যদি সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়। সাধন অবস্থায় তাহাদের শরীর ইঞ্জিনের মত চলে কিনা। যেদিকে হয় সেইদিকেই চালাইতে পারে। বাধা পাইলে ইঞ্জিন আপনি বন্ধ হইয়া যাওয়ার মত দেখাইতে পারে। তেমন সাধক শরীর একেবারে জড় ভাবেও সাময়িক রাখিতে পারে। আবার তাহার কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। বাধাটা গ্রহণও তাহার স্বাধীন। এই হইল সাধকেব কথা। এই শরীরটার কথা বাদ দে। তোদের পাগলা মেযের পাগলামি ত আলাদা।

প্রতিদিন মাঠে বেড়ানো

রমনা আশ্রমে ছোট ঘরে আসা অবধি এ শরীর প্রায় ১৫ দিন যাবৎ এক আসনে বিছানায় বসিয়া থাকে। আমারও খেয়াল নাই অন্য কাহারো খেয়াল হয় নাই যে আমি নড়াচড়া করি না। লোকজন আসে যায় বসিয়া কথা বলি, চলিয়া গেলে সেই বসা আসনেই কোন সময় শুইবার ভাবে থাকি। সামান্য যাহা খাওয়া ওখানেই হয়। এক বাহ্য প্রস্রাবের জন্য ২/১ বার যাওয়া কিন্তু হাঁটা একেবারে হয় না। তাহাও সর্বদা ত নাই-ই।

ইহার মধ্যে কেহ একদিন বলিলে, বাহিরে যাইতেছি। খুকুনী বলে - মা। তুমি এইরূপে হাঁটিতেছ কেন? আমি বলিলাম - আমি ত ঠিক মতই চলিতেছি। সে বলে - না। তোমার পা ত ঠিকমত পড়ে না। আমি হাসি আর বলি কেন। এই ত হাঁটিতেছি, আমি ত বুঝি এই রকমই আমার হাঁটা তখন খুকুনী বলিল - বসিয়া বসিয়া তুমি হাঁটাও ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি বুঝি হাঁটা বন্ধ করিয়া দিতে চাও? এ সব কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে বলিতে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। জ্যোতিষ আসিলে তাহাকে বলিল - মা ত হাঁটিতে পারে না। এ কেমন হইল? আমি তাহাদের কথা শুনি আর হাসি। আমি দেখি যেমন তেমনই আছি, বসিয়া থাকার দরুণ কোনরূপ মাজা ধরাও নাই, কোন অসুবিধাও বোধ নাই।

পরদিন জ্যোতিষ খুব ভোরে আসিল। ভোলানাথ তাহাকে বলিল - চল মাঠে বেড়াইয়া আসি। খানিকটা হাঁটিয়া আশ্রমে আসিলাম। ভোলানাথ এইরূপ ৩/৪ দিন জ্যোতিষ সহ আমাকে নিয়া মাঠে হাঁটাহাটি কবার পর স্বাভাবিক অবস্থা আসিতে লাগিল। আমার স্বাভাবিক চলাফেরা দেখিয়া খুকুনীব খুব আনন্দ।

ভোলানাথের আদেশানুযায়ী জ্যোতিষ সেইদিন হইতে প্রত্যহ ভোর ৫টাব সময় আসিযা আমাকে মাঠে বেড়াইয়া আনিত। যতদিন ঢাকা আশ্রমে ছিলাম শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায়, একদিনও তাহার বাদ যায় নাই।[২] ঝড় বাদল কুয়াশা কি শারীরিক অসুখ, এমন কি ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও[৩] তাহাকে একদিনের জন্যও এই নিত্য কর্মে বাধা দিতে পারে নাই।

একদিন আশ্রমের ছোট ঘরটির ভিতর একা শুইয়া আছি, দেখি কি জ্যোতিষের পূর্ব শরীর সে ঘবের উত্তর দিকে আছে। পবে ভোলানাথ এই ঘবে আসিলে আমি উত্তব পার্শ্বেও থাকিতাম।

কোনদিন বেলা ১০/১১ টায় রবিবার বা ছুটিতে বেলা ১টা পর্যন্ত আশ্রমে কাটাইত। তাহাকে কোন সময় আমার সামনে বসিতে বা বাহ্য প্রস্রাবের জন্য

[২] ১৯২৯ সালেব শেষ ভাগ হইতে ১৯৩২ এব মে মাস পর্য্যন্ত, প্রায তিন বছব ইহা চালু ছিল।

[৩] ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালে ঢাকা ও আউধের নবাবদেব উদ্যোক্তা "অল ইন্ডিযা মুসলিম লিগ" এর প্রতিষ্ঠা হইল। ১৯৩০ এর এই লীগ এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ঢাকাকে কেন্দ্র কবিয়া এক মুসলমান প্রদেশের সৃষ্টির পেছনে - বৃটিশ সরকারেব অনুমোদন ছিল এই ব্যাপাবে। হিন্দু ও মুসলমানেব ভেতরে যে সম্প্রীতি আগে ছিল তাহা নষ্ট কবিবার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। এবং তাহাদেব মধ্যে এই অশান্তি বৃটিশ সবকাবের (Divide and Rule) পবিকল্পনায সাহায্য কবিতে লাগিল।

বাহির যাইতে দেখি নাই। রাত্রি ৪টার সময় বাসা হইতে প্রায় দেড মাইল হাঁটিয়া আসিয়া মন্দিরে উষা আরতিতে যোগদান করিত। পরে আমাদের ঘরে আসিত।

একদিন তাহাকে সারাদিন হইতে রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়ান দেখিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম - ইহাও এক যোগক্রিয়া জানিবে। এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার এক সাধনা হইয়া যাইতেছে।

আমি সকালে উঠিয়া বসিয়া থাকিতাম, অথবা সে আসিলেও উঠিতাম।

জ্যোতিষকে যজ্ঞোপবীত দান

একদিন বেড়াইয়া আসিয়া ঘরে বসিয়াছি। ভোলানাথও আছে। যজ্ঞোপবীত ব্যবহার সম্বন্ধে কি প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। তখন আমি যে সোনার হারটি পৈতার মত গলায় দিতাম তাহা খুলিয়া বলিলাম - এই দিকে আয়, আমি তোকে আজ এ পৈতাটি পরাইয়া দিই। আজ হইতে জানিস্ - তুই ব্রহ্মচারী। সে হারটি পরিয়া জলভরা চোখে বলিল - আমার কি সাধ্য আছে যে ইহার সম্মান করিতে পারি তবে আপনি দয়া করিয়া যাহা করান, তাহাই প্রাণপণে চেষ্টা করিব, সেই দিন হইতে প্রায় ৩ বৎসর ঐ হারটি তাহার গলায় ছিল। পরে একটি সুতার পৈতা তাহাকে পরাইয়া ঐ হারটি আমি নিয়াছিলাম ও পরে ঢাকা হইতে দেরাদুনের দিকে আসিবাব সময় খুকুনীর গলায় দিয়া বলিলাম সকালে বিকালে নিয়মমত গায়ত্রীর সহিত সন্ধ্যা বন্দনা করিও।

ধর্মপুত্ররূপে জ্যোতিষ

ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরীতে একলা থাকিয়া জপ তপ করে। আমি রমনা আশ্রমে আছি। এইরূপে ১০/১৫ দিন চলিতেছে। জ্যোতিষ অফিস হইতে যাইয়া প্রায় ভোলানাথকে দেখিয়া আসে। একদিন তাহার মুখ দিয়া আবাব রক্ত পড়িযাছে শুনিয়া ভোলানাথ তাহাকে ইঙ্গিত করিল যে পরদিন সকালে যেন আমাকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী যায়। তখন ভোলানাথ কয়েকদিনের জন্য কথা বন্ধ করিয়াছিল। পরদিন জ্যোতিষ আমাকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী গেল। জ্যোতিষ ও ভোলানাথ আসনে বসিয়া আছে। আমিও যাইয়া এক পাশে বসিলাম। আসনে একটি স্তম্ভের মতন ছিল ও চারিদিকে কাঠের রেলিং ছিল। শিব প্রতিষ্ঠা তখনো হয নাই। ভোলানাথ আমাকে নিকটে ডাকিল, আমি রেলিং ধরিযা খাড়া হইলাম। ভোলানাথ জ্যোতিষকে

ডাকিয়া নিকটে বসিতে বলিল। সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। ভোলানাথ আমাকে তাহার রক্ত পড়ার কথা জানাইল, জ্যোতিষও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল। আমি খাড়া হইয়া শুনিতেছি। দেখি জ্যোতিষের ব্রহ্মতালু হইতে কপাল পর্যন্ত মেরুদণ্ডের মত একটি চিহ্ন; উঁচু ও বড় হাড়ের মত। তাহা আমি ভোলানাথকে দেখাইলাম ও নিজে ধরিয়া দেখিলাম। ভোলানাথও দেখিল। তখন মুখ দিয়া হঠাৎ বাহিব হইল - এই সব যৌগিক চিহ্ন। এই চিহ্ন যাহার, তাহার ধর্মচিন্তা স্বাভাবিক।

ভোলানাথ জ্যোতিষকে ইসারায বলিল - তুমি গাযেব জামা খুলিযা ফেল। সে তাহা করিল। আমি ভোলানাথের নিকট বসিযা আছি। ভোলানাথ করিল কি, কেমন এক অস্বাভাবিক ভাবে জ্যোতিষের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া তাহাকে ছেলেমানুষের মত শূন্যে ঘুবাইয়া আমার কোলে আনিয়া বসাইয়া দিল ও বলিল - জ্যোতিষ তোমার ধর্মপুত্র, তাহাকে এই আসনে তোমার হাতে দিলাম। তোমার তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তাহার এই অসুখ যেন সাবিয়া যায়। এই রোগে তাহার যেন মৃত্যু হয় না, উহার দিকে সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সেও যেন একটি শিশুর মতন একটু সময় বসিযা রহিল। আঁখি ছল ছল। পরে সে উঠিয়া আসিল।

পরদিন সকালে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোতিষ বলিল - মা। আমার কি সৌভাগ্য বাবা ও মা'র হাত আমার মাথায় পড়িল। বাবা আমাকে ছেলেব মত গ্রহণ করিলেন ও আপনার কোলে দিলেন। আমাব মত অধমের প্রতি আপনাদের যে এত কৃপা হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচব ছিল। আরো বলিল যে এই শুভ মুহূর্তের স্মৃতিস্বরূপ ফটো তুলিতে ইচ্ছা কবে, আমাব এই একটি নিবেদন। মা। ভোলানাথ ত কোলে দিয়াছেন। এ শবীব বলিল - তোর যখন ইচ্ছা হইযাছে, ভোলানাথকে বল্। এ বিষয়ে এ শবীবের ত কিছু বলা আসিতেছে না। ভোলানাথের অনুমতি লইয়া ফটোগ্রাফার বীবেন সোমকে দিয়া সিদ্ধেশ্বরী আসনে পূর্ব দিনের ধরণে ৩ রকমের ৩ খানি ছবি তোলা হইল। ছবি তোলা হইলে বীরেন সোম বলিয়াছিল - জ্যোতিষবাবু, আপনাব কি সৌভাগ্য। আমারও কত সৌভাগ্য যে আমি এই রকম ছবি তুলিতেছি। ছবি তৈয়ার হইয়া আসিলে সে বলিল - 'এ ছবির মর্ম বুঝিবে কয়জন?' সিদ্ধেশ্বরী ঘরের ভিতর যে আসন তাহার ছবি একখানি। ভোলানাথ ও এ শরীর যে জ্যোতিষের মাথায় হাত দিয়াছিল, সেইখানি দ্বিতীয় ছবি। আর ভোলানাথ যে জ্যোতিষকে ছোট্ট ছেলেব মত এই শবীবেব কোলে দিযাছিল, সেইখানি তৃতীয় ছবি।

প্রায় ৫/৬ মাস পর সেই ছবির কথা উঠিলে সে আবার বলিল - এ ছবি দেখিবে কে? বুঝিবে কে? এ শরীর বলিল - কেন, মা (জ্যোতিষের স্ত্রী) দেখিবে। সে বলিল - সে সৌভাগ্য আমার নাই।

সে সময় এ শরীর তাহাকে বলিল - দেখ, এখন খেয়াল হইল। তোমার যখন খুব খারাপ অবস্থা নিরঞ্জন আমাদিগকে হরিদ্বারে তার করিয়াছিল। সে তার হৃষীকেশে যাইয়া পাওয়া যায়। তখন দেখা হইয়াছিল, তোমার খুব রুগ্ন অবস্থা, ছোট্ট শিশুর মত ভাব, এ শরীর কোলে কবিয়া বসিয়া আছে, এবং মা (জ্যোতিষের স্ত্রী) আমাব কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এ শবীর তখন ভোলানাথকে এই কথা জানাইয়াছিল যে - এইবার জ্যোতিষের মৃত্যু হইবে না। ভোলানাথও তাহাই বলিল। এ যাবৎ এ সব কথা খেয়ালই ছিল না। আজ ৪/৫ বছর পর ভোলানাথ তোমাকে ছেলেমানুষের মত কোলে দিয়া, কোলে দেখাটা কেমন করিয়া থাকিল। পরে ভোলানাথকে এইসব কথা বলিলে - বলে তাই ত! আমার ত এই সব কথা মনেই ছিল না। কেবল উহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তোমার কোলে দেওয়ার কথা আমার মনে হইয়াছিল।

যখন দেরাদুনের দিকে আসা হইল, লোকে তাহার পরিচয জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম - ধর্মপুত্র। তাই সে স্থানের লোকেরা তাহাকে ভাইজী বলিয়া ডাকিত।

চিত্র ঃ সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীশ্রী মা ও
ভোলানাথজী ভাইজীকে আশীর্বাদ করিতেছেন

শকুনকে প্রসাদ দান

একদিন মাঠে হাঁটিতে হাঁটিতে একটি পুকুর পাড়ে কতগুলি শকুন চোখে পড়িল। জ্যোতিষকে বলা হইল - ইহাদিগকে কিছু খাবার দে। মাংস ছাড়া ত কিছু খাইবে না। একদিন প্রসাদের ব্যবস্থা কর। বিষ খাইলে বিষের যেমন ক্রিয়া হয়, প্রসাদের দ্বারা ইহাদের ভিতরও কিছু হইবে। সে বলিল - আপনার যখন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, নিশ্চয়ই এগুলিও প্রসাদ পাইয়া মুক্ত হইবে। এ শরীর বলিল - তোমরা যেমন সর্বসাধারণ জীবের কথা বল, উহারাও রকমভেদে আসলে জীবই, তোমরাই ত বল - যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী - সরল সহজ ভাবে সেইভাব রাখিতে চেষ্টা করিও।

পবে একদিন রমনা কালীবাড়ির প্রসাদ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ঝাঁকে

ঝাঁকে আসিয়া উহারা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উল্লাসে চেঁচামেচি করিয়াছিল। তাহার পরের দিন সকাল বেলার দিকে দেখা গেল বহু শকুন আশ্রমে দেওয়ালের উপর ও মাঠে বসিয়া চড়িয়া ফিরিয়া বেশ কিছুক্ষণ ওখানে মহা আনন্দে ছিল। অনেকেই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছিল। প্রসাদ আশ্রম হইতে বহুদূরে ময়দানে দেওয়া হইয়াছিল ত, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শকুনগুলি পরদিন আশ্রমের দেওয়ালে আসিয়া বসিল যেন মন্দির ইত্যাদি দর্শনে আসিযাছে। বমনাব কালীবাড়িও ত নিকটেই ছিল কিন্তু ওখানে একটিকেও দেখা গেল না।

দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ

একদিন দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরিবার প্রস্তাব হইলে শশাঙ্কবাবু, কুঞ্জবাবু, খুকুনী, যোগেশ, আশু এ শরীরের পিসি সহ আমি ও ভোলানাথ বাহির হইলাম। ওয়ালেটেয়ার হইতে রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা ইত্যাদি দক্ষিণেব বহু স্থানে ঘুরিয়া বিন্ধ্যাচলে পূজায় আসা হইল। পরে সেখানে হইতে ঢাকা আসা হয। শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী, দেখা হইবাব পর হইতেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত।

আশ্রমের পঞ্চবটী

একদিন কথায় কথায আশ্রমে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠাব ব্যবস্থা হইল। ভোলানাথ সব গাছ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রপূত ও ক্রিয়াদি করিয়া লাগাইল। কিছুদিন পবে অশোক গাছটি শুকাইযা গেল। সকলের ধারণা মরিয়া গিয়াছে, ভোলানাথ বলে উহা নিশ্চয বাঁচিবে। অনেক যত্ন করিতেছে। ইহার মধ্যে কমলাকান্ত একদিন সে স্থান পরিষ্কার করিতে যাইয়া সেখানে অশোক গাছটি শুক্না দেখিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহা আবার নানা রকম ক্রিয়াদি দ্বারা ভোলানাথ লাগাইয়া বলিল - নিশ্চয়ই বাঁচিবে। এই শরীরের কথার সঙ্গে একটি নূতন চারাও লাগান হইল। পরে দেখা গেল, পুরানো গাছটিও বাঁচিয়া উঠিল।

এক যুবক সন্ন্যাসী

আমরা কলিকাতা গিয়াছি। যারা আসা যাওয়া করে তাহাদের বাসায় বাসায় কীর্তন হইতেছে। একদিন সুরেনবাবুর বাসায় কীর্তন। দেখিলাম দূরে একটি গেরুযা পরা যুবক দাঁড়াইয়া আছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেইদিন সে কীর্তনে ছিল। পবে

শুনিলাম, কয়দিন হইতেই কীর্তনে এ শরীর যেখানে যায়, সেও সেখানে উপস্থিত থাকে। পরদিন দেখি একটি স্ত্রীলোক, দুইটি ছোট মেয়ে ও একটি ছোট্ট ছেলে সঙ্গে নিয়া এ শরীরের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত। বলে যে আমার এ শিশু দুটিকে ফেলিয়া তাহাদের বাবা বাহির হইয়া গিয়াছে। আমার এখন উপায় কি? জানা গেল তাহাদের বাবা বাহির ইহয়া গিয়াছে। তখন গেরুয়া পরা যুবকটিও সেইখানে আসিল। জানা গেল ইহাবা তাহারই স্ত্রী ও সন্তান।

সে বলিল - আমি বেশ ভাল চাকুরি করিতাম ও ইহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ইহার মধ্যে বড় মেয়েটি হইল, তাহার উপর আমার প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া গেল। পরে ছোট মেয়েটি হইল। হঠাৎ আমার ভিতর একদিন এই বিচার আসিল যে সত্যই কি আমি বড় মেয়েটিকে ভালবাসি। আচ্ছা, সত্য ভালবাসা কি জিনিষ তাহা দেখিতে হইবে। আমার মনের গতি অন্যবকম হইয়া গেল ও স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিলাম। আজ ৮ মাস পর্যন্ত বাহিরে আছি। ২ মাস হইল গেরুয়া নিয়াছি। স্ত্রী কিছুতেই এসব মানে না। এখন আমি কি করি, বলুন?

তাহাকে বলিলাম - উপস্থিত তাহাকে তোমার শান্ত করা দরকার। সে বলে - আমি ত বসিয়া আছি, কিন্তু তাহারা আমার মন ফিরাইয়া দূরে নিয়া যায়। আমি কি করিব? তাহার বাপের অবস্থা ভাল, তাহার খাওয়া দাওয়ার ত কোন অসুবিধা নাই। স্ত্রীটি অজস্র কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহাবা চলিযা গেল।

আমি দিনে এক বাসায় বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি সেখানেও যুবকটি সকলেব পিছনে বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি তাহার স্ত্রীও দুইটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়া উপস্থিত। সে বলে, এ দুইটিকে আমি এখানে রাখিয়া চলিয়া যাইব। যুবকটি বলে - দেখুন কাল রাত্রিতে বেশ বুঝিয়াছিল। আবার আজ সে কেন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে বলিলাম - না, বুঝে নাই। বুঝিলে কি আর আসিত। তুমি তাহাকে এখন ত উপস্থিত সঙ্গে লইয়া গিযা সান্ত্বনা দাও।

আমরা কলিকাতা হইতে পাবনা প্রাণকুমারের বাসায় গেলাম। সেখানে দেখি ঐ যুবকটিও আমাদের সঙ্গেই গিয়াছে। আমার কাছে আসিত না বা কোন কথাবার্তা বলিত না। দূরে দূরে থাকিত। সে সেখানেই রহিল। পাবনায় কীর্তনাদিতে কয়দিন বেশ কাটিল, পরে আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

ঘুরিয়া ফিরিযা কক্সবাজার আসিলাম। কযেকদিন সেখানে আছি। সমুদ্রের পাড়ে ঘুড়িয়া বেড়াই। একদিন হইল কি, আমি একস্থান হইতে মাটি সরাইয়া

গর্তের মত করিতে লাগিলাম, খুকুনী বলে - কি কবিতেছ? আমি বলিলাম - এ শরীরের জায়গা করি। সে বলিল - এইসব কি যে বল? আমি বলিলাম - সবই ত আমার শরীর। সে বলিল - নিশ্চয় কোথায় কিছু ঘটিয়াছে। আমি কেবল হাসি, মুখে কিছু বাহির হইল না। ইহার পব পাবনা হইতে চিঠি আসিল যে ঐ ছেলেটিব জ্বর খুব বেশি, তাহার আপনাব জন কোথায় কেহ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না, সে চুপ করিযা থাকে। অন্য সব কথা বলে। কযেকদিন পবে কক্সবাজারে পাবনা হইতে এক চিঠি আসে যে সেই যুবকটি মাবা গিয়াছে। তাহার স্ত্রী পাবনা যাইয়া তাহার মৃতদেহটি দেখিতে পাইয়াছিল। দেখা গেল, যেইদিন এই শরীর সমুদ্র পাড়ে গর্ত করিতেছিল, সেইদিনই সেই সময় তাহার দেহত্যাগ হয়।

কালীমূর্তির অঙ্গে আঘাতে মায়ের শরীরে প্রতিক্রিয়া

কক্সবাজারে একদিন বলি - যে আমার হাত খানা মটকাইয়া ভাঙ্গিব, কাটিযাও ফেলিতে পারি। ইহা বলিয়া আমি হাসিতেছি। একটু অস্বাভাবিক ভাব। খুকুনী বলে - তুমি এইসব খেয়াল করিও না ত। আবার কোথায় কি গোলমাল বাঁধে। কয়েকদিন পবে ঢাকা হইতে খবর গেল যে আশ্রমে কালীব হাত মচকাইয়া ভাঙ্গিয়া সামান্য একটু কাটিযা সোনার অলংকাব যা ছিল চুবি করিয়া লইযা গিয়াছে। কয়েক মাস পবেই নূতন মন্দিরের ভিত্তি পত্তন হয়। পরে ঢাকা ফিরিয়া আসিযা পবিত্র ভাবে কালীর হাত মেরামত কবিয়া লওযা হয।

ঢাকা আশ্রমের নীচে সমাধি

যখন নূতন অন্নপূর্ণা মন্দিরের ভিতটি কবিবার জন্য গর্ত কবা হয, তখন অনেক সমাধি বাহিব হইয়া পড়িল। সেইজন্য মন্দিব বড করা হইয়াছে।[৪] প্রায় ৩/৪ টি সন্ন্যাসীর সমাধি এই মন্দিরের নীচে আছে। সমাধিব দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিলে দেখা যায় ইহারা খুব বলিষ্ঠকায় এবং কেহ কেহ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। সে সমাধি স্থানগুলি আবার সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইল।

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মা, বর্তমানে কাশী আশ্রমে

[৪] ১৩৩১ সালে এই মন্দিবেব ভিত্তি স্থাপনা হয়।

ঢাকা হইতে যাত্রা

ব্যারামের পর ৪/৫ বৎসর চাকুরি হইয়া গেলে জ্যোতিষ হাওয়া পরিবর্তনেব জন্য সে সময় ৪ মাস ছুটি নিয়াছে। দার্জিলিং যাইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছে কিন্তু যাই যাই করিয়া যায় নাই। ঢাকায় আছে। আশ্রমে প্রায় সময়ই আসে।

একদিন বিকালে বীরেনকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি গেলাম। ঐখান হইতে সন্ধ্যায় আমি পঞ্চবটীতে গিয়াছি। সেখানে শুইয়া শুইয়া কথা বলিতেছি। রাত্রি ৯টার সময় কি এক খেয়াল হইল - আজই কোথাও যাইতে হইবে। ভোলনাথকে ডাকিয়া একথা জানাইলাম। হঠাৎ শুনিয়া বলিল - আর কে যাইবে? বলিলাম - জ্যোতিষ ছুটিতে আছে, তাহাকে ডাকিব। ভোলানাথ বলিল - আচ্ছা।

যোগেশকে বলিলাম - একখানি গাড়ি নিয়া জ্যোতিষকে লইয়া আস। কিছু বলিবার দরকার নাই। তাহাকে নিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম - রাত্রি কত হইয়াছে? আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে? পার ত এখনই চল। দেখিলাম সে একটু চুপ হইয়া গেল এবং বলিল যে বাসায যাইতে হইবে, টাকা পয়সা আনিতে হইবে ত।

তাহাকে বলিলাম - আশ্রমে যাহা পাও তাহা লও। বল যাইতে পারিবে কিনা? আরও একবার জিজ্ঞাসা করিবারপর বলিল - আচ্ছা, যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

তখন আশ্রমে খুব কান্নাকাটি আবম্ভ হইয়াছে, শশাঙ্কবাবু আসিয়া অনেক কথা বলিল। কোথায়, কিভাবে থাকিব জিজ্ঞাসা করিল। আমি পঞ্চবটী হইতেই রওনা হইলাম। স্টেশনে আসিলে কোথাকার টিকিট করিব জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম - গাড়ি যতদূর যায় ততদূর যাইব। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।[৫]

চিত্র ঃ শ্রীশ্রী মা, ভোলানাথজী ও ভাইজী - ১৯৩২ সালে জুন মাসে ঢাকা ছাড়ার পর

[৫] ২রা জুনের মধ্য রাত্রে, বৃহস্পতিবার ১৯৩২ সাল।

উপসংহার

পরের ৫০ বছর ধরিয়া মা বিরামহীন ভাবে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। দীন দরিদ্র জনতার মাঝে তাঁহার দিব্য প্রেম ও দয়া বিলাইয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিব বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টায় সারা দেশ জুড়িযা তাঁহার নামে বহু আশ্রম গড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার নাম ও খ্যাতি ছড়াইল দেশ বিদেশে। বহু বাজা-রানী; প্রধানমন্ত্রী; জ্ঞানী-গুণী; বিদ্বান; বিশিষ্ট মহাপুরুষ, সাধু ও ভক্ত, ধনী ও দরিদ্র - সবাই তাঁব চরণে আশ্রয় লইতে আসিলেন। অনেকেই নিজস্ব সংস্কাব অনুযায়ী মা'র মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপেব দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মা বাজ রাজেশ্বরী রূপে বিংশ শতাব্দীতে ধরাচলে বিরাজ করিযাছিলেন।

পরিশিষ্ট - ১

শ্রীশ্রী মা'র প্রকাশ

বাংলা সন ১৩০৩ বাংলা সন ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (ইং ১৮৯৬, বৃহস্পতিবার) কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে রাত তিনটা নাগাদ তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে একটি খড়ের ঘরে আনন্দময়ী মা তাঁহার ভাবদেহে প্রকট হইলেন।

'স্বক্রিয় স্বরসামৃত'-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৫৮-৫৯) এবং পঞ্চম খণ্ডে (পৃঃ ১২৮-১৩৩) শ্রীশ্রী মায়ের প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

নিশা অবসানে, ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন মহাযোগী ঋষি মুনিগণ নিজ নিজ ইষ্ট সাধনায় রত, যখন ঘন বাঁশ বনের ভিতর দিয়া সেই বিশ্বব্যাপক নিত্য চেতনার স্বক্রিয় অবিরাম ধ্বনি অখণ্ড ভাবে চলিতেছে, সেই মুহূর্তে, শ্রীশ্রী মাযেব প্রকাশ!

১) ঘরে আর ঐ সময় অপর কেহ ছিল না। মা'র আবির্ভাবের ঐ সময় অপর জাতীয় এবং আর কাহারও আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই; ইহাও অত্যাশ্চর্য্য নয় কি? - মা'র প্রশ্ন।

২) মায়ের ঠাকুরমার খুড়ীমা - যিনি পাশেব বাড়ীতে থাকিতেন - সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া মাকে ভূমি হইতে কোলে তুলিয়া নেন। শ্রীশ্রী মা'র মায়ের (দিদিমার) কোনও উল্লেখ নাই।

৩) মা পরে যাঁহাদের বাবা-মা রূপে সম্বোধন করিতেন, তাঁহাদের সংযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম হয় নাই।

৪) শ্রীশ্রীমায়ের কোনও নাড়ী (umbilical cord) ছিল না।

৫) আরও জানিতে পারা যায় যে, মা'র পিতা তাহার আগের তিন বছর বাড়ীর বাইরে কাটাইয়াছিলেন। মা'য়ের প্রকাশের সময়ে তাঁহার কোনও

উল্লেখ নাই, নামকরণ অনুষ্ঠানেও না।

৬। মার আবির্ভাব পাকশালে (রান্না ঘরে) হয়। সে সময়ে পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারে পাকশালা প্রসূতি-গৃহ রূপে ব্যবহার হওযা সম্পূর্ণ অভাবনীয় ছিল। একটি অস্থায়ী চালাঘর তৈরী করা হইত প্রসূতি গৃহ হিসাবে। ইহা সাধারণতঃ হইত গোশালার কাছে কারণ ইহা স্বাস্থ্যেব পক্ষে উপযোগী (antiseptic হিসাবে) বলিযা সকলেব বিশ্বাস ছিল। পাশেই মায়ের খুড়ীমার কয়েকটি গরু ছিল। কাজেই দরকার হইলে সেখানে নিশ্চযই ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত।

৭) প্রকাশেব সময়ে অন্য শিশুদের ন্যায় মা কাঁদেন নাই।

৮) মায়ের প্রশ্নঃ সদ্য প্রসবের পরেই কি কোনও মায়েব পক্ষে সম্ভব - সদ্যোজাত শিশুটিকে কোলে নিয়া তিন ধাপ সিঁড়ি নামিযা, ১২ গজ জমি হাঁটিয়া তুলসী মঞ্চে যাওয়া এবং সেই একই ভাবে আবার ফিরিযা আসা? ১০০ বছরেরও বেশী আগে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রামে তৎকালীন medical facilities এর কথা চিন্তা করিলে ইহাব তাৎপর্য বোঝা যায়।

৯) মা আভাস দিয়াছেন যে নিজের ছোট বয়সে দিদিমাকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, 'সবই ভগবানের সৃষ্টি। তিনি সবেতে আছেন। তিনি একাই সব কিছু করেন। সব কিছু তাঁহারই করা সাধ্য।' এই বিশ্বাসে দিদিমা সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন।

পরিশিষ্ট - 2

মায়ের আত্ম-পরিচয়

(শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ - প্রথম খণ্ড - পৃষ্ঠা ১১৪)

অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

মা খণ্ড, অখণ্ড ইত্যাদি কথা তোলাতে আমি প্রশ্ন করিলাম "মা তুমি যখন অখণ্ড ভাবে থাক, তখন কি আমাদিগকে দেখিতে পাও?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মা বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। পরে বলিলেন। "দেখ, এ সব কথা আমি সকলের কাছে প্রকাশ করি না। সব কথা সকলের নিকট আমার মুখ হইতে বাহির হয না; কিন্তু তোমাকে বলিতেছি। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, আমার মুখ হইতেও তাহার উত্তব বাহির হইতেছে। তুমি বুঝিবে বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইতেছে।

তুমি যে খণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বল তবে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়। আবার আমাকে যদি অখণ্ড বল, তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই। আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। আমি খাইতেছি, ঘুমাইতেছি, এগুলি আমার খণ্ড ভাব, কাজেই আমি সসীম; আবার আহার-নিদ্রার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কাজেই আমি সীমাশূন্য।

কোনও ছেলেপিলে আমার কাছে আসিলে আমি তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করি, তাহাদের মত একজন হইয়া যাই। আবার মহাপুরুষেরা যখন আমার কাছে আসেন তখন আমি তাঁহাদের ভাবেই তাঁহাদেব সঙ্গে কথা বলি। কত আত্মা, কেবল ভাল আত্মার কথা বলিতেছি না। কত খারাপ আত্মাও আমার কাছে আসে, তখন আমি তাঁহাদের ভাবেই তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করি। তাহাদেব যাহা প্রয়োজন

তাহা পূরণ করি। ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ কবিযা অনন্ত ব্রহ্মা ও আমি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি অখণ্ড ভাবে তোমাদিগকে দেখিতে পাই কিনা। আমি বলি, তোমরা কেন, যে আমাকে কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহার প্রয়োজন হইলে তাহাকেও আমি দেখিতে পারি; তাহাব অভাবও দূর করিযা থাকি।

আমি বলিলাম - "মা, জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল তোমাব জীবনী লেখা সম্বন্ধে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'দেখুন, মার একটা জীবনী লেখা দরকার। আপনি সর্ব্বদা মার নিকট আছেন। আপনার ভক্তিও খুব, এবং লিখিবার ক্ষমতাও অসাধারণ; এ অবস্থায় আপনারই মার জীবনী লেখা উচিত।' ইহাতে জ্যোতিষ বাবু বলিলেন, 'মার ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবে না। তাহা ছাড়া আমার মনে হয় যে মা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবেন, কাবণ দেখা যায় যে মা অনেক সময়ে নিজেকে প্রকাশ করিতে যাইয়া থামিয়া যান এবং বলেন যে এখনও প্রকাশ করিবাব সময হয় নাই। আমার বিশ্বাস মার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার জীবনী প্রকাশ হইবে।' জ্যোতিষবাবুর এই কথা শুনিযা তখন অবশ্য আমি কিছু মনে করি নাই।

মা বলিলেন তুমি কি বুঝিলে?

আমি বলিলাম, তোমাব কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে তুমি স্বপ্রকাশ। তুমি সৎ। এমন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এমন সময়ও আসিবে না যখন তুমি থাকিবে না। এখন যদি বলা যায় যে তুমি মহামায়া, বা তুমি কালী, দুর্গা, মানুষী মূর্ত্তিতে আসিয়াছ, তাহা হইলে ত' তোমাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহা ত' তোমার প্রকৃত পরিচয় হইবে না। তুমি যে যুগপৎ অসীম ও সীমাবদ্ধ। কাজেই যে স্বপ্রকাশ তাহার আবার প্রকাশ কি? পরিচয় কি? এই নয় কি, মা?"

শ্রীশ্রী মা হাসিমুখে বেশ একটু জোর দিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বুঝিয়াছ উহাই খাঁটি সত্য।"

পরিশিষ্ট - ৩
গ্রন্থি চক্র

তান্ত্রিক পরিভাষায় বিবর্তনের তিনটি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরের প্রতীকরূপী তিনটি গ্রন্থির নাম -

ব্রহ্মা গ্রন্থি বিষ্ণু গ্রন্থি রুদ্র গ্রন্থি

ব্রহ্মা গ্রন্থি ঃ এটির অবস্থান নাভীর আশেপাশের এলাকায় বলিয়া বিশ্বাস। মানে মণিপুর চক্রে - যেটি বোঝায় সংসার গ্রন্থি - নাম এবং রূপের জগত। ইহা জীবের (মানুষের) আধ্যাত্মিক দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রথম ও প্রধান বাধা। এই গ্রন্থি কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধতর চক্র অথবা স্তরে পৌঁছিবার এক প্রতিবন্ধক।

এই নাম ও রূপের জগৎ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এবং কামনা ও উচ্চাকাঙ্খার সৃষ্টি করিয়া, মনকে ফাঁদে ফেলিয়া চৈতন্যকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। এই গ্রন্থির উন্মোচন মানুষকে আসক্তি হইতে মুক্তি দেয়, এবং ইহা না হইলে সঠিকভাবে ধ্যান করা সম্ভব হয় না।

কুণ্ডলিনী এই গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া এবং অতিক্রম করিযা যাইবার পর নাম ও রূপের জগতের বিভিন্ন মূর্ত্তি আর সাধকের ধ্যান বা সাধনাকে ব্যাহত করিতে পারে না।

বিষ্ণু গ্রন্থি ঃ এইটি অনাহত চক্রে অবস্থান করে এবং কুণ্ডলিনীর অগ্রগতির পথে পরবর্ত্তী বাধা সৃষ্টি করে। ইহা হইতে করুণা, জগতের কল্যাণ করিবার আকাঙ্খা এবং পীড়িতের সাহায্য করিবার তীব্র ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ, জ্ঞান, ঐতিহ্য, নিয়মাবলি, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বেশী একাগ্রতা ও আসক্তি জন্মায় এবং এই আসক্তি ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের চক্র দ্বারা আরো দৃঢ় এবং অনুপ্রাণিত হইয়া বন্ধনের সৃষ্টি

করিতে পারে। কেবলমাত্র শুদ্ধ বিচার, জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্বাবা বিষ্ণু গ্রন্থি খোলা সম্ভব হয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও গুহ্য রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয। সাধকের মনেব সমস্ত গভীর ও গোপন প্রবণতা ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবা যায। মানুষের অহংকার দূব হয এবং ঈশ্বরেব ইচ্ছাই তাহাব কাছে প্রধান হইয়া দাঁড়ায। নিজেব ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়া এক হইযা যায।

রুদ্রগ্রন্থি ঃ এই গ্রন্থির অবস্থান আজ্ঞা চক্রে। এইটি শেষ গ্রন্থি এবং এটিব উন্মোচন হইলে সাধক আনন্দ কোষে প্রতিষ্ঠিত হইযা যান। এইস্থানে সময়ের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকে না, যোগী তখন অনন্তকালে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি যদি অলৌকিক ক্ষমতা, সিদ্ধি ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলে তাঁহার গুণাতীত হওয়াব ও নিজের আনন্দ কোষ এবং অদ্বৈতভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে।

পরিশিষ্ট - ৪

মহাবাক্য

পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের বিশেষ কিছু বাক্যকে 'মহাবাক্য' বলা হয়। বেদে এমন অসংখ্য বাক্য আছে যা বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, তবে তাহাদের মধ্যে চারটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ও প্রচলিত বাক্যকে বলা হয় 'মহাবাক্য' - চারটি বেদের এক একটির উপর আধারিত কোনও একটি উপনিষদ হইতে গ্রহণ করা।

যদিও প্রতিটি মহাবাক্য স্বয়ং সম্পূর্ণ, এবং উপযুক্ত সাধকের মুক্তিলাভের জন্যে যথেষ্ট, এই চারটি মহাবাক্যের সারাংশ সঠিক ক্রমে প্রয়োগ করিলে সাধকের সাধনার যথাযথ পথের নির্দেশ পাওয়া যায়।

১। **'প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম'** - ব্রহ্মে চেতনা। ঐতেরীয় উপনিষদ - ঋগ্‌বেদ।

প্রথম মহাবাক্যটি সত্যের একটি সংজ্ঞা । ইহার অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আধ্যাত্মিক চেতনা আছে, তাহার সাথে সারা জগতে পরিব্যাপ্ত যে চেতনা, প্রতিটি জীবও বস্তুর অন্তরে যে চেতনা আছে, তাহা সব এক - ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

২। **'তত্ত্বমসি'** - তুমি সেই। ছান্দোগ্য উপনিষদ - সাম বেদ।

ইহার অর্থ এই যে সাধক যদি বিচার করেন যে তাঁহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, তা সঠিক নয়, ব্রহ্মেরই তিনি অংশমাত্র। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মই।

৩। **'অহম ব্রহ্মাস্মি'** - আমিই ব্রহ্ম। এই বাক্যটি সাধকের অপরোক্ষ উপলব্ধির অভিব্যক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ - যজুর্বেদ।

৪। **'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'** - এই আত্মাই ব্রহ্ম। সাধক তাঁহার স্ব-ভাবে স্থিত

হইয়া যান, এই স্থিতিতে তিনি শাশ্বত ও সর্বত্র বিদ্যমান।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ - অথর্ববেদ।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অসাধারণ সাধন লীলা-খেলায় সমস্ত স্তরের সববকম সাধনারই পরিচয় পাওয়া যায় - ভক্তি, তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান অথবা অন্য যে কোনও ধর্মই হউক না কেন।

আরও আশ্চর্যের কথা, এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল শ্রীশ্রী মায়ের বাজিতপুরে থাকাকালীন। তাঁহার সুক্ষ্ম শরীরের বিভিন্ন স্তরে সাধনলীলা খেলায় পূর্ণ রূপে প্রকাশ মাত্র আট মাস সময়ের মধ্যে হইযছিল।

পরিশিষ্ট - ৫

ভোলানাথজীর (রমা পাগলা) সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১৮৮১ - ৬ মে, ১৯৩৮)

ইতিহাসে চিরকাল দেখা গিয়াছে যে ভগবান যখনই নররূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, প্রত্যেক বারই কিছু বিশিষ্ট সাধক এবং শিষ্য সঙ্গে পৃথিবীতে আসেন। এমনই একজন ছিলেন ভোলানাথজী। এই লীলাতে প্রত্যক্ষ করা যায় কী রূপে সাধনার পথে চরম উচ্চাকাঙ্খা নিয়া জন্মাইয়া তিনি অনন্য সাধারণ এক আদর্শ দিব্যগুরুর (শ্রীশ্রী মার) সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নির্দেশে সাধনার চরম সীমায় পৌঁছাইয়াছিলেন। ভোলানাথজী ছিলেন মায়ের লীলাব এক অখ' অংশ। যাঁহাকে ছাড়া এই লীলা থাকিত অসম্পূর্ণ। এই গুরু-শিষ্যর এমনই এক সম্পর্ক ছিল যেখানে যে কোনও জাগতিক প্রবণতা আধ্যাত্মিক পথে চালনা হইয়া যাইত।

ভোলানাথজী যাঁহার আগের নাম ছিল রমনী মোহন চক্রবর্ত্তী, ঢাকার নিকট আটপাড়া বিক্রমপুরে (মুনসীগঞ্জের রামপাল এলাকায়) এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারের ইতিহাসে বহু উচ্চ কোটির সাধকেব জন্মের এবং প্রত্যেক সপ্তম প্রজন্মে এমন একজনের আবির্ভাবের উল্লেখ পাওযা যায়। রমণী মোহন চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব এই পর্য্যায়ে পড়ে।

ভোলানাথজীর পিতামাতা ছিলেন জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী এবং ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী। তাঁদের ১০টি সন্তান জন্মায় - রমণী মোহন ছিলেন তৃতীয় পুত্র; তাঁর জন্ম ১৮৮১ সনে। ১৯০৯ সালে, ৭ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার; তাঁহার বিবাহ হয় নির্ম্মলা সুন্দরী দেবী (শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী)র সঙ্গে, ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে। বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইবার পর তিনি পুলিশ বিভাগে একটি চাকরী পান। সেই সময়ে তাঁহার বয়স ২৭/২৮, এবং মা ছিলেন ১২ বছর ১০ মাস। ভোলানাথের মাতার মৃত্যু ইহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, পিতা মারা যান তাঁর বিবাহের দু বছর পরে।

ভোলানাথ ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রাণের, সরল এবং পরোপকারী। বিশেষ করিয়া কোনও ব্যক্তির কোন ক্লেশ দেখিলে এমন ব্যক্তিদের জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকিত, এবং তিনি ছিলেন অল্পবয়স্কদের প্রতিও বিশেষ স্নেহপ্রবণ। তাঁহার সমস্ত জীবন ভরিয়া তাঁহার চরিত্রের আদর্শতা, অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে - আদর্শ স্বামী, আদর্শ শিষ্য এবং ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রকাশ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আদর্শ সহযোগী। মা'ব অখণ্ডতা, বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁহার ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহার ও শ্রীশ্রী মা'র লীলা ছিল এক অনুপম লীলা। এই অবর্ণনীয় লীলা মানুষের মনকে জাগতিক হইতে এক উচ্চস্তবে পৌঁছাইয়া দেয়।

মায়েব নির্দ্দেশে সিদ্ধেশ্বরী ও তারাপীঠ মন্দিবে কঠোর সাধনাব ফলে ভোলানাথজী সিদ্ধিলাভ করেন এবং ভোলানাথ নামে অভিহিত হন। তারা মায়ের নিকট তিনি কিছু সিদ্ধপীঠ দর্শনের নির্দেশ পাইয়াছিলেন। কৈলাস যাত্রার সময়ে হিমালয় পর্ব্বত চডিবার কালে তাঁহার তৎপরতা ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ইহা তারামায়ের দেওয়া শক্তির ফল। উত্তরকাশীতেও তিনি সাধনা করিয়াছিলেন তিন বছর গঙ্গার তটে, এবং একটি কালীমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন সেখানে।

বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই পুলিশ বিভাগের চাকুরিটি চলিয়া গেল। এবং পবের ৪ বছব ধরিয়া কেবল অস্থায়ী চাকুরিতে কাজ কবিলেন। ১৯১৩ সালে ঢাকার নবাবের এস্টেটে অষ্টগ্রামে এক স্থাযী চাকরী পাইলেন (আইন বিভাগে)। অষ্টগ্রামের মানুষ কীর্ত্তন প্রেমী ছিল, ভোলানাথজী নিজেও ছিলেন তাই। কীর্তনেব ফলে মায়ের দিব্য ভাবের প্রকাশ জনতার মাঝে এখানেই প্রথম দেখা যায়; পরে তাঁর ভক্তি সাধনার বিবিধ স্তরের লক্ষণও এইখানেই প্রথম প্রকাশ পায়।

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে ভোলানাথজী বাজিতপুরে বদলী হন। শ্রীশ্রী মা ১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) সেখানে যান। মা'ব সাধন লীলাব সময় তিনি তাঁর প্রতিরক্ষা করাব ভূমিকা নিয়াছিলেন এবং সেই ভূমিকা বজায় রাখিয়া সর্বদা চলিযাছেন। ১৯২৪ সালে ঢাকার নবাবেব বৃহৎ বাগান সাহবাগের দেখাশুনার ভার তাঁহার উপর পড়িল। তাহার পরে ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে নবাবের সম্পত্তি Court of Ward এর অধীনে আনা হইল এবং অন্যদের চাকুরীর সঙ্গে ভোলানাথজীর চাকরীও চলিয়া গেল। ইহাব পর শ্রীশ্রীমা'র নির্দেশানুযায়ী তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিত সাধনায়। কোনও বিশেষ উপলক্ষ্যে

তিনি মা'র পূজা করিতেন, কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, অন্য জায়গাতেও।

১৯২২ সালের ১লা ডিসেম্বর মা ভোলানাথজীকে দীক্ষা দিলেন। পূর্ব্বজন্মে ভোলানাথজী সাধক ছিলেন এবং মা পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি রমনা এবং সিদ্ধেশ্বরীতে সাধনা করিয়াছিলেন। সম্ভবত যে গাছের নীচে ভোলানাথজী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেই গাছটির নাম সিদ্ধেশ্বরী দেওয়া হইয়াছিল। মা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রতি ৫,৫০৫ বছর অন্তর উচ্চকোটির সাধকেরা এই স্থানে আসিয়া বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। ১৯২৬ সালে মা এবং ভোলানাথজী এইস্থানে সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়াছিলেন। মা আরো বলিয়াছেন যে স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্যেরও এই স্থানের সহিত যোগাযোগ ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর উই-এর ঢিপি হয়ত বা ভোলানাথজীর পূর্ব্ব কোনও জন্মের সাধনার স্থান থাকিতে পারে। সেই স্থানটিতে ভিত্তি স্থাপনার সময়ে ভয়ে কেউ ঢিপিটি ভাঙিতে পারে নাই। সাহবাগ হইতে মা ভোলানাথজীকে পাঠাইলেন এই কাজটি করাইতে। শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে এই ঢিপির মাটির সহিত অন্য মাটি মিলাইয়া বাসন্তী পূজায় দুর্গা প্রতিমা গড়া হইল। এই দুর্গা প্রতিমার মাপ শ্রীশ্রী মায়ের উচ্চতার সমান করা হইযাছিল। বাজিতপুর থাকাকালীন ভোলানাথজী দুর্গা পূজা করিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই আকাঙ্খা মা পূর্ণ করিয়াছিলেন সিদ্ধেশ্বরীতে বাসন্তী দুর্গা পূজা উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া ২০শে মার্চ, ১৯২৬ সালে। এই ঘটনার মাধ্যমে ভোলানাথজীর কোনও পূর্ব্বজন্মের যোগাযোগ মনে করা যাইতে পারে এই স্থানটির সহিত। মা পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে কোনও জন্মে এই স্থানটিতে ভোলানাথজী দুর্গাপূজা কবিয়াছিলেন। তাছাড়া, এই পূণ্যস্থানটিতে 'মহাদেব' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করাটিও বিশেষ অর্থপূর্ণ। মা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভোলানাথজী ছিলেন স্বয়ং মহাদেব (চতুর্থ অধ্যায়)।

রমনার কালীমন্দিরের নিকট রমনা আশ্রম যখন নির্মাণ হয়, সে সময়ে বেশ কিছু সাধুদের সমাধি পাওয়া গিয়াছিল। মা আভাস দিয়াছিলেন যে বহু সাধক গত অনেক বছর ধরিয়া এই স্থানটিতে সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেব সমাধি এই স্থানে আছে, আরো বলিয়াছিলেন যে ভোলানাথজীর আগের এক জন্মে এই স্থানে একটি বাড়ী ছিল (পঞ্চম অধ্যায়)। ইহাও বলিয়াছিলেন যে - এই জায়গায় রমনা কালীমন্দির স্থাপনা হওয়ার অনেক আগে একটি দুর্গা মন্দির ছিল। জানা গিয়াছে যে রমনা কালী মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন, যোশীমঠে বদ্রীনারায়ণের স্বামী গোপাল গিরি প্রায় ৫০০ বছর পূর্ব্বে এবং ইহা সম্ভব যে

ভোলানাথজীই তাঁহার পূর্ব্বের কোনও জন্মে সেই সাধু ছিলেন।

এই সব তথ্য হইতে বোঝা যায় যে বহু শতাব্দী ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরী তন্ত্র-সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল যেখানে অনেক সাধক অতি কঠোর সাধনা করিযাছিলেন যার ফলে তাঁহাদের একজন তত্ত্বে স্থিতিলাভ করিযাছিলেন। (একাদশ অধ্যায় - 'ঢাকা হইতে যাত্রা') এই স্থানে ভোলানাথজীর গত অনেক জন্মের কঠোর সাধনা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণতা লাভ করিল।

৫৬ বছর বযসে ভোলানাথজী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন - কৈলাস পর্ব্বতেব নিকট মানস সরোবরের তীরে ১৯৩৭ সাল ৪ঠা জুলাই, মায়ের মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সন্ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে তাঁহার নাম হইয়াছিল স্বামী তিব্বতানন্দ তীর্থ। তাহার জীবণে বর্ণাশ্রমের চারটি স্তর - ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। 'আনন্দময়ী' করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য উপস্থিতিতে (১৯৩৮ সালের ৬ই মে) দেবাদুন কিশনপুর আশ্রমে তিনি দেহরক্ষা করিযা অখণ্ড ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হইযা যান।

পরিশিষ্ট - ৬

রমনা ময়দান ও সাহবাগের বিবরণ

বর্ত্তমানের ঢাকা শহরটি ৪০০ বছরের পুরানো এবং বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে তৈরী পুরানো ঢাকা শহরটির উত্তর দিকে স্থিত। এই লেখার সময়ে অবিভক্ত বাংলার কলিকাতার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। কলিকাতা শহরে শিয়ালদা রেল ষ্টেশন হইতে পদ্মানদীর পাড়ে গোয়ালন্দ বন্দর হইতে ষ্টীমারে নদী পার করিয়া সেখান হইতে রেলে ঢাকা পৌঁছানো যাইত।

প্রাচীর ঘেরা ঢাকা শহরের উত্তর দিকে একটি কারুকার্য্য করা দরজা ছিল যার নাম ছিল 'সিংহদ্বার'। এইখান হইতে শুরু হইত রাজপথ, তাহার পূব দিকে রমনার মাঠ এবং পশ্চিমে ছিল শাহবাগ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে Sir Nawab Khwaja Salimullah শাহবাগের উদ্যানের পুনরুদ্ধার করিযা তাহার পুরাণ ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য ফিবাইয়া আনাইয়াছিলেন। রমনার মাঠের পরিধি ছিল দুই মাইল। রমনা কালীমন্দিরের সুউচ্চ চূড়া অনেক দূর হইতে দেখা যাইত। এটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। মন্দিরের দক্ষিণে বাঁধানো ঘাট সমেত এক বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। সেই ঘাটের অতি সামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে।

রমনার মাঠের ঠিক মাঝখানে ছিল একটি ভাঙ্গা মন্দির তার সংলগ্ন একটি আশ্রমের ভগ্নাংশ ও কিছু ফলের গাছ - সব দেওয়াল দিয়া ঘেরা। বিশ্বাস যে জায়গাটি আদি শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্ন্যাসীদের সাধনার স্থল ছিল। এখানে শেষ বসবাস করিয়াছিলেন গোপাল ঠাকুর; বাজিতপুরে থাকাকালীন মা ভোলানাথজীকে বলিয়াছিলেন যে এইটি তাঁহাব গত জন্মের বাসস্থান। এই জায়গাটিতেই পরে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম তৈরী হয। আশ্রমের প্রবেশ পথটি ছিল পুবদিক হইতে। সামনে ছিল অন্নপূর্ণা মন্দির এবং দক্ষিণ দিকে নাটমন্দির। এই দুইয়ের মাঝে ছিল একটি ছোট যজ্ঞশালা এবং তার পিছনে মা'র 'পাদুকা মন্দির'। অন্নপূর্ণা মন্দিরের পিছনদিকে ছিল একটি ছোট শিবমন্দির যার চূড়াটি জড়াইয়া

ছিল একটি পাথরের সাপ। অন্নপূর্ণা মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল মা'র কুটিয়া এবং দক্ষিণ পশ্চিমে পঞ্চবটী। পঞ্চবটীর পূবদিকে ছিল পিতৃমন্দির। ইহা ছাড়াও আরো কিছু পাকা বাড়ী ছিল এই জায়গায়।

মায়ের (রমনা) আশ্রমের উত্তরদিকে একটি বিরাট ঢিপি ছিল - বেশ কিছু বটগাছে ঢাকা। পূর্ব্বদিকে teak গাছ - উত্তব-দক্ষিণ লম্বালম্বি একটি পুকুর - যার অপর পাড়ে ছিল এক আম-বাগান। দক্ষিণের বড় পুষ্করিণী এবং তার চারিপাশের জমিটি ছাড়া, বাকী সব জুড়িয়া ছিল রমনার race-course

রাজপথের পশ্চিম দিক ব্যাপিয়া ছিল ১ মাইল বিস্তৃত সাহবাগ। সাহবাগে প্রবেশের জন্যে ছিল একটি বড় লোহার দবজা (gate) সেখান হইতে একটি পথ চলিয়া গেছে শ্বেত পাথরের মেঝে ও খিলানযুক্ত একটি মনোরম হলঘরের বৃহৎ আঙিনায়। এই বাড়ীটিকে বলা হইত 'নাচ-ঘর' এবং ১৯২৪ সালেব এপ্রিল মাস হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের সেখানে থাকাকালীন এটি কীর্তনের জন্য ব্যবহৃত হইত। এটিকে বলা হইত 'নাটমন্দিব'। হলঘরেব দুটি দিকে দুটি কারুকার্য্যখচিত গোলাকার ঘর। হলের উত্তর দিকে একটি বড় জলাশয় ছিল - নানা রকমেব দেশী বিদেশী ফুলের গাছের এক মনোরম উদ্যানে ঘেরা। চারিদিকে ঘোরানো একটি পথ - পথের দুটি ধারে ইট বসান।

আঙিনাটির অপর পাড়ে, সোজা পথটি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে বৃহৎ এক মল্লিকা গাছের নীচে এক ফকিরের একটি মাজহাব ছিল পাশেই একটি কৃত্তিম ঝরণা - চারিপাশে চারটি গভীর জলাশয়। সেগুলি স্নান বা সাতার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। এর দক্ষিণে ছিল অনেক গাছ ও ঝোপ যেমন বাবুল, বেল, জবা, স্থলপদ্ম, টগর ও ফলের গাছ যেমন ডুমুব, বিলাতী গাব, আম, জাম, কাঁঠাল, চালতা, পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম এবং একটি লিচু বাগান। এর পশ্চিমে ছিল বেগমদের স্নানের জন্য একটি সুন্দর ভাবে নির্মিত গোলাকার জলাশয়। এটি নিজে হইতে জলে ভরিয়া উঠিত, এবং জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা ছিল। জলাশয়টির চারিদিক উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। পূর্বদিকে পূবমুখী একটি অর্ধ চন্দ্র আকৃতির বাড়ী দুটি ঘর সমেত এবং পশ্চিমে একটি কলা-বাগান।

আরো উত্তব-পশ্চিম দিকে, সুন্দর উদ্যান দিয়া ঘেবা একটি দালান - 'খানাঘব'। উত্তবপূর্বে প্রসিদ্ধ ফকির শাহ সাহেবেব মজহাব। ইনি ছিলেন এই বাগানেব

প্রতিষ্ঠাতার গুরু, ও তাঁব নামে এই উদ্যানের নাম হইয়াছিল। দক্ষিণ দিক ছিল একটি নার্সারি মস্ত একটি ছড়ানো লতা গাছের ছায়ায়। কিছু দক্ষিণে এক বড় ত্রিকোণ বেদী-আর তার উপর নানা রকমের ছোট চারা গাছের গামলা।

'খানাঘরের উত্তরে একটি বাঁধানো পুষ্করিণী ছিল খাবার জলের। এর পূবে নাটমন্দির শাহবাগের উত্তরে ছিল একটি জঙ্গল - ও একটি চিড়িয়াখানা। তার পিছনে ছিল একটি বৃহৎ প্রাসাদ। যার নাম ছিল 'পরী বাগ'। আরো উত্তরে আর একটি জঙ্গল - 'দমানী বাগ'। শাহবাগের দক্ষিণ দিকের কোনায় একটি গুরুদ্বারা আছে ১৫০৪ সালে গুরু নানকের সেই স্থানে আগমনের স্মৃতিতে নির্মিত।

শ্রীশ্রী মা এবং ভোলানাথজী যে সময়ে শাহবাগে বাস করিতেন সেই সময়ে জায়গাটি ছিল অতি মনোরম। খুবই ভাল ভাবে তার দেখাশুনা করা হইত। এবং মায়ের দিব্য উপস্থিতি ও ফকিরদের মজহার 'এর কারণে শাহবাগটিতে এক পূণ্য আবহাওয়ার অনুভূতি হইত। বর্ত্তমান উদ্যানের কিছুই আর নাই। এলাকাটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট বিভাগের দখলে।

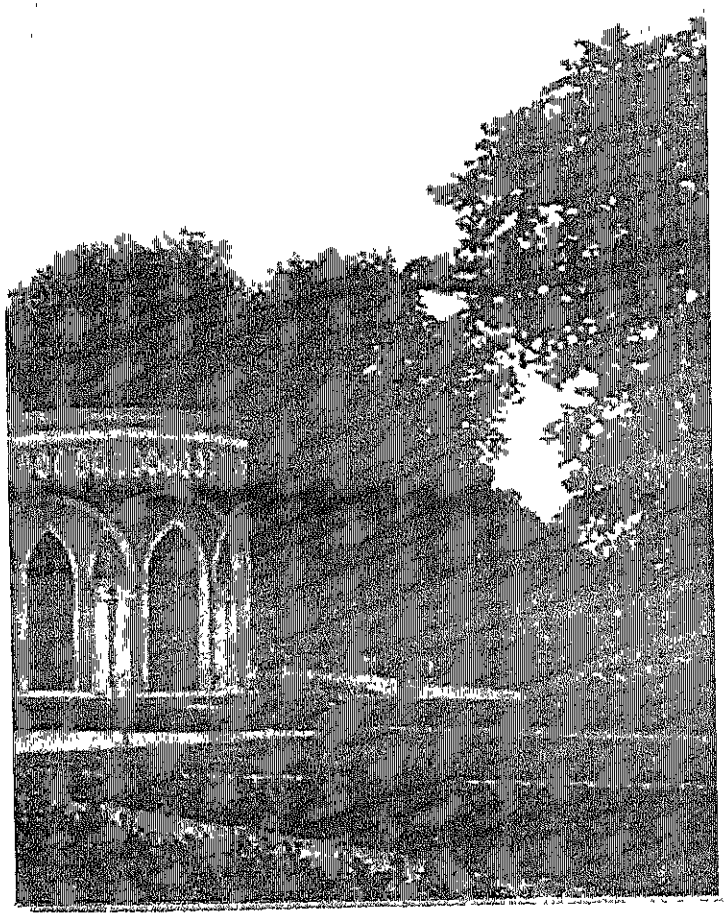

পরিশিষ্ট - ৭

শ্রীশ্রী মা'র স্বতঃস্ফুরিত স্তোত্র - রমনা আশ্রমে (২০শে বৈশাখ, ১৩৩৬)

এহি ভাবনায়ং ভায়ং এহি যং সং তানি তাযং
ভাবময়ং ভবভয়হরণং হে।
যস্মিং স্ত্বহং ভাগ পৌং হং বাং ক্রীং আং হে
ভাং হাং হিং হৌং হং হীং বং লং যং সং ত্বং
তাদরৌ ভাগ সং বং লং হে দেব ভক্তময়ং মম হে।
স ত্বং হি হং যং বং বায়ং কং ভাবভক্তি ..... ভাবময়ং হে।
মহাত্মায়ং ভবভয়ং হর হে।
দেবতং ময়ং মে সং তং হ্রীং মত্তস্ত্বম্ ভবোহয়ং
য স্তানি ত্বং তারণময়ম্ ভবভয়নাশং ভাবয় হে।
স্বাভাবশরণাগতং প্রণবাজাসনং
ভবানীভবং ভবভয়নাশনং হে,
হরশরণাগতং... ... তায়ং বিভাবতঃ মমাযনং হে।
যস্তারণং তত্র দ্বয়রূপং ময়াহি সর্ব্বাণি স্বরূপময়ানি
ময়াহি সর্ব্বঃ ময়াহি সর্ব্বশরণং হে।
দাস নিত্যং .. . প্রণবশ্রুতকাবণং
মহামায়া মহাভাবময়ময় হে।
মম ভো ভক্তৌ তরণং মা মম সর্ব্বময়ং হে
যস্যা রুদ্ররুদ্রত্বং প্রণবে রাং ঋং কৃতকাবণং রুদ্রং নৌমি।
প্রাং বাং হাং সাং আং হিং অং
ভাবময়ং হে.. ... সংসৃষ্ট কেশবঃ।

নিম্নে এই স্তোত্রটির মর্ম্মানুবাদ যথা সম্ভব দেওয়া হইল।

"তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিখিল ভাবনায়ক; তুমি আবির্ভূত হও। তোমা হইতে অবিরত সৃষ্টিজাল বিস্তীর্ণ হইতেছে। তুমি ভবভয়হারী, তুমি আবির্ভূত

হও। তুমি অখিলবীজস্বরূপ, এবং তুমিই সেইজন যাহাতে আমি অবস্থান করিতেছি। এই যে আমার ভক্তগণ তাহাদের মধ্যেও তুমিই বিরাজ করিতেছ। এই যে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই তুমি ভবভয়হরণ কর। হে সর্ব্বদেবময়, আমা হইতেই তুমি এবং আমিই বিশ্বজগৎ। যে তারণময় এতৎসমস্তের অধিষ্ঠানভূমি সেই ভবভয়নাশকারীকে ভাবনা কর। তুমি নিত্য স্ব-স্বভাব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। প্রণবজ অর্থাৎ বেদসমূহের তুমিই প্রতিষ্ঠাভূমি। তুমিই সমরসীভূত নাদবিন্দ্বাত্মক কামকামেশ্বরীরূপ দিব্যমিথুন, তুমি ভবভয়নাশ কর। আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার আশ্রয়, তুমি আমাকে তোমাতে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি যখন তারক — তখন তোমার দ্বিবিধরূপ — মোক্ষদাতা ও মুমুক্ষুজীব। আমাদ্বারাই সকলে স্বরূপময়। আমাদ্বারাই সকল, আমাতেই সকল ভূতগণের প্রতিষ্ঠাভূমি। আমিই সেই প্রণবোপদিষ্ট কারণ, আমিই একাধারে মহামায়া এবং মহাভাবময়। আমাতে যে ভক্তি তাহাই মোক্ষের হেতু। সকলই আমার। যে আমা হইতে রুদ্রের রুদ্রত্ব, সেই আমি কার্য্যকারণাত্মক রুদ্রকে স্তুতি করি।"

'মাতৃদর্শন' (লেখক ঃ ভাইজী) - পৃষ্ঠা ৪৮
'শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী' (লেখিকা ঃ গুরুপ্রিয়া দিদি) পৃষ্ঠা ১৮, দ্বিতীয় খণ্ডে।

মাতৃলীলার প্রথম ভাগের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিদের পরিচয়

খেওড়া ঃ
শ্রীশ্রী মা'র পিতা ঃ বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য (দাদামশাই)
শ্রীশ্রী মা'র মাতা ঃ মোক্ষদা সুন্দরী দেবী (দিদিমা)
শ্রীশ্রী মা'র ঠাকুমা
খুড়ীমা ঃ ঠাকুরমার খুড়ীমা ঃ শ্রীশ্রী মা ডাকিতেন 'বড়মা'
চিকন দিদি ঃ ঠাকুরমার বন্ধু
শ্রীশ দাদা ঃ চিক্কন দিদির আত্মীয়
শ্রীশ্রীমা'র বোন ঃ সুরবালা
শ্রীশ্রীমার ছোট বোন ঃ হেমাঙ্গিনী ঃ শ্রীশ্রী মা ডাকিতেন হেমী
শ্রীশ্রী মা'র স্বামী ঃ রমণী মোহন চক্রবর্ত্তী (ভোলানাথ বা পিতাজী)
সতীনাথ কুশারী ঃ ভোলানাথেব বড় ভগ্নিপতি ঃ বিক্রমপুবে দৌগাছি নিবাসী
একাব্বর ঃ একটি মুসলমান মেয়ে
নির্মলা ঃ ছোটবেলার খেলার সাথী

সুলতানপুর ঃ শ্রীশ্রীমা'র মামার বাড়ী
পণ্ডিত সারদা চরণ বিদ্যাসাগর ঃ শ্রীশ্রী মা'র মেজ মামা। মা তাঁকে ডাকিতেন 'ছোটমামা' অথবা 'সোনামামা'
সুশীলা দিদি ঃ মা'র মামাতো বোন

শ্রীপুর ঃ
রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী ঃ ভোলানাথজীর বড় ভাই
প্রমদা দেবী ঃ ভোলানাথজীর বড় ভাইএর স্ত্রী
আশু ঃ রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তীর - ছোট ছেলে
লাবণ্য ঃ আশুর বোন

বিদ্যাকূট ঃ শ্রীশ্রী মা'র বাপের বাড়ী
বিহারী ভট্টাচার্য্য ঃ মা'র জ্যাঠামশাই এক সম্পর্কে
অম্বিকা চরণ ভট্টাচার্য্য - এক কাকা
উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য - শ্রীশ্রী মা'র জ্যেঠামশায়ের ছেলে
দুর্গা মোহন ভট্টাচার্য্য ঃ পিতার ভাই সম্পর্কে
হরিশ ঃ পিওন।

অষ্টগ্রাম ঃ
জয়শঙ্কর সেন ঃ বাড়ীওয়ালা।
সারদা ঃ জয়শঙ্কর সেনের ছেলে
হরকুমার রায় ঃ জয়শঙ্কর সেনের শালা
মধুবাবু
ক্ষেত্রবাবু
গগন সাধু ঃ কীর্তনিয়া

বাজিতপুর ঃ
নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য (স্মৃতিভূষণ) ঃ মার মামাতো ভাই। মা ডাকিতেন 'ঠাকুর ভাই'
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ঃ মা'র ভাই 'মাখন'
জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ও তাঁর স্ত্রী অমিয় ঃ মা ও ভোলানাথের সঙ্গে অল্প সময় থাকিয়াছিলেন
রাসবিহারী দত্ত ঃ নবাব এস্টেটের Superintendent
উষাদিদি (উষা গুহ) ঃ রাস বিহারী কন্যা
জানকীবাবু (জানকীনাথ গুহ) ঃ রাসবিহারী দত্ত'র জামাতা। উষাদিদি'র স্বামী
বেবতীবাবু ঃ মুনসিফ
যামিনী (যামিনী কুমাব চক্রবর্ত্তী) ঃ ভোলানাথের ছোট ভাই
ডাঃ মহেন্দ্র নন্দী (কালীকচ্ছ নিবাসী) ঃ বিখ্যাত চিকিৎসক এবং সাধক
শিবানন্দ ঃ সাধু
অক্ষয় ঃ ভৃত্য
সরলা ঃ ঠিকা ঝি

ক্ষেত্রপাল ঃ ওঝা
ক্ষেত্রপাল ঃ প্রতিবেশী

ঢাকা ঃ
মটরী ঃ ভোলানাথজীর দ্বিতীয় বোন ও বাল্য-বিধবা
বেঙ্গী ঃ ভোলানাথজীর তৃতীয় বোন। আসল নাম মোক্ষদা সুন্দরী দেবী
কালী প্রসন্ন কুশারী ঃ ভোলানাথজীর তৃতীয় বোনেব স্বামী। পুলিশ ইনসপেক্টর।
মরণী ঃ ভোলানাথজীর বড় বোনের নাতনী

জ্যোতিষ চন্দ্র রায় ঃ ভাইজী বলিয়া পরিচিত

ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জ্জী ঃ ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নাম হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ গিবি
খুকুনী ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জীর তৃতীয় কন্যা, আসল নাম - আদবিণী দেবী। শ্রীশ্রী মা নাম দিযাছিলেন 'গুরুপ্রিয়া'। আশ্রমবাসীদেব মধ্যে 'দিদি' নামে পবিচিতা
নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ জামাতা। বারাণসীতে থাকিতেন
বীরেন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র - আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর
নন্দু ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জ্জীর কনিষ্ঠ পুত্র
কুঞ্জ মোহন মুখোপাধ্যায় ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখার্জ্জীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কাশীতে থাকিতেন। পরে সন্ন্যাস নেওয়ার নাম হইয়াছিল স্বামী তুরীয়ানন্দ গিরি
জিতেন মুখোপাধ্যায় ঃ ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র

ডাঃ রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ঃ ট্রাস্টি এবং নবাবেব এস্টেটেব পবিচালক
প্রফুল্ল ঘোষ এবং তাঁব স্ত্রী হিবন্ময়ী ঃ ডাঃ বায বাহাদুব যোগেশ চন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্র ও পুত্রবধূ
ভূদেববাবু (ভূদেব চন্দ্র বসু) ঃ ডাঃ রায বাহাদুব যোগেশ চন্দ্র ঘোষেব কনিষ্ঠ জামাতা
ভ্রমর ঃ ডাঃ রায় বাহাদুরের নাতনী

নিত্যানন্দ গিরি ঃ রমনা কালীমন্দিরের প্রধান
গোকুল ঠাকুর ঃ ভাঙ্গাবাড়ী ও মন্দির সহ জায়গাটি তাঁহার ছিল। সেখানেই পরে রমনার আশ্রম তৈয়ারী হয়

বাউল চন্দ্র বসাক ঃ ঢাকার আইন বিদ্যালয়ের শিক্ষক
ননীবাবু ঃ (ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক
প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় - ঢাকার ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল
প্রমথবাবু ঃ প্রমথনাথ বসু - ঢাকার ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল
প্রতুল - প্রমথবাবুর পুত্র
গিরিজাবাবু ঃ গিরিজা শঙ্কর ভট্টাচার্য্য - রাজশাহী কলেজে অধ্যাপক
অটল বিহারী ভট্টাচার্য - রাজশাহী কলেজে অধ্যাপক
রাজেন্দ্র চ্যাটার্জ্জী
রাধাচরণ বিশ্বাস ঃ পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর
সুরেন বাবু ঃ পোষ্ট-মাস্টাব
নিশিবাবু ঃ নিশিকান্ত মিত্র
লিলি ঃ নিশিকান্ত মিত্র-র কন্যা
যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণ সরকার
নিরঞ্জন রায় ঃ ঢাকার ইনকাম ট্যাক্সের এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার

যোগেশ ব্রহ্মচারী ঃ যোগেশ চন্দ্র রায়
ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত

ভূপেন্দ্র নারায়ণ দাশগুপ্ত ঃ ঢাকার কৃষি বিভাগের কার্যালয়
রাজেন্দ্র কুশারী ঃ ভোলানাথজীর ছোটবেলার বন্ধু
যোগেন্দ্র কুন্ডু ঃ (ভাগ্যকুল এস্টেটের মালিক)
মথুরবাবু
ভগবান ব্রহ্মচারী
অনাথ দাস
নগেন দত্ত

পূর্ণ কবিরাজ ঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক
বিনয়বাবু
বীরেন সোম - আলোকচিত্রকাব
বনমালী বাগচী
রেবতীবাবু
ভূপতিবাবু

চাটগাঁ ঃ
নীরোদ বাবু
শশীবাবু ঃ (শশীভূষণ দাশগুপ্ত) বিখ্যাত আলোকচিত্রকার

পাবনা ঃ
প্রাণ কুমার বাবু

দেওঘর ঃ
বালানন্দ ব্রহ্মচাবী ঃ প্রসিদ্ধ মহাঋষি

বেনারস/কাশী/বারাণসী ঃ
গোপীবাবু ঃ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
উপেনবাবু

কলকাতা ঃ
পিয়ারীবানু ঃ সাহবাগের অধিকারী ও মালিক
বাসন্তীদেবী ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী
অপর্ণা দেবী ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা
সুরেন ঃ সুরেন মোহন মুখোপাধ্যায়
গিরিনবাবু ঃ চিকিৎসক

যে কোন দেশে,

যে কোন কালে,

যে কোন ভাষায় -

যারাই ভগবানকে ডাকে, সেই ডাক এই হৃদয়ে এসে পৌঁছায়,

জেনে নিও।

যেমন সমুদ্রের ঢেউ কূলে এসে আছড়ে পড়ে,

তেমন ভাবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সংরক্ষণাগারে যে সকল কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হয়

১। শ্রীশ্রী মায়ের ছবি (ফটোগ্রাফের) সংগ্রহ করা এবং স্থান, সময় এবং মার সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করা।

২। শ্রীশ্রী মার সমগ্র ছবির 'হাই রেসোলিউসন ডিজিটাইজেশন (high resolution digitization) করা।

৩। ছবিতে শ্রীশ্রীমায়ের ভঙ্গিমা এবং সময় অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ করা।

৪। শ্রীশ্রী মায়ের কণ্ঠস্বরের audio ক্যাসেট সংগ্রহ এবং তাহাদের ডিজিটাল কনভার্সান (digital conversion) ও সূচীভুক্ত করা।

৫। শ্রীশ্রী মা সম্পর্কিত চলচ্চিত্র এবং video (ভিডিও) সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করা voice over এবং প্রাসঙ্গিক গান অথবা সঙ্গীতের সহিত।

৬। বিশদভাবে এবং কালক্রমানুসারে 'মাতৃলীলা' প্রস্তুত করা প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদিসহ।

৭। চিত্রাঙ্কণের মাধ্যম 'মাতৃলীলা' উপস্থাপনা করা।

৮। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত পুস্তক, পত্রিকা এবং প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করা।

৯। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত মূল পাণ্ডুলিপি এবং চিঠিপত্রের সংরক্ষণ করা।

১০। সি.ডি (CD) রূপে 'বাংলাদেশে মাতৃলীলা'র প্রকাশ।

১১। ১৯৮১ সাল শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে বৃন্দাবনে উদযাপিত 'হোলী উৎসব' DVD রূপে প্রকাশ করা বাংলা, ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় ধারা-বিবরণী সহিত।

১২। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য উপস্থিতিতে নাম-যজ্ঞের পূজা পদ্ধতি ও নিয়মাবলি'র প্রকাশ - বাংলা এবং হিন্দী ভাষায়।

১৩। 'স্বক্রিয়-স্বরসামৃতে'র ইংরাজী ভাষায় ৪র্থ খণ্ডের প্রকাশযোগ্য প্রতিলিপি প্রস্তুত করা।

Registered Office :

Shree Shree Ma Anandamayee Archive (R)
S-539, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, India
e-mail matrilila@gmail com

Head Office :

Shree Shree Ma Anandamayee Archive (R)
Matri Nilayam, opp. Ananda Jyoti Peetham
Shree Ma Anandamayee Marg, Kankhal, Haridwar 249408
(M) 09412158799

দ্রষ্টব্য ঃ শুধুমাত্র শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত এবং শিষ্যগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংরক্ষণাগারের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। যাঁহাদের কাছে শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কিত কোনও পুস্তক অথবা কোনও সংরক্ষণযোগ্য বস্তু আছে, তাঁহাদের সকলকে আমাদের অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।